Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

গবেষণামূলক উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মারকাযুদ্ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা-এর মুখপত্র

মাসিক

আলকাউসার

www.alkawsar.com

রজব ১৪৩৯
এপ্রিল ২০১৮

مجلة الكوثر الشهرية تصدر عن مركز الدعوة الإسلامية داكا [للبحوث والدراسات العليا وشؤون الدعوة]

Scanned by CamScanner

মোঃ আল-আমান
জালালাইন
কুমিল্লা

مجلة الكوثر الشهرية

تصدر عن مركز الدعوة الإسلامية داكا (للبحوث والدراسات العليا وشؤون الدعوة)

www.alkawsar.com

গবেষণামূলক উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা-এর মুখপত্র

মাসিক

আলকাউসার

বর্ষ : ১৪, সংখ্যা : ০৪

রজব ১৪৩৯ ॥ এপ্রিল ২০১৮ ॥ বৈশাখ ১৪২৫

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ০২

অনিচ্ছার যত অনর্থ ০৪
মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম

সেই দিনকে ভয় কর, যেদিন... .... ০৭
মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া আবদুল্লাহ

খোদার সাথে স্টিফেন হকিং-এর সাক্ষাৎ ০৮
ইয়াসির পীরজাদা

আমাদের কাছাকাছি আসতে হবে কর্মে, বিশ্বাসে, মানসিকতায়....... ০৯
মুফতী আবুল হাসান মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ

নবী-জীবনে সত্যবাদিতা.. ১৭
মুহাম্মাদ যাকারিয়া আবদুল্লাহ

সিরিয়া : বিধ্বস্ত মানবতার বীভৎস রূপ.. ২১
মুহাম্মাদ খালিদ

সুস্থতা-অসুস্থতা : দুটি নিআমত ২৫
হযরত মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানবী রাহ.

হতাশা মুমিনের চরিত্র নয় ২৯
মাওলানা শিব্বীর আহমদ

বহু আকাবিরের সোহবতধন্য
মাওলানা আলী আহমাদ রাহ. ৩৩
মাওলানা যাকারিয়া বিন আব্দুল ওয়াহহাব

প্রচলিত ভুল ৩৬

আপনি যা জানতে চেয়েছেন ৩৯

শিক্ষার্থীদের পাতা
জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চাও যেভাবে নেক আমল হয় ৪৮
মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক

শিশু-কিশোর ৫৩

পর্দানশীন..৫৫

ফিলহাল ৫৭

প্রতিষ্ঠা

মুহাররম ১৪২৬ হি., ফেব্রুয়ারি ২০০৫ ঈ.

প্রতিষ্ঠাকালীন উপদেষ্টা

হযরত মাওলানা আবদুল হাই পাহাড়পুরী রাহ.

তত্ত্বাবধায়ক

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক

সম্পাদক

মুফতী আবুল হাসান মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ

সহ-সম্পাদক

মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া আবদুল্লাহ

বিনিময় : ১৫ (পনের) টাকা মাত্র

সর্বপ্রকার যোগাযোগ

মাসিক আলকাউসার
৩০/১২, পল্লবী
(মিরপুর-১২) ঢাকা-১২১৬

E-mail : info@alkawsar.com

সার্কুলেশন

০১৯৮৪-৯৯ ৮৮ ৩৩ (এজেন্ট)
০১৯৮৪-৯৯ ৮৮ ৪৪ (গ্রাহক)
০১৯৮৪-৯৯ ৮৮ ৫৫ (হাতে হাতে)

সম্পাদনা বিভাগ

০১৯৮৪-৯৯৮৮২২
০১৭১০-৮৩৮৩৭৯

ব্যাংক একাউন্ট নম্বর

মাসিক আলকাউসার
১. চলতি হিসাব নং ১৩৫১২২০০০০১৭৩
আলআরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
পল্লবী শাখা, ঢাকা

২. চলতি হিসাব নং ১৬৪.১১০.১৭৯৩
ডাচ বাংলা ব্যাংক লিমিটেড
মিরপুর-১০ শাখা, ঢাকা

Scanned by CamScanner

banglabookcenter.blogspot.com/

Menu

বাংলা বুক সেন্টার

বাংলা বুক সেন্টার

Main Menu

RECENT POSTS

ইসলামীpdf বইয়েরবিশাল দিগন্ত

দলীলসহ নামাযের মাসায়েল pdf : মাওলানা আব্দুল মতিন

Scanned by CamScanner

সম্পাদকীয়

পয়লা বৈশাখ

সুসংস্কৃতির চর্চা কাম্য

১৪২৪ বাংলা সাল সমাপ্তির পথে। আসছে ১৪২৫ বাংলা সন। জীবন থেকে যে মূল্যবান সময় চলে গেল তার হিসাব-নিকাশ প্রয়োজন। দুনিয়ার জীবনের সময়টুকুই মানুষের সম্পদ। তা কাজে লাগিয়েই অর্জন করতে হয় দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা। সময় আমাদের হাতে সীমাহীন নয়। সেই নির্ধারিত সময়ও অল্পে অল্পে নিঃশেষ হয়ে চলেছে। দিন-রাতের আগমন-নির্গমন, সপ্তাহ, মাস, বৎসরের বিদায় সেই বিন্দু বিন্দু ক্ষয়েরই স্মারক। এক কবি সময়কে তুলনা করেছেন বরফখণ্ডের সাথে।

ہو رہی ہے عمر مثل برف کم + رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم

জীবন ফুরিয়ে যাচ্ছে বরফখণ্ডের গলে যাওয়ার মতো, অল্প অল্প করে, নীরবে নিঃশব্দে, প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসে।

তো জীবনের নিঃশেষ হওয়ার স্মারকগুলো যখন সামনে আসে তখন সচকিত হওয়া কাম্য। জীবন ও কর্মের তুলনা ও মুহাসাবা কাম্য। বিগত জীবনের ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতকে সুন্দর করার নবপ্রেরণায় উজ্জীবিত হওয়া কাম্য। কাজেই বর্ষশেষ বা বর্ষশুরু আনন্দ-উৎসবের বিষয় নয়, চিন্তা-ভাবনা ও হিসাব-নিকাশের বিষয়। নতুন চেতনায় উজ্জীবিত হওয়ার বিষয়। কিন্তু এখন আত্মসমাহিত চিন্তা-ভাবনার চেয়ে উৎসবে মত্ত হয়ে পড়াই রেওয়াজ। কোনো একটা উপলক্ষ হলেই হল, উৎসবে মেতে উঠতে আর বাধা থাকে না। ফলে পয়লা বৈশাখ হোক বা থার্টিফার্স্ট নাইট, উৎসবে মেতে ওঠা একটা সাধারণ রেওয়াজ।

পয়লা বৈশাখের উৎসবের বিভিন্ন উপকরণ হচ্ছে মঙ্গল শোভাযাত্রা, রমনার বটমূলে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান আর তরুণ-তরুণীদের অবাধ অসংযত মেলামেশা। আমাদের একশ্রেণির মিডিয়া এসবের পেছনে বাতাস দেয়- 'এ উৎসব বাঙালীর প্রাণের উৎসব'। আজকাল যেভাবে নববর্ষ উদ্‌যাপন করা হয় পঞ্চাশ বছর আগেও এসবের কোনো বালাই ছিল না। বিশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত কবি সাহিত্যিকদের রচনায় বাংলা নববর্ষ উদযাপনের বিষয়টি তেমন চোখে পড়ে না। না কবিতায়, না গল্পে-উপন্যাসে। রবীন্দ্রনাথ ষাট বছর বয়সে লিখলেন- 'এসো হে বৈশাখ...' এর আগ পর্যন্ত তিনিও এদিকে মনোযোগ দেওয়ার ফুরসত পাননি। সত্যিই, বাঙালীর বর্ষবরণ-উৎসব সেকালের কবি-সাহিত্যিকদের শুধু অবহেলাই পেয়েছে!

পয়লা বৈশাখের উৎসবের বিভিন্ন উপকরণ হচ্ছে মঙ্গল শোভাযাত্রা, রমনার বটমূলে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান আর তরুণ-তরুণীদের অবাধ অসংযত মেলামেশা। আমাদের একশ্রেণির মিডিয়া এসবের পেছনে বাতাস দেয়- 'এ উৎসব বাঙালীর প্রাণের উৎসব'। আজকাল যেভাবে নববর্ষ উদ্‌যাপন করা হয় পঞ্চাশ বছর আগেও এসবের কোনো বালাই ছিল না। বিশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত কবি সাহিত্যিকদের রচনায় বাংলা নববর্ষ উদযাপনের বিষয়টি তেমন চোখে পড়ে না। না কবিতায়, না গল্পে-উপন্যাসে। রবীন্দ্রনাথ ষাট বছর বয়সে লিখলেন- 'এসো হে বৈশাখ...' এর আগ পর্যন্ত তিনিও এদিকে মনোযোগ দেওয়ার ফুরসত পাননি। সত্যিই, বাঙালীর বর্ষবরণ-উৎসব সেকালের কবি-সাহিত্যিকদের শুধু অবহেলাই পেয়েছে!

রমনার বটমূলে যে অনুষ্ঠান হয়ে থাকে তার সূচনা ১৯৬৪ সালে। অর্থাৎ পয়লা বৈশাখ ১৩৭১। মঙ্গল শোভাযাত্রা যুক্ত হয়েছে আরও পরে, ১৯৮৬ সালে। যশোরের একটি সংগঠন প্রথম এটা শুরু করে। পরে এর দেখাদেখি ঢাকা ও অন্যান্য শহরেও তা ছড়িয়ে পড়ে।

পয়লা বৈশাখ উদ্‌যাপনে বাঙালী-সংস্কৃতির কথা জোরেসোরে বলা হলেও এর অর্থ আসলে কী? এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ মুসলিম। ইসলামী সংস্কৃতিই মুসলমানদের সংস্কৃতি। ইসলামী সংস্কৃতিতে বিভিন্ন জাতি, সম্প্রদায় ও অঞ্চলের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো- যেমন, খাদ্য, বস্ত্র, ভাষা ইত্যাদিকে অনুমোদনের মতো প্রশস্ততা রয়েছে। একইসাথে রয়েছে অন্যায়-অনাচারকে প্রত্যাখ্যান করারও সৎসাহস। একারণে ইসলামী সংস্কৃতি ধারণ করেও বাঙালী মুসলিমের বাঙলা ভাষায় কথা বলতে, এদেশে উৎপাদিত ও প্রস্তুতকৃত পোষাক পরিধান করতে এবং এ ভূখণ্ডে আল্লাহ যে ফল-ফসল দান করেছেন তা ভোগ করতেও কোনো অসুবিধা নেই। তবে সংস্কৃতির নামে অনাচার, উচ্ছৃঙ্খলা ও লাম্পট্যের সুযোগ ইসলামে নেই। এ দেশের মুসলিম জনগণ তাই ইসলামী সংস্কৃতির পূর্ণ অনুসারী হয়েও দেশ, ভাষা ও দেশের জনগণের পূর্ণ কল্যাণকামী; বরং ইসলামী শিক্ষাই তাদের শেখায় নিজের প্রতি ও চারপাশের সকলের প্রতি দায়িত্বশীল হতে।

পক্ষান্তরে বাঙালী সংস্কৃতির নামে পয়লা বৈশাখে যেভাবে নানা অনাচারের চর্চা হচ্ছে তা যেকোনো খোদাভীরু মানুষকেই এই দেশ ও জাতির ভাগ্য সম্পর্কে শঙ্কিত করে তোলে। মাঝে মাঝেই এখন এসকল উদ্‌যাপনে শোনা যাচ্ছে মারাত্মক সব সংবাদ। নারী নির্যাতন এমনকি দলবেঁধে প্রকাশ্যে নারীর শ্লীলতাহানীর ঘটনাও কোনো কোনো সময় ঘটেছে।

যে কেউ নির্মোহভাবে নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন, পয়লা বৈশাখ বা থার্টিফার্স্ট নাইট উদ্‌যাপনের মাহাত্ম্য আসলে কী? এর যতই মহিমা কীর্তন করা হোক এ যে পাপাচার ও প্রবৃত্তিপরায়ণতার এক বড় উপলক্ষ- তা বলাইবাহুল্য। এখন যারা উদ্বিগ্ন হচ্ছেন তাদের অনেকেরই উদ্বেগের কারণ, বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় এর চরিত্র বদলে যাওয়া। আগে যা ছিল দুপক্ষের সম্মতিতে বা দুর্ঘটনাবশত, এখন তা হয়ে

Scanned by CamScanner

দাঁড়িয়েছে প্রকাশ্যে, জোরপূর্বক ও সদলবলে। কারণ একটি 'শক্তিশালী' ও 'প্রাগ্রসর' অংশ এখন আর বখাটেপনার সাথে ভদ্রতার খোলস বহন করতে রাজি নয়। এটা ভয়াবহ হলেও অভাবনীয় নয়, এ তো অনিবার্য পরিণতিমাত্র। সুতরাং এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে কিছু খণ্ডিত ও পরম্পরাহীন প্রতিক্রিয়া মোটেই যথেষ্ট নয়। এর জন্য প্রয়োজন এই অভিশপ্ত ধারা গোড়া থেকে বন্ধ করা। পাপের সব পথ খোলা রেখে শুধু তার বিবর্তন ও বংশবৃদ্ধি ঠেকিয়ে রাখার দর্শন যে এক অবাস্তব দর্শন– এইসব ঘটনা তার প্রমাণ।

কয়েক দশক ধরে এ দেশের তরুণ ও যুবক শ্রেণিকে চরিত্রহীন করার যে নানামুখী আয়োজন, শিল্প-সংস্কৃতির নামে প্রবৃত্তিপরায়ণতার, বিনোদনের নামে অশ্লীলতা ও বল্গাহীনতার আর তথ্য-প্রযুক্তির নামে উঠতি বয়েসী ছেলে-মেয়ের হাতে নগ্নতার চাবিকাঠি সরবরাহের পরও সংযম-সুবুদ্ধির প্রত্যাশা অবাস্তব প্রত্যাশা নয় কি?

প্রসঙ্গত দোল বা হোলি উৎসব সম্পর্কেও দুটো কথা বলা প্রয়োজন। ফাল্গুনের মাঝামাঝিতে হোলি উৎসব শিরোনামে অনেক জায়গায় দৃষ্টিকটু পর্যায়ের মাতামাতি পরিলক্ষিত হয়েছে। আমাদের মনে হয়, জ্ঞান ও সচেতনতার অভাবও এই মাতামাতির এক কারণ। প্রথমত বিষয়টি একান্তই হিন্দুধর্মের এক ধর্মীয় বিষয়। ২০১৭ সালের ১৩ মার্চ দৈনিক প্রথম আলোতে এসংক্রান্ত এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'এবার ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে কেন্দ্রীয়ভাবে এই উৎসবের আয়োজন করে মহানগর সর্বজনীন পূজা কমিটি। গতকাল সকালে মন্দিরের নিত্য পুরোহিত সবার মঙ্গল কামনা করে প্রার্থনা করেন। এরপরই উৎসবের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। দিনব্যাপী এই আয়োজনে পুরো মন্দির এলাকা রঙে রাঙিয়ে যায়। দুপুর ১২টার দিকে মন্দির প্রাঙ্গণে ভজন-কীর্তন শুরু হয়। ... মহানগর সর্বজনীন পূজা কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্যামল কুমার রায় প্রথম আলোকে বলেন, বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার অন্যতম উৎসব দোলযাত্রা। এই উৎসবে সর্বস্তরের মানুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য পেতে চান। তাঁরা দেব-দেবীর পায়েও আবির প্রদান করেন।'

তো হিন্দু ধর্মের একান্ত উপাসনামূলক একটি বিষয়ে কোনো তাওহীদপন্থী মুসলিম কীভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে? মনে রাখতে হবে, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এক জিনিস, আদর্শ ত্যাগ সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস।

হোলি বা দোল উৎসবের সূত্র নিয়ে নানা প্রকারের কাহিনী চালু আছে, যেগুলো সম্পূর্ণরূপে হিন্দু ধর্মীয় উপাখ্যাননির্ভর। সেইসব উপাখ্যান নিয়ে স্বয়ং হিন্দু ধর্মের গবেষকদের মধ্যেই রয়েছে প্রচুর বিতর্ক। সেসবে না গিয়ে এখানে ড. নীহার রঞ্জন রায়ের একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করা যায়। হোলি বা হোলাক উৎসবের সূত্র বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, 'এ তথ্য এখন অনেকটা পরিষ্কার যে, আদিতে হোলি ছিল কৃষি সমাজের পূজা। সুশস্য উৎপাদন কামনায় নরবলি ও যৌনলীলাময় নৃত্যগীত উৎসব ছিল তার অঙ্গ। তার পরের স্তরে কোনও সময় নরবলির স্থান হইল পশুবলি এবং হোমযজ্ঞ ইহার অঙ্গীভূত হইল। বাঙালীর ইতিহাস (আদিপাঠ)– সিন্ধু থেকে হিন্দু, ড. আর. এম দেবনাথ পৃ. ১৯৫

এই বক্তব্য অনুসারে ভেবে দেখা উচিত রং ছিটানোর এই প্রথা মূলত কিসের স্মারক!

ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদারের বক্তব্যটিও এখানে প্রাসঙ্গিক। তিনি তার 'বাংলাদেশের ইতিহাস' গ্রন্থে লেখেন, যে সময়ে ইউরোপে নিউটন, লাইবনিৎজ, বেকন প্রভৃতি মানুষের প্রজ্ঞাশক্তি ও জ্ঞানের পরিধি বিস্তার করিতেছিল সেই সময় বাঙালীর মনীষা নব্যন্যায়ের (ন্যায়শাস্ত্র) সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারে, বাঙালীর প্রজ্ঞা কোন্ তিথিতে কোন্ দিকে যাত্রা শুভ বা অশুভ এবং ভোজ্য দ্রব্য বিধেয় বা নিষিদ্ধ তাহার নির্ণয়ে এবং বাঙালীর ধর্ম চিন্তা ও হৃদয়বৃত্তি স্বকীয় অপেক্ষা পরকীয়া প্রেমের আপেক্ষিক উৎকর্ষ প্রতিষ্ঠার জন্য ছয় মাসব্যাপী তর্কযুদ্ধে নিয়োজিত ছিল।' প্রাগুক্ত পৃ. ১৮৪

আমাদের কর্তব্য, মানবতা, স্বভাব-চরিত্রের নির্মলতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগ্রসরতার অনুষঙ্গগুলো লালন ও বিকাশে যত্নবান হওয়া।

এখানে জাতির প্রত্যেক শ্রেণির আলাদা দায়িত্ব আছে। ক্ষমতাশালীদের কর্তব্য, ক্ষমতার সঠিক ব্যবহার, তথা দুষ্টের দমন ও শিষ্টের লালন। দুঃখজনকভাবে কোথাও যদি দুষ্টের লালনের সংস্কৃতি গড়ে ওঠে তখন অনাচার-অবক্ষয় রোধ করার উপায় থাকে না। সমাজের যারা মস্তিষ্ক ও বিবেক তাদের কর্তব্য, সত্যপ্রিয় ও সত্যনিষ্ঠ হওয়া, হীনম্মন্যতা ও পরানুকরণ প্রবণতার উর্ধ্বে ওঠা। সমাজের যারা 'কণ্ঠ' তাদের দায়িত্ব, সত্য-ন্যায়ের প্রচারে অকুণ্ঠ হওয়া। এই দুই শ্রেণি বিপথগামী বা মিথ্যাশ্রয়ী হলে সমাজে মিথ্যা ও বিপথগামিতার ধারা চালু হয়ে যায়। তখন সত্যের নামে মিথ্যা, ভালোর নামে মন্দ আর শিল্প-সংস্কৃতির নামে অনাচার-অশ্লীলতার বিস্তার ঘটে। অভিভাবকদেরও কর্তব্য, অভিভাবকত্বের যোগ্যতা অর্জন করা এবং দায়িত্বসচেতন হওয়া। বাবা-মা, স্বামী-শিক্ষক নিজেরাই যদি সঠিক চিন্তার অধিকারী না হন তাহলে কীভাবে তারা সংশ্লিষ্টদের সঠিক পথে পরিচালিত করবেন?

সবশেষে ব্যক্তির কর্তব্য, নিজের প্রতি দায়িত্বশীল হওয়া। নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করা তো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। যে কাজ মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, যে সম্পর্ক চারিত্রিক পবিত্রতা বিনষ্ট করে কিংবা যে উৎসব-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ লাঞ্ছনা-অবমাননার শিকার করে তা থেকে দূরে থাকা নিজের কল্যাণের স্বার্থেই প্রয়োজন।

আর কল্যাণ-অকল্যাণ শুধু পার্থিব ক্ষণস্থায়ী জীবনের হিসাবেই বিবেচ্য নয়, আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনের হিসাবেও বিবেচ্য; বরং সেই বিবেচনাই মুমিনের কাছে অগ্রাধিকার লাভের যোগ্য। নিজের দেহ-প্রাণ, জীবন-যৌবন নিয়ে স্বেচ্ছাচারের সুযোগ নেই। এ জীবন অমূল্য, এ যৌবন মহামূল্য। এ পৃথিবীতে একবারই তা কাউকে দেওয়া হয়। সুতরাং একে ভুল পথে ভুলভাবে ব্যবহার নিজের প্রতি চরম অবিচার, যেজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে জবাবদিহি করতে হবে। তেমনি যারা অন্যের ইজ্জত-আব্রু বিনষ্ট করে, দুনিয়ার আদালতে কখনো কোনো কারণে তারা বেঁচে গেলেও আল্লাহর আদালতে তাদের রেহাই নেই। ঐ আদালতের কাঠগড়ায় তাদেরও দাঁড়াতে হবে, যারা কোনো না কোনো পর্যায়ের দায়িত্বশীল হওয়া সত্ত্বেও সে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে। ●

হোলি বা দোল উৎসবের সূত্র নিয়ে নানা প্রকারের কাহিনী চালু আছে, যেগুলো সম্পূর্ণরূপে হিন্দু ধর্মীয় উপাখ্যান নির্ভর। সেইসব উপাখ্যান নিয়ে স্বয়ং হিন্দু ধর্মের গবেষকদের মধ্যেই রয়েছে প্রচুর বিতর্ক। সেসবে না গিয়ে এখানে ড. নীহার রঞ্জন রায়ের একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করা যায়। হোলি বা হোলাক উৎসবের সূত্র বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, 'এ তথ্য এখন অনেকটা পরিষ্কার যে, আদিতে হোলি ছিল কৃষি সমাজের পূজা। সুশস্য উৎপাদন কামনায় নরবলি ও যৌনলীলাময় নৃত্যগীত উৎসব ছিল তার অঙ্গ। তার পরের স্তরে কোনও সময় নরবলির স্থান হইল পশুবলি এবং হোমযজ্ঞ ইহার অঙ্গীভূত হইল।

Scanned by CamScanner

অনিচ্ছার যত অনর্থ

মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম

ইচ্ছাশক্তি মানুষের জন্য আল্লাহ তা'আলার এক অমূল্য দান। এর মাধ্যমে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতের প্রভূত কল্যাণ সাধিত করতে পারে। তাই প্রত্যেকের উচিত এ শক্তির মর্যাদা দেওয়া, যেমন নিজ ইচ্ছার, তেমনি অন্যের ইচ্ছারও। নিজ ইচ্ছার মর্যাদা দেওয়ার অর্থ ইচ্ছার সদ্ব্যবহার করা। যে-কোনও বিষয়ের সদ্ব্যবহারের মানদণ্ড শরী'আত। শরী'আত মোতাবেক ব্যবহার করলেই তার সদ্ব্যবহার হয়। সুতরাং ইচ্ছাশক্তির সদ্ব্যবহারও কেবল শরী'আত মোতাবেক ব্যবহার দ্বারাই হতে পারে। যেকোনও কাজের ইচ্ছা জাগলে শরী'আতের মানদণ্ডে যাচাই করে দেখতে হবে সে কাজটি শরী'আত অনুমোদন করে কি না। অনুমোদন না করলে সে কাজের ইচ্ছা দমন করতে হবে। আর যদি অনুমোদন করে, তবে তা যেভাবে করার অনুমোদন করে, ঠিক সেভাবেই করার চেষ্টা করতে হবে, নিজ খেয়াল-খুশিমত নয়। এটাই ইচ্ছার সদ্ব্যবহার এবং এর দ্বারা ইচ্ছাশক্তির যথার্থ মর্যাদা দেওয়া হয়।

কখনও কোনও ভালো কাজের ইচ্ছা জাগলে অবহেলা না করে তা করে ফেলা উচিত। এটাও ইচ্ছার একপ্রকার মূল্যায়ন ও নি'আমতের শুকরিয়া। এর একটা নগদ সুফল হল এতে করে অন্তরে সদিচ্ছার ক্রমবৃদ্ধি হয়। বেশি বেশি ভালো কাজ করার ইচ্ছা জাগে। ইচ্ছাশক্তি যখন আল্লাহর দান ও নি'আমত, তখন কুরআন মাজীদের ঘোষণা মোতাবেক শুকর ও সদ্ব্যবহার দ্বারা এর বৃদ্ধি ঘটাই স্বাভাবিক।

কর্তব্য অন্যের ইচ্ছাকে মর্যাদা দেওয়াও। এক্ষেত্রে আমাদের অবহেলা বড় বেশি। আমরা সাধারণত আপন ইচ্ছা নিয়েই মেতে থাকি। অন্যের ইচ্ছার বিশেষ ধার ধারি না। এর ক্ষতি বহুমাত্রিক। ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক বহু সম্ভাবনার প্রতিফলন এর ফলে বাধাপ্রাপ্ত হয়। সমাজবদ্ধ জীব হওয়ার কারণে অনেক সম্ভাবনার বিকাশে পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। অনেক ভালো কাজই করা সম্ভব হয়ে ওঠে না, যখন একের ইচ্ছা অন্যের দ্বারা মূল্যায়িত না হয়। তাই প্রত্যেকের কর্তব্য কাউকে কোনও ভালো কাজে ইচ্ছুক দেখলে তাকে সে কাজে উৎসাহ যোগানো ও যতদূর সম্ভব তার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া। কুরআন মাজীদে ইরশাদ–

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى

তোমরা সৎকাজে ও তাকওয়ায় একে অন্যকে সাহায্য কর। –সূরা মায়িদা (৫) : ২

যে কাজে নিজের ইচ্ছা নেই, সে কাজে অন্যের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা কঠিন বটে। তা যতই কঠিন হোক, নিজের দ্বীন-দুনিয়ার কোনও ক্ষতি না হলে সাহায্যের হাত বাড়াতেই হবে। তা না বাড়ালে অনেক সময় নিজের ইচ্ছাপূরণও অসম্ভব হয়ে যাবে। বাস্তবিকপক্ষে অসম্ভব হয়েও যায়। পারস্পরিক সহযোগিতা না থাকার কারণে আজ পারিবারিক ও সামাজিক বহু কাজ অপূর্ণ থেকে যাচ্ছে। সেই অপূর্ণতা থেকে সৃষ্টি হচ্ছে আত্মকলহেরও। একজনের একটা কাজ করার ইচ্ছা। সে মনেপ্রাণে চায় কাজটি হোক। কিন্তু তা হতে হলে আরেকজনের সাহায্যের প্রয়োজন। কিন্তু তার সেটি করার ইচ্ছা নেই। সে চায় না কাজটি হোক। তাই সে তাতে সাহায্য করতে প্রস্তুত নয়। তার অসহযোগিতার দরুণ কাজটি করা সম্ভব হল না। যে ব্যক্তি মনেপ্রাণে তা চাচ্ছিল, এতে সে আহত হল। সে আঘাত থেকে ক্ষোভেরও সঞ্চার হল। অতঃপর এই একই কাজ সেও করল। সেও অপরজনের কাঙ্ক্ষিত কাজে অনিচ্ছা দেখাল। তার অসহযোগিতার দরুন ওই ব্যক্তির ইচ্ছাও অপূর্ণ থেকে গেল। সেও অন্তরে আঘাত পেল। এভাবে একের পর এক পারস্পরিক অসহযোগিতার ফলে উভয়ের মনে প্রতিশোধস্পৃহা দানা বাঁধতে থাকল। এখন আর কেউ কারও মুখ দেখতে রাজি নয়। প্রস্তুত নয় কোনওরকম ছাড় দিতে। দিন-রাত কাটে আত্মকলহে। প্রত্যেকের ধান্ধা অন্যজনকে কিভাবে ঠেকাবে এবং তাকে ব্যর্থ ও বাধাগ্রস্ত করবে। এই অশুভ তৎপরতা লক্ষ করা যায় ঘরে ঘরে। সমাজের সর্বস্তরে।

অন্যের শুভ ইচ্ছায় অসহযোগিতা কেবল অশান্তিই ডেকে আনে না, এটা পারিবারিক ও সামাজিক বহুমুখী অনর্থের কারণ হয়ে থাকে। এমনকি এর ফলে পর্যায়ক্রমে অনেক ভালো রেওয়াজ-প্রথাও বিলুপ্ত হয়ে যায়। এ ধারায় ইতোমধ্যে আমাদের সমাজ থেকে কোনও ভালো রেওয়াজ পূর্ণ বিলুপ্ত না হলেও বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে। এর উদাহরণ আছে অনেক।

আতিথেয়তার বিষয়টাই ধরা যাক। প্রাণবন্ত আতিথেয়তা মুসলিম সমাজের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। ইসলামী শিক্ষায় এর গুরুত্ব অনেক। এর আছে অনেক ফযীলত। এক হাদীছে আছে–

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার অতিথিকে সম্মান করে। –সহীহ বুখারী, হাদীস ৬১৩৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৪৮; সুনানে আবূ দাউদ, হাদীস ৩৭৪৬; মুআত্তা মালিক, হাদীস ৯৫৩; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৭৬৪৩

অতিথির সেবা করা নবী-রাসূলগণের সুন্নত ও আদর্শ। এ আদর্শ মুসলিম উম্মাহ যুগ-যুগব্যাপী অনুসরণ করে এসেছে। যথারীতি এক ইসলামী প্রথারূপেই মুসলিম সমাজে এ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত ছিল। মুসলিম উম্মাহ'র দেখাদেখি অন্যরাও এর চর্চা করত। আজ থেকে সিকি শতাব্দী আগেও দেখা গেছে মেহমান আসাকে বরকতের বিষয় মনে করা হত। গরীব মানুষও অতিথির কদর করত। অতিথির সেবা করতে পারাকে নিজের জন্য সৌভাগ্য মনে করত। তখন অতিথি বলতে আত্মীয় বোঝাত না। আত্মীয়ের বাড়ি আত্মীয়ের যাতায়াত তো ছিল সাধারণ ব্যাপার। আত্মীয়ের সেবা করাতে বাড়তি কোনও মহত্ত্ব ছিল না। তা স্বাভাবিক দায়িত্ব ছিল। না করাটা ছিল অপরাধ। অতিথি হত পথিকজন। চলতি পথের মানুষ দুপুরবেলা কোথায় খাবে? রাত হয়ে গেছে। সে কোথায় রাত যাপন করবে? সামনে যার বাড়ি পড়ত, পথিকের জন্য তার দরজা খোলা থাকত। সে তাকে সাদর সম্ভাষণ জানাত। তাকে দুপুরের আতিথেয়তা গ্রহণের অনুরোধ জানাত। উপস্থিত যা আছে, তা দিয়েই তার আপ্যায়ন করত। তা করতে পারাকে সৌভাগ্য গণ্য করত। সান্ধ্য-পথিককে নিজ বাড়িতে ডেকে নিয়ে আসত। পথিকও নির্ভয়ে নিশ্চিন্তমনে সেখানে রাত কাটিয়ে দিত। লোকে অতিথির অপেক্ষায় থাকত। বাড়ির দরজায় যাকেই পাওয়া যায় ডেকে নিয়ে আসত। শত্রু-মিত্র পার্থক্য করত না।

Scanned by CamScanner

নিজ ইচ্ছাশক্তি জাগ্রত রাখতেই হবে।

কতই না মহান আমাদের ইসলাম! সে ইচ্ছাশক্তি জাগ্রত রাখার ব্যবস্থাও দান করেছে। সকল ভালো কাজের জন্যই আছে তার পুরস্কারের ঘোষণা। অন্যের সংগে হাসি দিয়ে কথা বললেও ছওয়াব পাওয়া যায়। এমনকি পুণ্য লাভ হয় রসিকতা করলেও। কিন্তু ইচ্ছার অভাবে এসব কাজ করা হয় না। ইচ্ছা হয় না বলে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করা হয় না। ইচ্ছা হয় না বলে দ্বীনী বই-পুস্তক পড়া হয় না। ইচ্ছা হয় না বলে দ্বীনী আলোচনার মজলিসে বসা হয় না। ইচ্ছা জাগে না বলে রোগী দেখতে যাই না। ইচ্ছা হয় না বলে আত্মীয়ের খোঁজ নেই না। ইচ্ছা হয় না বলে একজনের মাথার বোঝা নামিয়ে দেই না। ইচ্ছা হয় না বলে আরেকজনকে জিজ্ঞেস করি না, তুমি কেমন আছ। ইচ্ছার অভাবে একটা গাছ লাগাই না। ইচ্ছা হয় না বলে একজন পথহারাকে পথ দেখিয়ে দেই না। ইচ্ছা হয় না বলে শেষরাতে জাগাও হয় না।

ইচ্ছার অভাবে এভাবে কতশত নেককাজ করা হয় না। পিছিয়ে থাকি হাজারও শুভ উদ্যোগ থেকে। পিছিয়ে থাকি অজস্র পুণ্যার্জন থেকে। পিছিয়ে থাকি জ্ঞানের বিকাশে। আরও পিছিয়ে থাকি জীবনকে কর্মময় করে তোলার অঙ্গনে। অথচ হাদীছ ভাণ্ডারসমূহে আছে ফাযাইলের এক বিস্তৃত অধ্যায়। তা তো এজন্যই যে, মানুষ সৎকাজে উৎসাহ পাবে। নেককাজ করার ইচ্ছা জাগবে।

সুতরাং মু'মিন মুসলিম কেন নির্জীব হয়ে থাকবে? ভালো কাজের ইচ্ছা তার মনে কেন জাগবে না? নিজের থেকে যদি বিশেষ কোনও ভালো কাজের ধারণা মাথায় না আসে, তবে অন্যের দেখাদেখিও সে কাজে তার ইচ্ছা জাগার কথা। তার তো দরকার পুণ্যার্জন। পুণ্যার্জনের জন্য নির্জীব মনকেও অনুপ্রাণিত করবে। অনিচ্ছাকে ইচ্ছায় রূপান্তরিত করার সর্বাত্মক চেষ্টা চালাবে। আসুন আমরা আমাদের ইচ্ছাশক্তিকে জাগ্রত ও শাণিত করে তোলার চেষ্টা করি, অন্যের ইচ্ছাকে সম্মান জানানোর মানসিকতা অর্জন করি, অনিচ্ছার জগদ্দল পাথর সরিয়ে পুণ্যার্জনের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হই এবং নিজ ইচ্ছাকে পবিত্র শরী'আতের অনুগামী বানানোর সাধনায় লেগে পড়ি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের তাওফীক দান করুন– আমীন।

আদর্শ জীবন

সেই দিনকে ভয় কর, যেদিন...

মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া আবদুল্লাহ

ইমাম মুসলিম রাহ. সহীহ মুসলিমের কিতাবুল ঈমানে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। বিখ্যাত সাহাবী আমর ইবনুল আস রা.-এর মৃত্যুশয্যার ঘটনা।

আমর ইবনুল আস রা. ছিলেন তৎকালীন আরবের সেরা বিচক্ষণ ও কুশলী ব্যক্তিদের একজন। ইতিহাসে তিনি পরিচিত 'ফাতিহে মিসর' উপাধীতে। দশ বছরেরও অধিক কাল তিনি ছিলেন মিসরের শাসনকর্তা। এর মধ্যে চার বছর খলীফায়ে রাশেদ ওমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর খিলাফত আমলে, চার বছর খলীফায়ে রাশেদ উছমান ইবনে আফফান রা.-এর খিলাফত আমলে, আর দুই বছর তিন মাস হযরত মুয়াবিয়া রা.-এর শাসনামলে। এ থেকেও তাঁর যোগ্যতা ও মর্যাদা অনুমান করা যায়।

মিসর বিজিত হওয়ার পর মুসলিম জনগণকে লক্ষ্য করে তাঁর বাণী–

أنتم في رباط دائم.

ইতিহাসের বিখ্যাত বাক্যগুলোর একটি। 'আনতুম ফী রিবাতিন দায়িম'–তোমরা রয়েছ নিরবচ্ছিন্ন সীমান্ত-প্রহরায়। অর্থাৎ এই ভূখণ্ড ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিলেও এখানে হক-বাতিলের সংঘাত চলতেই থাকবে। কাজেই মুসলিম জাতিকে তাদের দ্বীন ও ঈমানের সীমারেখা এবং সালতানাত ও ভূখণ্ডের সীমানা রক্ষায় অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করে যেতে হবে।

এই মহান সাহাবীর মৃত্যুশয্যার ঘটনা ইমাম মুসলিম রাহ. বর্ণনা করেছেন সহীহ মুসলিমের কিতাবুল ঈমানে।

***

আবদুর রহমান ইবনে শুমাছা আলমাহরী বলেন, আমরা (হযরত) আমর ইবনুল আছ রা.-এর মৃত্যুশয্যায় তাঁর কাছে এলাম। তিনি খুব কাঁদছিলেন এবং মুখমণ্ডল দেয়ালের দিকে ফিরিয়ে রেখেছিলেন।

তাঁর পুত্র তাঁকে ডেকে ডেকে যেন আশ্বস্ত করে বলছিলেন–

يَا أَبَتَاهُ، أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَذَا؟ أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَذَا؟

আব্বাজান! আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আপনাকে এই এই সুসংবাদ দেননি?[১]

একথা শুনে তিনি মুখ ফেরালেন এবং বললেন–

إِنَّ أَفْضَلَ مَا نُعِدُّ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ.

আমাদের সর্বোত্তম প্রস্তুতি হচ্ছে এই সাক্ষ্য যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল।[২]

এরপর বললেন–

إِنِّي قَدْ كُنْتُ عَلَى أَطْبَاقِ ثَلَاثٍ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَمَا أَحَدٌ أَشَدَّ بُغْضًا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّي، وَلَا أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَكُونَ قَدِ اسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ، فَقَتَلْتُهُ، فَلَوْ مُتُّ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَكُنْتُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ...

আমার জীবনে তিনটি পর্ব অতিবাহিত হয়েছে। এক পর্বে আমার অবস্থা এই ছিল যে, আমার কাছে আল্লাহ্‌র রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চেয়ে বেশি অপছন্দের আর কেউ ছিল না। এমনকি সুযোগ পেলে তাঁকে হত্যা করতেও আমার চেয়ে বেশি উদগ্রীব আর কেউ ছিল না। ঐ অবস্থায় যদি আমার মৃত্যু হত তাহলে আমি জাহান্নামী হয়ে যেতাম।

(বাকী অংশ ৪৬পৃষ্ঠায়)

১. পিতাকে লক্ষ্য করে পুত্রের এই কথাগুলোতে আছে ইসলামের এক গুরুত্বপূর্ণ আদবের নমুনা। তা হচ্ছে মৃত্যুপথযাত্রীর সামনে এমন কথা আলোচনা করা কাম্য, যা তার মনে আল্লাহ্‌র রহমতের প্রত্যাশা জাগ্রত করে। এ সময় আল্লাহর রহমতের আয়াত, মাগফিরাতের প্রতিশ্রুতি সম্বলিত হাদীস এবং মুমিনদের জন্য আল্লাহ যে পুরস্কার রেখেছেন তা স্মরণ করিয়ে দেয়া উচিত। তেমনি তার ভালো কাজগুলোর আলোচনা কাম্য, যা তার মনে আল্লাহ্‌র রহমতের প্রত্যাশা জাগিয়ে তুলবে। এই আশাবাদ ও মালিকের প্রতি সুধারণা নিয়েই সে এই নশ্বর জগৎ থেকে বিদায় নিবে। এ বিষয়ের ইস্‌তিহ্‌বাব ও কাম্যতা সম্পর্কে আলিমগণ একমত।

প্রসঙ্গত কালেমা তালকীনের বিষয়টিও আলোচনা করা যায়। আলিমগণ বলেন, তালকীনের নিয়ম হল, মুমূর্ষু ব্যক্তির কাছে আস্তে আস্তে কালেমা পড়তে থাকা। তা শুনে তারও কালেমা পড়ার কথা মনে পড়বে। এ নাযুক সময় তাকে কোনো কিছুর আদেশ দেয়া বা পীড়াপীড়ি করা উচিত নয়।

২. সকল মুসলিমকে আল্লাহ তাআলা ঈমানের ও কালেমার মর্যাদা বোঝার সৌভাগ্য দান করুন। এ-ই তো মুমিনের সবচেয়ে বড় সম্বল, আখিরাতের সফরের সবচেয়ে বড় পাথেয়।

Scanned by CamScanner

রহমত। এ রহমত তাঁরা যতদিন বেঁচে আছেন টের পাওয়া যাবে না। বেঁচে থাকা অবস্থায় টের পাওয়া যায় না। কিন্তু চলে যাওয়ার পর উপলব্ধি করা যায় মর্মে মর্মে। নেক সন্তান দ্বীনের চেতনায় উজ্জীবিত। সে বুঝতে পারে এ রহমতের কত মূল্য। তাই যথাযথ মর্যাদার সংগেই তাঁদের রাখতে চায়। কিন্তু স্ত্রী তো চায় না। এ নিয়ে ঘরে অশান্তি। সুখের দাম্পত্য জীবন অশান্তির ভেতর কাটে। টের পায় বাচ্চারাও। পিতামাতার অসদ্ভাবের প্রভাব তাদের উপরও পড়ে। হয়তো তাদের মধ্যেও পক্ষপাত দেখা দেয়। এভাবে পিতামাতা, ভাইবোন, দাদা-দাদি, নাতি-নাতনি সব মিলিয়ে গোটা পরিবার গভীর জটিলতার আবর্তে পড়ে যায়। পারস্পরিক সম্পর্ক হয়ে যায় বিষাদময়। কেন এতসব অনর্থ? কেবল এ কারণে যে, স্বামীর ইচ্ছায় স্ত্রী সহযোগিতা করছে না। সে আপন অনিচ্ছা থেকে একচুল সরতে রাজি নয়। যদি অনিচ্ছার কুরবানী দিত, পারিবারিক শান্তির জন্য নিজ অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বামীর ইচ্ছা মেনে নিত, তবে এই জটিলতার সৃষ্টি হত না।

পারিবারিক জীবনের মাধুর্য রক্ষার জন্য অন্যের বৈধ ও শুভ ইচ্ছার সামনে নিজ অনিচ্ছা অনেক সময় ত্যাগ করতে হয়। ত্যাগের মাহাত্ম্যও বোঝা দরকার। একের ত্যাগ দ্বারা যদি অন্যে আনন্দ পায়, সে ত্যাগ স্বীকার করা একটা মহত্ত্ব। যদি একজনের ত্যাগ গোটা পরিবারের পক্ষে আনন্দদায়ক হয়, তবে সেই একজন কেন ত্যাগ স্বীকারের আনন্দ বোধ করবে না?

যে উদাহরণদু'টি দেওয়া হল, সত্যিকার অর্থে তা ত্যাগের বিষয়ও নয়। কেননা এক্ষত্রে অনিচ্ছা প্রশংসণীয় কিছু নয়। সৎ ও ভালো কাজে অনিচ্ছা নিঃসন্দেহে দূষণীয়। নিজেকে দোষ থেকে রক্ষা করার জন্য হলেও ওই অনিচ্ছা ত্যাগ করা উচিত। একজন মু'মিনের অতিথিসেবায় অনিচ্ছা হবে কেন? কেন একজন মুসলিম-নারী স্বামীর পিতামাতাকে নিজের পিতামাতাস্বরূপ গণ্য করবে না? তাদের সেবাযত্নে কেন সে অনিচ্ছুক থাকবে? হাঁ, অনেক নেককার নারী এখনও আছে, যারা শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা করতে পারাকে নিজের পক্ষে সৌভাগ্য মনে করে। এরূপ নেককার পুত্রবধূর সেবাযত্নে বহু বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়ি পুত্রের সংসারে ইজ্জতের সাথে দিন কাটাচ্ছে। নিঃসন্দেহে সেসব নারী দুনিয়ার জীবনেও ইজ্জত পাচ্ছে এবং পরকালেও তাদের এ সেবা নাজাত লাভের একটা বড় কারণ হবে– ইনশাআল্লাহ।

ব্যক্তিবিশেষের অনিচ্ছা অনেক সময়ই সমষ্টির আনন্দ নষ্ট ও আশাভঙ্গের কারণ হয়ে থাকে। হয়তো সকলে মিলে কোথাও বৈধ আনন্দযাত্রার উদ্যোগ নিল। কিন্তু একজনের তাতে অংশগ্রহণের ইচ্ছা নেই। আবার সেই একজনের অংশগ্রহণ ছাড়া অন্যরা যেতেও রাজি নয়। কিংবা তার অংশগ্রহণ ছাড়া তাদের আনন্দ উপভোগ পূর্ণ হওয়ার নয়। তাই তাদের একান্ত ইচ্ছা সে তাদের সংগে থাকুক। তাদের ইচ্ছা থাকলে হবে কি, সে তার অনিচ্ছায় অনড় পাহাড়। যদি তার বিশেষ সমস্যা না থাকে, তবে তাদের আনন্দদানের লক্ষ্যে সে কি পারে না নিজ অনিচ্ছার সংগে লড়তে? তারা আনন্দ পাবে এ দৃষ্টিতে নিজ অনিচ্ছাকে ইচ্ছাতে রূপান্তরিত করা খুব কি কঠিন কাজ, বিশেষত যখন অন্যকে আনন্দদানও একটি ছওয়াবের কাজ? নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যকে আনন্দদানের জন্য এমন অনেক কাজ করেছেন, এমনিতে যা তাঁর করার কথা নয়। তিনি সাহাবায়ে কিরামের সংগে রসিকতা করেছেন। নিজে আম্মাজান আয়েশা সিদ্দীকা রাযি.-এর সামনে দাঁড়িয়ে তাঁকে সৈন্যদের সামরিক কসরত দেখার সুযোগ করে দিয়েছেন। তাঁর সংগে দৌড় প্রতিযোগিতা পর্যন্ত দিয়েছেন। কেন তিনি এসব করেছিলেন? আনন্দ দানের জন্যই কি নয়? অন্যের মুখে হাসি ফোটানো ইসলামের এক মহান শিক্ষা। এতে পুণ্য লাভ হয়। সে পুণ্যলাভের উদ্দেশ্যে নিজ অনিচ্ছা সত্ত্বেও অন্যদের আনন্দভ্রমণে কিংবা অন্য কোনও বৈধ বিনোদনে অংশগ্রহণ করাই উচিত, যদি না তার বিশেষ ওজর থাকে। প্রকৃত মু'মিন যখন কোনও কাজে ছওয়াবের আশ্বাস পাবে, তখন যদি অনিচ্ছার অবসান না ঘটে বা অবসান ঘটানোর চেষ্টা সে না চালায়, তবে তার পক্ষে এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। বুঝতে হবে তার দ্বীনী মানসিকতা এখনও ভালোভাবে গড়ে উঠেনি।

অনেক শুভ উদ্যোগ অঙ্কুরেই নষ্ট হতে দেখা গেছে, যার একমাত্র কারণ ব্যক্তিবিশেষের তাতে ইচ্ছা ছিল না। ব্যক্তিটি গুরুত্বপূর্ণ বা প্রভাবশালী হলে এরকম হয়ে থাকে। কেননা এরকম ব্যক্তির সমর্থন ছাড়া সমষ্টির উদ্যোগ সামনে এগোতে পারে না। এমনকি জনস্বার্থমূলক কাজও ব্যক্তিবিশেষের অনিচ্ছার কারণে পণ্ড হয়ে যায়। কয়েক তরুণ মিলে একটি রাস্তা বাঁধা বা সেতু নির্মাণের আগ্রহ ব্যক্ত করল। তারা স্বেচ্ছাশ্রমে সেটি করতে চায়। প্রভাবশালী লোকটির কাছে যখন কথাটি তুলল, সে মুখে কিছুই বলল না। তরুণরা বুঝল এতে তার ইচ্ছা নেই। তার ইচ্ছার বিপরীতে দাঁড়িয়ে কাজটি করে ফেলবে এমন সাহস তারা করতে পারল না। হয়তো অতীত অভিজ্ঞতা সে সাহস তাদের করতে দেয়নি। অতএব তারা থেমে যেতে বাধ্য হল। অনিচ্ছার জগদ্দল পাথর মসজিদ-মাদরাসা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নস্যাৎ করেছে এরকম ঘটনাও বিরল নয়।

বস্তুত ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক উৎকর্ষের পথে অনিচ্ছাও একটি বাধা। এ বাধা অবশ্যই দূর করা উচিত। দূর করা উচিত নিজ সম্ভাবনা বিকাশের স্বার্থেই। একজন ব্যক্তির দ্বারা অনেক কিছু হওয়া সম্ভব। সম্ভব অনেক কিছু করা। সে পারে নিজেকে বহুদূর নিয়ে যেতে। পারে তার সাথে যারা সংশ্লিষ্ট, বিশেষত যারা তার পরিবারের সদস্য, তাদের সুখী করতে। সামাজিক উন্নয়নেও সে যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে পারে। আর প্রকৃতপক্ষে অন্যদের কল্যাণে ভূমিকা রাখার দ্বারা নিজেরই উন্নতি সাধিত হয়। তো যেসকল কাজ দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিজের উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধিত হয়, তা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই করা উচিত।

অনেক সময় অন্তরে সেই স্বতঃস্ফূর্ততা থাকে না। কেন থাকে না? থাকে না এ কারণে যে, জীবনের আছে নানা পারিপার্শ্বিকতা। তাতে কখনও উদ্যম হারিয়ে যায়। কখনও বিষণ্নতা দেখা দেয়। স্বাস্থ্যগত কারণেও শরীর-মন নির্জীব হয়ে পড়ে। ইহজীবনে এ সমস্ত পারিপার্শ্বিকতা থাকবেই। এসব নিয়েই মানুষ চলে এবং চলতে হয়। বস্তুগত বা জৈবিক দিক থেকে যে সকল কাজ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়, তাতে মানুষ পারিপার্শ্বিকতা উপেক্ষা করে। গুরুত্ব বিবেচনায় মনের ইচ্ছা না থাকলেও সেসব কাজ করেই ফেলে।

তো মানুষ যখন জীবমাত্র নয়, সে এক সম্ভাবনাময় সৃষ্টি, অনেকদূর যাওয়ার মত ক্ষমতা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা তাকে সৃষ্টি করেছেন, তখন সে সম্ভাবনার বাস্তবায়ন ও ক্ষমতার প্রতিফলনকেও তার গুরুত্বপূর্ণ মনে করা উচিত। সেক্ষেত্রে তার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল মানবিকতার বিকাশ সাধন, যা কেবল ইসলামী শিক্ষার অনুসরণ দ্বারাই সম্ভব। ইসলাম যেসকল কাজ করার হুকুম দিয়েছে ও যেসকল কাজের প্রতি উৎসাহ যুগিয়েছে, তা করার দ্বারাই মানবজীবনের প্রকৃত উৎকর্ষ সাধিত হয়। তা দ্বারা মানবিকতার বিকাশ হয়। তা দ্বারা মানবাত্মা এতটা উচ্চতায় পৌঁছতে সক্ষম হয়, যেখানে পৌঁছা আর কারও পক্ষে সম্ভব নয়। সেই উচ্চতায় পৌঁছতে হলে

Scanned by CamScanner

শত্রুকে অতিথি করে নেওয়ার কত বিস্ময়কর ঘটনা আমাদের ইতিহাসগ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়। আরও পাওয়া যায়– অতীতে প্রত্যেক মুসলিমগৃহ ছিল একেকটি মেহমানখানা। এ জাতি আবাসিক হোটেলের সাথে পরিচিত ছিল না। মুসলিম সমাজে এ ধারার অনুপ্রবেশ ঘটেছে অন্যদের থেকে। আখিরাতবিমুখ জাতি আতিথেয়তাকে ব্যবসায়ে পরিণত করেছে। মুসলিম মানসে এটা ছিল পুণ্যার্জনের উপায়। মেহমানের সেবা যতবেশি করা যাবে, আখিরাতের খাতায় ততবেশি পুণ্য জমা হবে। ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকল মুসলিম এ চেতনা লালন করত। আজ সে ঐতিহ্য কোথায়? আজ পথিক তো দূরের কথা, আত্মীয়ের আগমনকেও উটকো ঝামেলা মনে করা হয়। দুপুর বা রাতের খাবারকালে আকস্মিক কেউ এসে পড়লে তার কাণ্ডজ্ঞান নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়।

আমরা অতিথির সমাদর ভুলে গেছি। শত শত বছরের ঐতিহ্য কিভাবে ভুলে গেলাম? হঠাৎ করে ভুলিনি। ভুলেছি পারস্পরিক অসহযোগিতার ধারায়। গৃহকর্তা হয়তো অতিথিপরায়ণ। তার ইচ্ছা ঘরে অতিথির পদধূলি পড়ুক। কিন্তু গৃহকর্ত্রীর সম্মতি নেই। তার কাছে এটা বাড়তি ঝামেলা। তার সহযোগিতা ছাড়া তো অতিথির সেবা সম্ভব নয়। জোর করে করতে গেলে অশান্তি হবে। অগত্যা গৃহকর্তা হাল ছেড়ে দেয়। মনের ইচ্ছা মনের ভেতর চেপে কেবল গুমরে মরে।

এর বিপরীতও আছে। স্ত্রীর বড় ইচ্ছা মেহমান আসুক। নিজ হাতে রেঁধে তাকে খাওয়াবে। কিন্তু স্বামী মহাকৃপণ। মেহমান খাওয়ালে বাড়তি খরচ হবে। বাড়তি খরচ সে মানতে রাজি নয়। তাই স্ত্রীর ইচ্ছা আর পূরণ হয় না। কোনও পরিবারে কেবল স্বামী বা কেবল স্ত্রীর ইচ্ছায় অতিথি সেবা সম্ভব হয় না। একের ইচ্ছায় চাই অন্যের সমর্থন ও সহযোগিতা। তা না থাকায় ওই পরিবার থেকে অতিথি সেবার রেওয়াজ লুপ্ত।

মুসলিম সমাজে আজ এরকম পরিবার বড় কম, যেখানে অতিথি সেবায় একের ইচ্ছায় অন্যের সমর্থন আছে। তা না থাকার দরুন অধিকাংশ পরিবার থেকে ইসলামের এ মহান ঐতিহ্য হারিয়ে যেতে বসেছে। আজ পথিকজনের কারও বাড়িতে খাদ্যগ্রহণ ও রাত্রিযাপন বলতে গেলে কল্পনার অতীত।

এখন তো এক আত্মীয়কেও বিশেষ উপলক্ষ ছাড়া অন্য আত্মীয়ের বাড়িতে যেতে অনেকবার ভাবতে হয়। কারণ জানা আছে, তার যাওয়াকে খুশিমনে গ্রহণ করা হবে না, যেমন সে নিজেও খুশিমনে গ্রহণ করে না। তাই এখন আত্মীয়বর্গের পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাৎ হয় কেবল ঈদ মওসুমে, মৃত্যুদিবস ও জন্মদিন পালনে এবং এরকম আরও বিভিন্ন পালা-পার্বণে। কারও বাড়িতে কেবলই বেড়াতে যাওয়ার মধুর যাত্রা এখন শুধু শিশুমনই কল্পনা করতে পারে। বড়দের মনে সে কল্পনা বারণ। কারণ নিজ বাড়িতে যে জিনিসের স্বতঃস্ফূর্ত চর্চা নেই, অন্যের বাড়িতে তা আশা করা যায় কিভাবে? সুতরাং এখন বেড়াতে চাও, তো কোথাও গিয়ে হোটেলে ওঠ। তাতেই স্বস্তি। আহা! মুসলিম মন কিভাবে এমন শুষ্ক মরুভূমিতে পরিণত হল? আতিথ্যের মাধুর্য আজ কেন হিসাব-নিকাশের তিক্ততায় পর্যবসিত? এর একটা নিকট কারণ এইও যে, আমরা অন্যের ইচ্ছাকে সম্মান দেখাতে পারি না। নিজ অনিচ্ছাই শেষকথা। অনিচ্ছার শাসনে অন্যের শুভ ইচ্ছা দমন করে রাখি।

উদাহরণ দেওয়া যায় মা-বাবার সেবা দ্বারাও। দিন দিন বৃদ্ধাশ্রমের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ছে। মুসলিম সমাজে এ অশুভ প্রবণতার জায়গা কিভাবে হতে পারছে? পারছে এ কারণেও যে, অনেক বাড়িতে পুত্রের একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও বৃদ্ধ মা-বাবার ঠাঁই হচ্ছে না। স্ত্রীর সমর্থন ছাড়া পুত্রের পক্ষে শান্তিপূর্ণভাবে ঠাঁই দেওয়া সম্ভব হয় না। এককালে এ নিয়ে কোনও টানাপোড়েন ছিল না। মা-বাবার সেবাকে পুত্র ও পুত্রবধূ উভয়ে নিজেদের জন্য সৌভাগ্য মনে করত। তখন পুত্র-কন্যারা দ্বীনের শিক্ষায় উজ্জীবিত ছিল। তারা মনে করত দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তি পিতামাতার সেবার মধ্যে নিহিত। তাই সেবা করত মনের মাধুর্য দিয়ে। পুত্রবধূও শ্বশুর-শাশুড়িকে পিতা-মাতার মতই ভক্তি-শ্রদ্ধা করত এবং সেই শ্রদ্ধার সাথেই তাদের সেবা করত। তখন বৃদ্ধ পিতামাতাকে কেউ বোঝা মনে করত না। বোঝা মনে করার কল্পনাকেও ভাবা হত কঠিন পাপ। ফলে বৃদ্ধ বাবা-মা পুত্রের সংসারে পরম সমাদরে দিন কাটাত। কিন্তু ইদানীং আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটেছে। অনেক সংসারে তো পুত্র ও পুত্রবধূ উভয়ের কাছে পিতামাতা বাড়তি বোঝা। এ বোঝা তারা খামোখা টানতে রাজি নয়। হ্যাঁ, খামোখা টানাই বটে! জড়বাদী সভ্যতার ছোবলে যাদের চিন্তা-ভাবনা পুরোপুরি নষ্ট-ভ্রষ্ট হয়ে গেছে, পিতামাতার সেবা তাদের কাছে বেগার খাটুনি ছাড়া কিছুই নয়। হাসিমুখে বেগার মেহনত কে-ই বা করতে চায়? সবাই এর থেকে মুক্তি চায়। সেই মুক্তির বার্তা নিয়ে এসেছে পশ্চিমা সভ্যতা। মা-বাবার সেবা থেকে আধুনিক দম্পতির দায়মুক্তির ব্যবস্থা। ভূগর্ভে যাওয়ার আগেই জ্যান্ত দাফনের বৃদ্ধাশ্রম। আধুনিক দম্পতিরা বৃদ্ধ পিতামাতাকে স্নেহ-মমতা বর্জিত সেই ভূপৃষ্ঠের কবরে চালান করে বাড়তি ভার লাঘবের সুযোগ গ্রহণ করছে। আর ধীরে ধীরে সেই অভিশপ্ত বার্ধক্যযাপনের জন্য নিজেদেরও প্রস্তুত করছে।

একথা ঠিক যে, এ অভিশাপ এখনও পর্যন্ত মুসলিম সমাজকে পুরোপুরি গ্রাস করে নিতে পারেনি। কিন্তু যেভাবে এর পক্ষে প্রচারণা চালানো হচ্ছে এবং পিতামাতার সেবাযত্ন থেকে আধুনিক মনমানস যে হারে বিমুখ হচ্ছে, তাতে অসম্ভব নয় যে, মুসলিম সমাজও এই লা'নতী ব্যবস্থার দিকে সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড়বে। তখন ছেলেমেয়েরা তাদের পিতামাতাকে বৃদ্ধাশ্রমের নির্বাসনে পাঠিয়ে নিজেদের জাহান্নামী বানানোর আয়োজন সম্পন্ন করে ফেলবে! সেই দিন আসার আগে এখনই সকলের হুঁশিয়ার হয়ে যাওয়া উচিত। সচেতন মহলের উচিত দ্বীনের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা নিয়ে মাঠে নেমে পড়া। সর্বস্তরের মানুষকে ইসলামের কল্যাণময় শিক্ষা সম্পর্কে উজ্জীবিত করা না গেলে বেদ্বীনী সভ্যতা-সংস্কৃতির সয়লাবে তাদের দ্বীন-দুনিয়া সব ভেসে যাবে।

যাহোক বলছিলাম পুত্রসংসারে পিতামাতার সেবাযত্নের কথা। এক শ্রেণীর আধুনিক দম্পতি তো এ ব্যাপারে বৃদ্ধাশ্রমের শরণাপন্ন হয়েছে। আরেক শ্রেণী চলছে টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে। অনেক পুত্রের ইচ্ছা বৃদ্ধ বাবা-মা তাদের সংগেই থাকুক। কিন্তু সেই ইচ্ছাপূরণে তার স্ত্রীর সায় নেই। তা তার সায়-সম্মতি না থাকলেও পুত্র নিজ ইচ্ছায় অটল। অগত্যা স্ত্রীকে রাজি হতেই হয়। কিন্তু প্রাণের সাড়া না থাকায় শ্বশুর-শাশুড়ির সেবায় তার আন্তরিকতার ছোঁয়া থাকে না। শ্বশুর-শাশুড়িও তা ঢের বুঝতে পারে। ফলে এ সংসারে তাদের নিজেদের অবাঞ্ছিত মনে হয়। তারা হয়তো নিরুপায়। তাই নীরবে সব অপমান মেনে নেয়। অপেক্ষায় থাকে কবে মৃত্যু আসবে আর এ অবমাননাকর বেঁচে থাকা থেকে মিলবে চিরমুক্তি।

পুত্র চায় পিতামাতা সম্মানজনকভাবেই থাকুক এবং বেঁচে থাকুক অনেকদিন। তাঁদের ছায়া তার সংসারে একান্ত দরকার। তাঁরা তার পক্ষে আল্লাহর

Scanned by CamScanner

খোদার সাথে স্টিফেন হকিং-এর সাক্ষাৎ

ইয়াসির পীরজাদা

স্টিফেন হকিং জন্মগ্রহণ করেন ৮ জানুয়ারি। এটা গ্যালিলিওর মৃত্যুর তারিখ। তিনি মারা গেলেন ১৪ মার্চ। এটা আইনস্টাইনের জন্মদিন। আর মাঝের এই গোটা সময়টা তার বেঁচে থাকা কোনো অংশেই কম অলৌকিক নয়। যদিও অলৌকিক কোনো ব্যাপারে এবং ঈশ্বরে তার বিশ্বাস ছিল না।

তিনি ঐসকল প্রশ্নই করেছেন, বিজ্ঞান ও দর্শনের জগৎ যার উত্তর খুঁজছে কয়েক শতাব্দী ধরে। এই জগৎ কীভাবে এল? এই জগতে আমরাই আছি, না আরো কোনো বুদ্ধিমান প্রাণী আছে? জীবনের সবকিছুই কি নির্ধারিত? মানুষ কতদূর অক্ষম, কতটুকু সক্ষম? সময়ের শুরু কীভাবে? অনাদি কী? অনন্ত কী? জীবনের সূচনা কখন? অন্য কোনো গ্রহে কি আমাদের চেয়েও বুদ্ধিমান কোনো প্রাণী আছে? আমাদের পৃথিবীতে সবকিছুই কি বিজ্ঞানের নিয়মাধীন, না বাইরের কোনো শক্তির এখানে কোনো প্রভাব আছে? এই জগৎ যদি নিরন্তর প্রসারমান হয় তাহলে কি কোটি কোটি বছর আগে এর কোনো অস্তিত্ব ছিল? এই জগৎ কি একসময় ধ্বংস হয়ে যাবে ইত্যাদি।

ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞান এসব প্রশ্নের উত্তর দেয়ার চেষ্টা করেছে। 'গুবারে খাতির' পুস্তিকায় আবুল কালাম আযাদ লেখেন, 'কয়েকবার আমার মনে হয়েছে, খোদার অস্তিত্ব আমাদেরকে এজন্যও স্বীকার করে নিতে হবে যে, তা না হলে এই বিশ্বজগতের ধাঁধাঁর কোনো সমাধান থাকে না। অথচ সমাধানের এক তৃষ্ণা আমাদের অস্থির করে রেখেছে। ...এই জগতের প্রত্যেক অংশ, প্রতিটি বস্তু একেকটি জ্বলন্ত প্রশ্ন। আমরা বুদ্ধির সহায়তা নেই এবং যাকে আমরা জ্ঞান-বিজ্ঞান বলি তার আলোতে যতদূর দেখা যায়, চলতে থাকি, কিন্তু এমন কোনো সমাধান পাই না, যা এই গভীর তৃষ্ণা মেটাতে পারে। ...কিন্তু যেইমাত্র আমরা পুরানো সমাধানের দিকে ফিরি এবং আহরিত জ্ঞানের সাথে এইটুকু যোগ করি যে, পর্দার আড়ালে একজন জ্ঞান ও ক্ষমতার অধিকারী সত্তা রয়েছেন তখনই অকস্মাৎ দৃশ্যপট বদলে যায়। মনে হয় যেন অন্ধকার গহ্বর থেকে হঠাৎ আমরা আলোর রাজপথে উঠে এসেছি। এখন যেদিকে তাকান শুধু আলো আর আলো... (অসীম) জ্ঞান ও ক্ষমতার অধিকারী একজন যদি পর্দার পেছনে থাকেন তাহলে এখানের সবকিছু এক সুবিজ্ঞ ইচ্ছার ফল এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে আবর্তিত। এই সামাধানের আলোকে যখন আমরা মহাবিশ্বের জটিলতা নিয়ে চিন্তা করি তখন সকল জটিলতা কর্পূর হয়ে যায় এবং সবকিছুই স্ব স্ব স্থানে স্থিতি লাভ করে।

গোটা 'গুবারে খাতির' বইটিই স্বর্ণের বাটখারায় ওজন করার মতো। কিন্তু এই চিঠিটি, যাতে মাওলানা ধর্ম ও খোদার অস্তিত্বের ধারণা পেশ করেছেন এমন একটি 'মাস্টার পিস', যা মস্তিষ্কের জানালাসমূহ খুলে দেয়। দশ-বারো পৃষ্ঠার মধ্যেই মাওলানা গোটা সমস্যাটি যেন জলবৎ তরলং করে দিয়েছেন।

স্টিফেন হকিং বিজ্ঞানী ছিলেন। সবকিছুকে বিজ্ঞানের মানদণ্ডে বিচার করতেন। তার মতে, ধর্ম ও দর্শন বিশ্বজগৎ সংক্রান্ত প্রশ্নসমূহের প্রশান্তিদায়ক উত্তর দিতে পারেনি। এ যাবৎ বিশ্বজগতের সকল রহস্য বিজ্ঞানের বদৌলতে উন্মোচিত হয়েছে। তার বক্তব্য হচ্ছে, 'আমাদের পৃথিবীতে বস্তুসমূহের চরিত্র এতই জটিল এবং এত বেশি বিষয়ের প্রভাবাধীন যে, প্রাচীন সভ্যতাসমূহের পক্ষে এই জ্ঞানের ব্যাখ্যায় পরিষ্কার কোনো রূপরেখা বা তত্ত্ব আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি। ধীরে ধীরে জ্যোতির্বিজ্ঞানের আওতার বাইরে নতুন নতুন তত্ত্বের আবিষ্কার হয়েছে এবং এ সবই বৈজ্ঞানিক নিমিত্তবাদ (scientific determinism) ধারণার উদ্ভব ঘটায়, যার ফলশ্রুতিতে ধরে নেয়া হয়েছে যে, অবশ্যই একগুচ্ছ পূর্ণাঙ্গ সূত্র আছে, মহাবিশ্বের একটি নির্দিষ্ট সময়কালকে হিসেবে নিয়ে যার মাধ্যমে ভবিষ্যতের মহাবিশ্ব সম্পর্কে আগাম কথা বলা যায়।

'এই সূত্রগুলো সর্বদা ও সর্বত্র একই রকমের হতে হবে। এটা না হলে এগুলোকে সূত্র বলা যাবে না। দৈব বা কোনো কিছুর কারণে এর কোনো ব্যতিক্রম ঘটতে পারবে না। এই মহাবিশ্বের চলমানতায় ঈশ্বর বা অপদেবতার পক্ষে এর ভেতর কোনো হস্তক্ষেপের সুযোগ থাকবে না...।'

এটা জিজ্ঞাসা করা যৌক্তিক যে, কে এবং কী কী দিয়ে এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে। এর উত্তর যদি ঈশ্বর হন তাহলে এর পরবর্তী প্রশ্ন উঠতেই পারে যে, ঈশ্বরকে কে সৃষ্টি করেছেন। এই ধারা মতে এটা গ্রহণযোগ্য যে, এমন একটি অস্তিত্ব বিদ্যমান, যার জন্য সৃষ্টিকর্তার প্রয়োজন নেই। আর তাকেই ঈশ্বর বলা যেতে পারে। একে ইল্লাতুল ইলাল (first cause) বলে। আমাদের মতে বিজ্ঞানের মাধ্যমে এসব প্রশ্নের উত্তর দেয়া সম্ভব এবং তাতে কোনো রকম স্বর্গীয় ঈশ্বরকে আহ্বান করার প্রয়োজন নেই। (The Grand Design 171-172)[১]

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতেই স্টিফেন হকিং সৃষ্টিকর্তার কাছে চলে গেলেন।

আমাদের জন্য নেই, বিখ্যাত M-তত্ত্ব-স্টিফেনের মতে যার মধ্যে বিশ্বজগতের সকল প্রশ্নের জবাব রয়েছে, কখনো আবিষ্কৃত হবে কি না। তবে এটুকু নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, দর্শন ও বিজ্ঞান-সংক্রান্ত (প্রায়) সকল গবেষণা এখন হচ্ছে পশ্চিমা দুনিয়াতেই। ওখানকার ভার্সিটিগুলোতে মুসলিম চিন্তা নায়কদের বইপত্রের উপর আলোচনা হয়। ইবনে রুশদের চিন্তা-ভাবনা তারা আকণ্ঠ পান করেছে। মুসলিম বিজ্ঞানীদের গবেষণা, জ্ঞান ভাণ্ডার ও আবিষ্কারসমূহ সংরক্ষণ করে রেখেছে। ওদের লাইব্রেরি, ওয়েব সাইট ও ইনসাইক্লোপিডিয়া আমাদের জানায় যে, একসময় বাগদাদ ছিল জ্ঞান-গবেষণার কেন্দ্র। সাইন্সের কথা যদি বলেন, তাহলে C E R N তারাই বানিয়েছেন, যেখানে তারা বিশ্বজগতের বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিরহস্য জানার চেষ্টায় ব্যাপৃত। ওদের ওখানে বিগত চার শ বছরে যত দার্শনিক জন্মলাভ করেছে তার দশভাগের এক ভাগও মুসলিম বিশ্বে পয়দা হয়নি। চিন্তার উপর ওদের কোনো বিধি-নিষেধ নেই। প্রশ্ন করার অবাধ স্বাধীনতা। প্রশ্ন এলে তার উত্তর খোঁজা হয়। আমরা তো প্রশ্নের উপরই বিধি-নিষেধ আরোপ করি। আমাদের ভার্সিটিগুলোর অবস্থা হচ্ছে, পিএইচডি ধারী ব্যক্তিদের মধ্যেও প্রশ্ন ও পর্যালোচনা নামক কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। গবেষণাপত্রে তস্করবৃত্তিতে তারাও লিপ্ত, যাদের উপর গবেষণাসমূহের *(বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়)*

[১] উর্দু নিবন্ধে উল্লেখিত উদ্ধৃতিটুকুর তরজমা নেয়া হয়েছে সন্দেশ (প্রকাশনী) থেকে প্রকাশিত 'দ্য গ্রান্ড ডিজাইন' বইটির বাংলা অনুবাদ থেকে। পৃষ্ঠা ১৩৯-১৪০।

Scanned by CamScanner

আমাদের কাছাকাছি আসতে হবে কর্মে, বিশ্বাসে, মানসিকতায়

মুফতী আবুল হাসান মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ

[বিগত ১৯ জুমাদাল আখিরাহ ১৪৩৯/৮ মার্চ ২০১৮ তারিখে মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা-এর হযরতপুর প্রাঙ্গণে নবনির্মিত দাওয়াহ ভবনে অনুষ্ঠিত হয় এসএসসি পরীক্ষা সম্পন্নকারীদের নিয়ে দিনব্যাপী একটি দ্বীনশিক্ষা মজলিস। ঐ মজলিসে দ্বীনের মৌলিক বিষয়াদি আলোচনার পাশাপাশি ছিল কুরআনে কারীমের মশক ও নামাযের মশক। এই মজলিসে বাদ মাগরিব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা-এর সম্মানিত মুদীর হযরত মাওলানা মুফতী আবুল হাসান মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম। তিনি উপস্থিত ছাত্রদের অনেক প্রশ্নেরও জবাব দেন। তাঁর মূল্যবান বয়ান ও প্রশ্নোত্তর এখানে আলকাউসারের পাঠকবৃন্দের জন্য উপস্থাপিত হল। একই ধরনের আয়োজন অনুষ্ঠিত হয় মারকাযের মিরপুর প্রাঙ্গণেও ১৫ জুমাদাল আখিরাহ মোতাবেক ৪ মার্চ ২০১৮। ঐ মজলিসেও তিনি উপস্থিত ছাত্র ও সুধীবৃন্দের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। তারও কিছু অংশ এখানে সংযোজিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদের যথাযথভাবে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন– আমীন।]

হামদ ও ছানার পর

আজকের এ আয়োজনটা মূলত ছাত্রদেরকে লক্ষ করে। এ ছাত্ররা জীবনের একটা স্তর ইতিমধ্যে অতিক্রম করেছে। আমাদের দেশের হিসেবে মাধ্যমিক। পরিক্ষাটার নামও এসএসসি– সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট। অনেক দেশে অবশ্য হায়ার সেকেন্ডারিসহ সেকেন্ডারি ধরা হয়। আমরা যেটাকে বলি, ইন্টারমিডিয়েট বা উচ্চমাধ্যমিক। দুটো স্তরই থাকে। সেকেন্ডারি স্তরের পরে ইউনিভার্সিটি স্তরটা শুরু হয়। এমনিভাবে মানুষের বয়সের একটা স্তর থাকে, শিশু বয়স; একেবারে কোলে কোলে বড় হয়। এরপরে কৈশর; দৌড়ঝাঁপ দিয়ে, লাফ-ফাল দিয়ে বড় হয়। আরেকটা বয়স থাকে তখন চলার বয়স শুরু হয়। ওই স্তরটার সমাপ্তি ঘটে মাধ্যমিক স্তরে এসে।

কাজেই আমরা শুধু একটা পরীক্ষাই দেইনি বরং আমরা জীবনের একটা দিকের পরিপূর্ণতায় পৌঁছেছি। গাছে যেমন ফল ধরলে কিছু ঝরে ঝরে পড়ে যায়। এই যে এখন আমের মুকুল এসেছে। কিছু ঝরে নষ্ট হয়ে যায়। কিছু টিকে থাকে। এরপরে যখন একটু বড় হয়ে ওঠে, তুফান আসলে কিছু পড়ে যায়। মানুষের জীবনটাও এরকম। শিশুরাও এরকম ঝরে যায়। একটা স্তরে গিয়ে আমটা বড় হয়। তখন চাইলে কেউ কাঁচাও খেতে পারে। কিন্তু পাকার পরেই সাধারণত খায়। ওই পাকাটাই ইউনিভার্সিটি লেভেল। আর কাঁচা থাকা একটু বড় হওয়া সেটা হল এই বর্তমান লেভেলটা। এ স্তরেও ফলটা উপকারী হয়, যদি ফলটা খুব বেশি টক না হয়। মানুষ ওটা কাঁচাও খেতে পারে। আর যদি ফলটা ঠিকমত পাকতে পারে, তাহলে সে সবাইকে খুশি করে। মানুষের জীবনটাও এরকম। এভাবেই একটা স্তর থেকে আরেকটা স্তর তাকে অতিক্রম করতে হয়। আমাদের শরীয়তেও ঠিক একই অবস্থা। আমরা যে আল্লাহ্‌র বান্দা, আমরা যে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত, সেখানেও মানুষকে এভাবেই একটার পর একটা স্তরে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। আমি আপনি যখন ছোট ছিলাম, তখন ছিলাম দায়-দায়িত্বমুক্ত। অন্যের কাঁধে আমাদের সব দায়-দায়িত্ব। তখন নির্দেশ– মা-বাবাসহ অন্যান্য যারা আছে তারা খাইয়ে দিতে হবে, অন্যান্য সবকিছু সাফ করতে হবে। বদলিয়ে দিতে হবে। গোসল করিয়ে দিতে হবে। সব অন্যের কাজ।

আরেকটু বড় যখন হয়, যখন অবুঝ থাকে, কিন্তু দৌড়ঝাঁপ দেয়, পাঁচ-সাত-নয় বছর তখনও অন্যদের দায়িত্ব। কিন্তু যখন বুঝ হয়ে ওঠে, দশ -বার বছর হয়ে গেছে তখন একটা নির্দেশ শরীয়তের পক্ষ হতে আসে। হাঁ, নামায পড়া শুরু করো। আল্লাহকে চেনা এবং বুঝা শুরু করো। আর যখন শাবাবের বয়স আসে তখন সে একটা স্পেশাল স্তরে পদার্পণ করে। শাবাব মানে যৌবনের বয়স। পনের-ষোল-সতের থেকে যৌবনের বয়স। কিছু নতুন নতুন শব্দ আছে। তরুণ, তারুণ্য একটা শব্দ আছে, চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশেও তারুণ্য থাকে অনেকের। বলে আমি তরুণ। হাঁ, তারুণ্য মরণ পর্যন্ত থাকা ভালো। কাজের দিক থেকে। কিন্তু তরুণ অর্থ যদি হয় তুমি যাচ্ছেতাই করবে, সে সুযোগ শরীয়ত রেখেছে বুঝ-বুদ্ধি হওয়ার আগ পর্যন্ত। যখন বুঝ হয়ে যাবে তখন যৌবনের বয়স শুরু হল। ইসলামের ভাষায় এটাকে 'শাবাব' বলা হয়। শাবাব মানে যৌবন। এ যুবক বয়সে যখন মানুষ উপনীত হয়, তখন যেভাবে তার শারীরিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, দাড়ি-মোচ গজায়, আরো অনেক বিষয়ে পরিবর্তন আসে, নতুন নতুন চিন্তা আসে, সেভাবে তার দায়-দায়িত্বের মধ্যেও নতুনত্ব আসে।

পড়াশোনার চর্চাও অনেকটা এরকম। পড়াশোনার স্তর ঠিক এখন মাধ্যমিক স্তর অতিক্রমের পরে উচ্চস্তর। দু'বছর পর উচ্চমাধ্যমিকে গেলেই জীবনের একটা বিষয়কে বাছাই করে নেওয়া লাগে। আমাদের এভাবে একত্রিত হওয়া এভাবে বসার উদ্দেশ্যটা হল সবাই সবাইকে বুঝা। সবাই সবার কাছে আসা। কাছাকাছি হয়ে যাওয়া। মুসলমান বলতেই একগোষ্ঠী। এক গোষ্ঠী না? সবার বাবার নাম কী? আদম। আদম আলাইহিস সালাম থেকেই তো আমার আপনার সবার গোষ্ঠী এসেছে। সবার মা? হাওয়া আলাইহাস সালাম। এটা একটা মিল। দ্বিতীয় মিল হল, আমাদের সকলের নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

তাহলে আমি মাদরাসায় পড়ি আর কলেজে পড়ি বা লেখাপড়া নাই করি, শিল্প কারখানায় চাকরি করি, কৃষি কাজ করি, যেটাই করি– আমি মুসলিম। এখানে আমরা ঐক্যবদ্ধ; এটি সবার একটা যোগসূত্র। সবাই এক হয়ে যাওয়ার একটা জায়গা। এক হয়ে যাওয়া মানে শুধু শব্দে এক হওয়া নয়; বরং যে যোগসূত্র দিয়ে আমি আপনি মিলে আছি সেগুলোর দিক থেকে এক হওয়া। সে যোগসূত্রগুলোর চাহিদা কী? যেমন আমরা সবাই একটা কালিমা পড়ি, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু

Scanned by CamScanner

মুহাম্মাদুর রাসূ-লুল্লাহ। আমার আপনার কালিমার মাঝে কি কোনো বেশকম আছে? না। সবার কালিমা এক, অভিন্ন। টাকা পয়সা যখন হয়, তো হজ্জে যায়। হজ্জে যেতে জেনারেল শিক্ষিত, স্কুলপড়ুয়া, জমিদার লোক আর মাদরাসার লোকের কি ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম আছে, না এক নিয়ম? এক নিয়মে জুমার দিন আমরা মসজিদে যাই নামায পড়তে, নামাযের মধ্যে কোনো ভিন্ন নিয়ম আছে? নেই। আচ্ছা, অফিসে তো বস এক চেয়ারে বসে, আর তার কর্মচারী একটা সাধারণ চেয়ারে বসে। কিন্তু নামাযে? বস আর কর্মচারীর কি ভিন্ন ভিন্ন জায়গা আছে? নেই। আল্লাহ্‌র দরবারে সবাই সমান।

ইসলাম মানুষকে এগুলোই শেখায়। সাম্য, সৌন্দর্য এবং শান্তিপূর্ণ মর্যাদাপূর্ণ সহাবস্থান। তুমি জীবনের যে স্তরেই থাক, যে পেশাই তুমি অবলম্বন কর, সবাই সবাইকে সম্মান করবে। সকলেই সকলের ইজ্জত বুঝবে, মূল্যায়ন করবে এবং সবাই কাছাকাছি থাকবে। অবস্থানগত দিক থেকে নিকটে না থাকলেও মনের দিক থেকে কাছাকাছি থাকবে। সবাই যখন মনের দিক থেকে কাছাকাছি থাকবে তো একে অপরের থেকে উপকার নেওয়ার সুযোগ হবে।

আপনি এখন মেট্রিক পড়েছেন, সামনে আরো পড়বেন। আল্লাহ তাআলা নিলে আরো বেশি পড়বেন। আপনি একসময় হয়ত ইঞ্জিনিয়ার হয়ে যাবেন, মাদরাসার লোক আপনার কাছে যাবে। আমি একটি বিল্ডিং বানাব, মসজিদ বানাব, আপনি মসজিদটার একটু ডিজাইন করে দিন, এটা দ্বীনের কাজ। মাদরাসা-মসজিদের উপকারে আসলেন কি আসলেন না? আসলেন।

এই যে, মসজিদ বানাতে যিনি টাকা দিলেন, মসজিদে যিনি ইমামতি করবেন, মসজিদে যিনি আযান দিবেন, তারা যেমন সওয়াব পাবেন যিনি এই মসজিদের ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করবেন তিনি সওয়াব পাবেন না? নিশ্চয়ই পাবেন। শুধু উদ্দেশ্যটা ভালো হতে হবে। উদ্দেশ্যটা ভালো হতে হবে যে, আমি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছি, মানুষের সেবা করার জন্য। মানুষ যেন ভুল বিল্ডিং বানিয়ে অর্থ নষ্ট না করে, ভেংগে না পড়ে। মানুষের যেন টাকা নষ্ট না হয়, ক্ষতি না হয়– এ মানসিকতা থাকতে হবে।

আমি চিকিৎসা বিষয়ে পড়তে চাচ্ছি, এখন তো এসব বিষয়ে পড়ার কথা বেশি বলে না। আগে ছেলেরা বলত, আমি ইঞ্জিনিয়ার হব, আমি ডাক্তার হব, এখন আর এগুলো বলে না। এখন বলে, আমি এমবিএ করব। বিবিএ করব। তাহলে একটা কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানে চাকরি পেয়ে যাবে। হোক! এমবিএ, বিবিএ করলেও সমস্যা না। এমবিএ করল, কোনো প্রতিষ্ঠানের এইচআর সেকশনে সে যোগ দিল, ওই প্রতিষ্ঠান হয়ত কোনো সেবা দেবে, না হয় কোনো প্রোডাক্ট তৈরি করবে, সে পণ্য দিয়ে মানুষ উপকার পাবে। সে সেবা দিয়ে মানুষ উপকার পাবে। যদি ওটা নাজায়েয কিছু না হয়, তার উদ্দেশ্য যদি ভালো থাকে তো সওয়াব পাবে।

এখন আমি যদি আলেমদের কাছাকাছি না যাই তাহলে তো আমি এ বিষয়টা জানতে পারব না। সারা জীবন কাজ করে গেলাম শুধু দুনিয়ার ক'টা পয়সা পেলাম। শুধু বেতন পেলাম, কিন্তু এটা যে আখেরাতেও কাজ দিতে পারে তা জানলাম না। সৎ উদ্দেশ্য কীভাবে হবে তাও হাসিল করতে পারলাম না।

আর যদি আমরা পরস্পর কাছাকাছি থাকি, তাহলে আপনার ভালোটা আমি বুঝব, আমার ভালোটা আপনি বুঝবেন। এজন্য মুসলমান হিসেবে সবাই কাছাকাছি আসা– এটা আমাদের দাওয়াত। আমরা এটা বলতে চাই সবাইকে।

এ কাছাকাছি আসার যে দাওয়াতটা দিচ্ছি, আমি গতবারও মেট্রিকের ছেলেদের বলেছিলাম, এটা বলতে হচ্ছে সময়ের প্রয়োজনে। আসলে যদি যথাযথ পদ্ধতি থাকত তাহলে এটা বলার দরকার ছিল না। আমাদের এখানে শিক্ষাপদ্ধতির যে বৈষম্য; শিক্ষাপদ্ধতিতে যে সিলেবাস রাখা হয়েছে তা কোনোক্রমেই যুক্তিসংগত সিলেবাস না। বিশেষত একটা সময় ছিল –আপনারা ইতিহাসে পড়েছেন– এখানে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন ছিল। বৃটিশদের শাসন ছিল দু'শ বছরেরও বেশি। তখন তারা তাদের নিয়মের শিক্ষাপদ্ধতি চালু করেছে। এরপরে দেশ দু' দু' বার স্বাধীন হয়েছে। একবার পাকিস্তান হয়েছে, আবার পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ হয়েছে। কিন্তু শিক্ষার যে পদ্ধতি রাখা হয়েছে, তাতে আমাদের একটা ছেলে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পড়ে ফেলে, কিন্তু এমন ব্যবস্থা রাখা হয়নি যে, সে অন্তত আল্লাহ্‌ নাম শুদ্ধভাবে ভালো করে পড়তে পারে। ধর্মীয় শিক্ষার নামে দু'-একটা বই আছে। কোনো রকম পরীক্ষা দেওয়া হয়ে যায়। এমন কোনো পদ্ধতি রাখা হয়নি, যে পদ্ধতি থেকে সে জানতে পারে যে, একজন মুসলমান হিসেবে তার দিনটা কীভাবে শুরু হবে। এমন পদ্ধতি নেই, যেখান থেকে সে জানবে যে, বেচা-কেনা করতে গেলে সেখানে কোন্‌টা শুদ্ধ কোন্‌টা অশুদ্ধ?

সে যখন বাবার সাথে কৃষিকাজে সহায়তা করতে যাবে, সেখানে কোন্‌টা শুদ্ধ, কোন্‌টা অশুদ্ধ? সে যখন খাবার কিনবে ওই খাবারের মধ্যে কোন্‌টা শুদ্ধ, কোনটা অশুদ্ধ; কোনটা হালাল, কোনটা হারাম? সবচেয়ে বড় যে বিষয়, সে যখন তার পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন; বন্ধু-বান্ধবের সাথে তার জীবন যাপন করবে, তখন সেখানে তার কোন্‌টা করা উচিত, কোন্‌টা উচিত নয়– এটি সে জানতে পারছে না।

আপনি বলতে পারেন যে, ছেলে তো শিক্ষিতই হচ্ছে, এগুলো না জানলে কী হবে? শিক্ষা-দীক্ষা তো সে হাসিল করছে। বরং মডার্ন শিক্ষা-দীক্ষা হাসিল করছে। যে শিক্ষা দিয়ে আজকের পৃথিবী উন্নতি করে যাচ্ছে, সে শিক্ষাই তো সে হাসিল করছে। অবশ্যই হাঁ, সে শিক্ষিত হচ্ছে। তার বুদ্ধি হচ্ছে। জ্ঞান হচ্ছে। এ শিক্ষা জীবনে কাজ দিবে। সবকিছুই ঠিক; কিন্তু এ শিক্ষাটা যথাযথ উপকারে আসার জন্য এবং শিক্ষাটাকে ভালোভাবে দ্বিগুণ, বহুগুণে কাজে লাগাবার জন্য এ জিনিসগুলো যদি সাথে যোগ হত তাহলে শিক্ষা আরো অনেক বেশি ফলপ্রসূ হত। শিক্ষা বেশি কাজ না করার কারণ এটাই।

আমরা দুআ করি, সামনে আপনাদের লেখাপড়ার সময় পার হবে, আরো বড় হবেন, আরো ভালো পড়বেন এবং ভবিষ্যতে ভালো অফিসার হবেন, সৎ অফিসার হবেন, ভালো ব্যবসায়ী হবেন, সৎ ব্যবসায়ী হবেন, দেশ-বিদেশে যেখানেই চাকরি করবেন, নিজেদের নাম, মা-বাবার নাম, দেশের নাম উজ্জ্বল হবে এবং আখেরাতেও এটার দ্বারা যেন ফায়দা হয় এটাই আমাদের কামনা।

আমরা তা-ই চাই। আপনাদের ভবিষ্যত নিয়ে আমাদের ভালো আশা। শিক্ষা দিয়ে মানুষ ভালো হতে পারে, ভালো হয়, কিন্তু তারপরও শিক্ষিত লোকদের কারণে বড় সমস্যাগুলো হচ্ছে কেন? দেশের মধ্যে একটা সংস্থা আছে। যদিও তার নামে অনেক বদনামও আছে। তারপরও দেখুন এ দুদক– দুর্নীতি দমন কমিশন এ পর্যন্ত যাদেরকে ধরেছে, কোনো অশিক্ষিত লোক ধরেছে? না। কোনো

Scanned by CamScanner

কৃষক, শ্রমিক ধরেছে? না! সবাই উচ্চশিক্ষিত। ভালো ভালো শিক্ষিত! তাহলে আপনি কি বলবেন, শিক্ষার দোষ? না। শিক্ষার দোষ নয়। শিক্ষার কমতি। শিক্ষা ছিল কিন্তু সেই শিক্ষার সাথে আরো কিছু জিনিস থাকা দরকার ছিল। ওই যে রেসিপিতে সমস্যা; রেসিপিতে যা যা উপাদান দেওয়ার দরকার ছিল, উপাদান সবগুলো দেওয়া হয়নি। উপাদান কিছু কম থাকার কারণে গোস্ত রান্না করেছে বটে, কিন্তু লবণ কম দেয়ায় ওটা পানসে পানসে থেকে গেছে। নাইলে লবণ বেশি হয়ে গেছে। দামী জিনিস কিন্তু খাওয়া যাচ্ছে না। শিক্ষা হাসিল করেছে ঠিক কিন্তু সেই শিক্ষার সাথে তার আরো কিছু শিক্ষার দরকার ছিল। এ শিক্ষাটা কার্যকর হওয়ার জন্যে, এ শিক্ষাটা তাকে বেশির চে' বেশি উপকার দেয়ার জন্যে তার আরো কিছুর দরকার ছিল। কিন্তু সেটা সে পায়নি। সিস্টেমের কারণে পায়নি।

আমাদের সমস্যাটা হল, –আপনারা বড় হলে আরো জানবেন, যখন নিজেরাই অনার্স, মাস্টার্স করবেন তখন নিজেরাও ভালো বুঝবেন– শিক্ষার জন্য যে সিলেবাস তৈরি হয়, তার জন্য অনেক খাটুনি হয়। দেশের কোটি কোটি টাকা ব্যয় হয়। বিদেশে গিয়ে –অনেক দেশেই যায়– ধারণা এনে তারপরে এখানে শিক্ষানীতি তৈরি হয়। সিলেবাস তৈরি হয়। কিন্তু আসলে শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য তো শুধু বিদেশ দেখলে হবে না। প্রত্যেক জাতি এবং প্রত্যেক দেশের নিজস্ব কৃষ্টিকালচার আছে। যেমন, এখানে আপনারা এসেছেন অনেকের বাপ-চাচা সাথে আছে। আপনার বয়সের কেউ ধরুন ২০-২১ বছর হয়ে গেলে যে সব রাষ্ট্রকে আমরা উন্নত রাষ্ট্র বলি, সেখানে বাবা মা'র সাথে সন্তানদের দেখা হয় না। তারাও উচ্চশিক্ষিত। তারপর? গত বছর পড়েছিলাম বিদেশী একটি পত্রিকায়। এখন আমেরিকাতে মেডিকেলে লাশ দিয়ে দেওয়ার পরিমাণ অনেক হারে বেড়েছে। জীবনের শেষের কথা বলছি। মানুষ তো ছোট বড় সব বয়সেই মরে। বেশিরভাগই বয়স হলে মরে। সেখানে মেডিকেলে লাশ দিয়ে দেওয়া অনেক হারে বেড়েছে। কেউ যদি এ সংবাদের শুধু শিরোনাম পড়ে এবং যদি সে মডার্ন ব্যক্তি হয়, বলবে যে, এ তো ভালো। তারা রিসার্চের জন্য অবদান রাখছে। কিন্তু আপনি যদি খবরের ভেতরের অংশ পড়েন, তো আপনার শরীরের লোম দাঁড়িয়ে যাবে। ভেতরে লেখা আছে, কারণ হল, ওখানে সৎকার করতে যত টাকা খরচ হয়, ছেলেমেয়েরা মা-বাবার জন্য অত টাকা খরচ করতে চায় না। পাঁচ হাজার ডলার, দশ হাজার ডলার খরচ হয়ে যাবে তা তারা মেনে নিতে পারে না। এখানে যে রকম দাফন করতে অল্প টাকা খরচ হয়, এত অল্প টাকায় ওখানে পারে না। কয়েক হাজার ডলার খচর হয় সৎকারের জন্যে। আমাদের ভাষায় দাফন করার জন্যে। ছেলে-মেয়ে তো মৃত্যুর আগে এমনিতেই বয়স্ক মা বাবার কাছে ধারে থাকে না। কোথায় থাকে? মা-বাবারা তো যখন চাকরির বয়স শেষ হয়ে যায় বেশিরভাগ সময়ই নার্সিং হোমে বা ওল্ড কেয়ার হোমে থাকে। বয়স্কদের পুনর্বাসনকেন্দ্রে থাকে। আর ছেলেমেয়ে বিভিন্ন জাগায় যে যার মত থাকে, চাকরি-বাকরি করে। দু'-এক সময় হসপিটালে এসে দেখে যায়। তারপর যখন মৃত্যু হয়, তাকে হয়ত জানানো হয় ফোনের মাধ্যমে বা অন্য কোনোভাবে, তোমার বাবা মারা গেছেন। ওরা বলে যে, মেডিকেলে দিয়ে দাও! কেউ কেউ আসে। এসে লাশ নিয়ে সৎকার করে। আবার কেউ কেউ বলে যে, আমি টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছি ব্যাংকে, তোমরা সৎকার করিয়ে দাও!

এরা কিন্তু শিক্ষিত জাতি! এবং উন্নত জাতি!! আপনি হয়ত বলবেন, আমাদের জওয়ানদের তো অসুবিধা নেই। বুড়োদের সাথেই না এ আচরণ করা হয়। তাহলে কি এ জওয়ানগুলো বুড়ো হবে না? একসময় তাদের ছেলেমেয়ে হবে না? তারা বুড়ো হবে না? এখন তারা তাদের মা-বাবার সাথে যে আচরণ করছে, তাদের সাথে তখন সে আচরণ হবে না?

শিক্ষা আছে, তবে শিক্ষার মধ্যে কমতি আছে। শিক্ষাতে কিছু কিছু জিনিস যদি যোগ করা হয়, তাহলে এ শিক্ষা বহুগুণ কাজ দেবে।

আমরা চাই মুসলমানের সন্তানেরা শিক্ষিত হোক। শিক্ষিত সমাজ হোক। এটা একটা লম্বা বিষয়। আমি শুধু সংক্ষেপে বলছি যে, কাছাকাছি চলে আসা। শিক্ষার মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পড়া হল, কিছু জিনিস বাকি রয়ে গেল, সেগুলো যেহেতু আমাদের স্কুলে পড়া হয়নি, সামনেও হয়ত আর পড়া হবে না। সেগুলো আমাদের শিখতে হবে তাই শিখব। আলেমদের কাছাকাছি যাব। আল্লাহর কুরআন শিখতে চেষ্টা করব। আমাদের সামাজিক জীবনটা কেমন হওয়া চাই তা শিখতে চেষ্টা করব। আমাদের জীবনটা যেন অর্থবহ হয়। যেন আমরা পারিবারিকভাবে, সামাজিকভাবে সুন্দর হয়ে থাকতে পারি। কেউ যেন এরকম না হয় যে, আমাকে আমার পাওয়ারের কারণে ভয় করছে। ক্ষমতাবান লোকেরা কেউ গ্রামে থাকে, কেউ শহরে থাকে। যেখানের ক্ষমতাই বলেন, এদের মধ্যে দু'ধরনের লোক দেখবেন, সবাইকে মানুষ ভয় করে। কিন্তু কাউকে ভয় করে ইজ্জত সম্মান করে আর কাউকে ভয় করে মানে হল তাকে বাঘের মত ভয় করে। দেখলে পালায়। এ আমাকে মারবে– এ কারণে ভয় করে। আরেকজনকে তাঁর মর্যাদার কারণে ভয় করে। আমরা এমনভাবে জীবনটাকে গড়ব, যেন আমার শিক্ষা, আমার ক্ষমতা, আমার পাওয়ার, আমার চলা-ফেরা সব দেখে সমাজের সবাই জানে, এ ছেলেটা সৎ ও ভালো। ছোট বেলা থেকে দেখে আসছি, এ কারো সাথে ঝগড়া করে না। এ মানুষকে দেখলে সালাম দেয়। এ মুরুব্বীদেরকে ইজ্জত করে চলে। এ মারামারি করে না। একে কোনো সময়ই কারো জিনিসে বিনা অনুমতিতে হাত দিতে দেখা যায়নি। এ ছেলেটাকে কিন্তু কোনো সময়ই দেখিনি সিগারেট টানতে। এটা যেন মানুষের মুখে মুখে থাকে। যেগুলো স্বীকৃত ভালো কাজ সেগুলো যেন আমরা করি। যেগুলো স্বীকৃত মন্দ সেগুলো থেকে দূরে থাকি। আজকাল তো আরো খারাপ জিনিসের সয়লাব হয়ে গেছে– মাদক। বলা লাগবে না, আপনারা নিজেরাই বোঝেন। গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। সেগুলোর তো নামও ধরা যাবে না। ধূমপানের অভ্যাসও যদি কারো থেকে থাকে, আস্তে আস্তে তা থেকে দূরে সরে যাওয়া। নিজের মধ্যে গুনাহের চাপ সৃষ্টি না করা। এভাবে আমরা ভালো কাজগুলো করব। মন্দ কাজগুলো থেকে বাঁচবো এবং কাছাকাছি থাকব।

আপনারা জানেন, এখানে প্রতি মাসের প্রথম সোমবার মাহফিল হয়। আপনাদের জন্য হয়, সেখানে আসার চেষ্টা করব। ওটা ছাড়াও আমাদের যে মাওলানা সাহেবরা এখানে আছেন– ছাত্ররা, তারা আপনাদের বড় ভায়ের মত। এরা গ্রাজুয়েট লেভেল শেষ করে এখানে পড়তে এসেছে। এখন হাদীসের উপর, ফিকহের উপর, দাওয়াহ্‌র উপরে হায়ার স্টাডি করছে। উপরের পড়া এরা পড়ছে। তো

Scanned by CamScanner

এরা এখন আপনাদের খেদমতে আছে। এরা সারা বছর আপনাদের খেদমত করতে প্রস্তুত থাকবে। আপনারা আসলে দ্বীনী কথা শিখিয়ে দেওয়া, কুরআন শিখিয়ে দেওয়া, হাদীস শিখিয়ে দেওয়া এবং আপনাদের প্রয়োজনীয় মাশওয়ারা দেওয়া, পরামর্শ দেওয়া– এগুলো আপনারা ইনশাআল্লাহ নিতে পারবেন এখান থেকে। আমি লম্বা করতে চাই না। রাত হয়ে গেছে। এখন আপনাদের প্রশ্নগুলোর জবাব দিচ্ছি।

প্রশ্নোত্তর পর্ব

প্রশ্ন : ভিডিও ওয়াজ ও গজল শোনা অথবা দেখা কি জায়েয আছে? যদি জায়েয থাকে তাহলে মসজিদের ভেতরে কি দেখা জায়েয আছে?

উত্তর : মসজিদের ভেতরে এগুলো না চালানো উচিত। আপনি আপনার ঘরে যদি দেখেন এবং সেখানে যদি ছবিগুলো পুরুষের হয় তা হতে পারে। তবে বাছাই করে শুনতে হবে। ওয়াজ অনেকেই করে। ডাক্তার যে রকম বাছাই করে নিতে হয়, ইঞ্জিনিয়ার যে রকম বাছাই করে নিতে হয় ওয়াজও এরকম বাছাই করে শুনতে হবে। নির্ভরযোগ্য আলেমদের সাথে মাশওয়ারা করে নেব; কার ওয়াজ শুনব, কার ওয়াজ শুনব না।

প্রশ্ন : হুজুর! আমার ছোট বেলায় শারীরিক অবস্থা খারাপ ছিল। তখন আমার আব্বা নিয়ত করেছেন, যদি আমার ছেলে সুস্থ হয়ে যায়, তাহলে মাদরাসায় পড়াবেন। আমি বড় হয়ে যাই। কিন্তু আমার আব্বা আর আমাকে মাদরাসায় পড়াননি। এখন চিন্তা করছি কী করা উচিত?

উত্তর : হাঁ, মাদরাসায় কীভাবে পড়বেন, তা জেনে নিবেন। মাদরাসায় ভর্তি না হলেও হবে। মাদরাসায় যা পড়ানো হয় ওগুলোর কিছু অংশ পড়লে হবে। আবার বলছি, মাদরাসায় যেমন কুরআন শেখানো হয়, হাদীস শেখানো হয়, ওগুলোর এক পার্সেন্ট শিখুন। আধা পার্সেন্ট শিখুন। ইচ্ছা রাখুন, আস্তে আস্তে অগ্রসর হতে থাকুন। কিছু কিছু করে শিখবেন ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন : আমরা যারা স্কুলে পড়ি, আমাদেরকে বাধ্য হয়ে মেয়েদের সঙ্গে একসাথে ক্লাশ করতে হয়। আমরা কীভাবে চোখের গুনাহ থেকে বেঁচে থাকব?

উত্তর : এটাও একটা বড় বিপদ। যেটা একটু আগে বললাম যে, শিক্ষা আলো ছাড়ায়। শিক্ষা মানুষকে আলোকিত পথ দেখায়। কিন্তু সে শিক্ষার মধ্যে যদি পদ্ধতিগত ত্রুটি থাকে? সে শিক্ষার মধ্যে যদি কমতি থাকে? যথাযথ আলো আর ছড়াতে পারে না। অনেক সময় উল্টো বিপদের কারণ হয়। রাষ্ট্রের কত মাথাব্যাথা! ইভটিজিং-এর জন্য আইন করে। আইন করতে করতে শেষ। পেপার পত্রিকায় এ রিপোর্ট, সে রিপোর্ট ক'দিন হৈচৈ হয়। শেষ হয়ে যায়। মেয়েরা তো পড়বে সেটা তাদের অধিকার। কিন্তু তার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা কেন করা হয় না? সবাই একসাথে পড়ে। একসাথে পড়া হয়। ঝামেলা হয়। এগুলোর জন্য ডান-বামের তরিকা খোঁজ করা হয়। আসলটা খোঁজ করা হয় না। আসল পদ্ধতি হচ্ছে, ছেলে-মেয়েদের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় পড়াও। উঠতি বয়স। ছেলের বয়সও উঠতি। মেয়ের বয়সও উঠতি। সেখানে ভুল-ভ্রান্তি হতে পারে। ভুল-ভ্রান্তি থেকে বাঁচার ব্যবস্থা নিতে হবে। ভুল-ভ্রান্তি হওয়ার পরে গণ্ডগোল করা কেমন? আর এ ছাড়া মেয়েদেরকে অন্যায়ভাবে ডিস্টার্ব করা, সেগুলোও আছে। এখন শুধু শুধু বলা হচ্ছে যে, অধিকার! আজকেও তো আছে– আন্তর্জাতিক নারী দিবস। আমি ঢাকা থেকে আসার সময় ছেলে গাড়িতে রেডিওর খবর ছেড়ে দিয়েছে। সেখানে কয়েকজন নারী শোনাল যে, কীভাবে নারীর উন্নতি করে ফেলেছে!! নারীর উন্নতি করার প্রসঙ্গে ফুটবল খেলোয়াড়ের কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে। সে বলছে, আমার মা-বাবা বাধা দিয়েছিলো। আমি কিন্তু অগ্রসর হয়ে গেছি। পেরে গেছি। করে ফেলেছি। দেশ নাকি উন্নত হয়ে গেছে। ফুটবল খেলোয়াড় যদি ফুটবল খেলে থাকে এতে নারী জাতির কীভাবে উন্নতি হল? নারী জাতি কীভাবে এর দ্বারা লাভবান হল? যদি বলেন যে, সে টাকা-পয়সা পেয়েছে। লাভবান হয়েছে।

আদৌ লাভবান হয়েছে কি না সন্দেহ আছে। ফুটবল সে খেলছে। কয়দিন খেলবে? কয়দিন খেলা যায় ফুটবল? চল্লিশ বছর পর্যন্ত তো খেলা যায় না। এক আধ খেলোয়াড় হয়তো চল্লিশ বছর পর্যন্ত খেলে, পুরুষ হলে। মেয়ে খেলোয়াড় হয়তো সে ত্রিশ বছর পর্যন্ত খেলবে। এরপরে তার ক্যারিয়ার কোথায় যাবে? শরীরের গতি কোথায় গিয়ে পৌঁছবে? সে যদি ভবিষ্যতে মা হয়, যদি আরেকজনের স্ত্রী হয়, কোথায় যাবে তার অবস্থা? সে তো জীবনের উন্নতি ভেবে ফেলেছে যে, এখন আমি খেলছি, আমি তারকা হয়ে গেছি। কিন্তু তারকা হয়ে যখন সে জীবনের আরেকটা ধাপে পৌঁছবে তখন সে বুঝবে। চোখে শুধু অন্ধকারই দেখবে। কেন মা-বাবার কথা শুনিনি! কেন আমি গেলাম ফুটবল খেলতে! কিন্তু বলা হচ্ছে যে, নারীরা উন্নতি করে ফেলছে!! আসলে কীভাবে নারীর উন্নতি হয় সেটাই আমরা ভুলে চলছি। ও পথটাই আমরা দেখাতে চাই। নারীদের শিক্ষা দেব। তাদের মর্যাদা রক্ষা করে শিক্ষা দেব। তাদের জন্য স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান করব। কিন্তু স্বার্থপর মহল ওটা করতে দেয় না। মনে করে যে, মিলে ঝুলে থাকলেই তো সুবিধা। অনেক জায়গায় অনেক শিক্ষকের ব্যাপারেও বহু হাবি-জাবি কথা শোনা যায়। ছাত্রীদের অপমান করার কথা শোনা যায়। এগুলো শুধুই শিক্ষার পদ্ধতিগত দোষের কারণে। শিক্ষা-পদ্ধতিটা যথাযথ না হওয়ার কারণে এগুলো হচ্ছে।

যাই হোক, এখন যেহেতু এই পরিস্থিতিতে আমরা থাকছি। পড়ছি একই প্রতিষ্ঠানে সুতরাং যদ্দূর সম্ভব দৃষ্টির হেফাজত করতে হবে। আমরা নিজেরা নিজেদের পড়া পড়ব। স্কুলে যাব, কলেজে যাব, নিজের পড়া পড়ব। যতটুকু সম্ভব কোনো মেয়ের সাথে কথা বলা থেকে বিরত থাকব। এভাবেই নিজের দৃষ্টির হেফাজত করার চেষ্টা করতে হবে। দৃষ্টি অবনত রাখা। বইয়ের দিকে রাখা। এভাবে চেষ্টা করতে হবে।

প্রশ্ন : আমার স্কুলের বন্ধুদের মধ্যে অনেকে আছে যারা হিন্দু। কিছু বন্ধু অনেক ঘনিষ্ঠ। তারা অনেক সময় তাদের বাড়িতে আমন্ত্রণ করে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যেতে বলে এবং খেতে দেয়। অনেক সময় মাংসও দেয়। না খেলে বা না গেলে তারা অনেক রাগ করে। কষ্ট পায়। জানার বিষয় হল, এ ধরনের আমন্ত্রণে যাওয়া যাবে কি না?

উত্তর : সহপাঠীর সাথে খাতির থাকা তো স্বাভাবিক। কোনো সময় সে হয়ত আপনার বাড়িতে এসে যাবে, কোনো সময় আপনি যাবেন। হতে পারে। কিন্তু খাবার-দাবারের ব্যাপারে একটু বাছ-বিচার করতে হবে। সে বাছ-বিচারটা হল, যদি গোশতজাতীয় খাবার দেয়, মুরগি দিল, খাঁসির গোশত দিল তাহলে জিজ্ঞাসা করে নিতে হবে। কিরে, এটা কোত্থেকে আনলি? মুরগিটা কোত্থেকে আনলি? বাজার থেকে এনেছি। তো বাজার থেকে যে এনেছে কেটেকুটে এনেছে, না এখানে কেটেছে! তো সবজি-

Scanned by CamScanner

টবজি আছে? মুরগি খেতে ভালো লাগছে না রে! তখন কৌশলে সবজি খেতে হবে। মাছ খেতে হবে। আর যদি বলে, না বাজার থেকে অমুকের দোকান থেকে এনেছি, তাহলে তো বোঝাই যাচ্ছে কে জবাই করেছে। কার দোকান। তখন খেতে পারবে। কিন্তু তাদের ঘরে যদি জবাই হয়, তাহলে খাওয়া যাবে না। কুরআনে কারীমে নিষেধ করা হয়েছে। মুসলমানদের যে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলো আছে তার মধ্যে অন্যতম হল, মুসলমানরা কোনো প্রাণী খেলে নিজেরা বিসমিল্লাহ বলে জবাই করে খেতে হবে। মাছ ছাড়া, পানির প্রাণী ছাড়া। এটা অন্যরা করে না। ইয়াহুদীদের মধ্যে কিছু আছে, তারা করে। অন্য ধর্মের মধ্যে এটা নেই।

আরেকটা কথা সাথে যোগ করি সেটা হলো, বন্ধুত্ব। এখানে লিখেছে হিন্দু বন্ধু থাকে। আগেই বলেছি নিজের ক্লাসমেট হিসেবে সম্পর্ক দূষণীয় নয়। ন্যূনতম খাতির থাকতে পারে। একজন মুসলমান হিসেবে আমি সবার সাথে সদাচরণ করব। তার বিপদে এগিয়ে আসব। সে অসুস্থ হলে সেবা শুশ্রূষা দেওয়া দরকার, ডাক্তার দেখানো দরকার। এগুলো আমি করব। সব ঠিক, কিন্তু একেবারে অন্তরঙ্গতা, অন্তরের ঘনিষ্ঠতা; একজন আরেকজনের পেটের খবর জানা– এটা চলবে না। কুরআনের নির্দেশ হল, মুসলমান কেবল মুসলমানের সাথে এমন সম্পর্ক করবে। মুসলমান কোনো অমুসলমানের সাথে এটা করবে না। বর্তমানে পৃথিবীতে খালি মুসলিমদের সমস্যা নিয়ে সবার মাথাব্যথা। রাষ্ট্রপর্যায় থেকে আরম্ভ করে আমাদের ব্যক্তিপর্যায় পর্যন্ত অমুক জায়গায় মুসলমান মারা যাচ্ছে, অমুক জায়গায় এ হয়ে যাচ্ছে, অমুক জায়গায় সে হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সব জায়গার গোড়ার সমস্যাটা হল ওটা। সেটা আমাদের বন্ধু-বান্ধব বরং ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধব, অন্তরের সম্পর্কওয়ালা বন্ধু-বান্ধব, রাষ্ট্রীয় পর্যায়সহ অন্যান্য পর্যায়ে অমুসলিমরা। এটা একটা বড় বিপদ। এজন্য বলছি, স্বাভাবিক সম্পর্ক। কিন্তু একেবারে পেটের খবরের বন্ধুত্ব, সেটা আমরা শুধু মুসলমানদের সাথেই রাখব। অন্যদের সাথে নয়।

প্রশ্ন : আমার এক সহপাঠী ইসলামের কিছু বিধানের ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করে থাকে। আমার প্রশ্ন হল, তাকে আমি কীভাবে দাওয়াত দিব? কোন্ বইগুলো পড়তে বলব? মাঝেমধ্যে খুব হতাশা প্রকাশ করে। সে জানতে ও বুঝতে আগ্রহী।

উত্তর : এটার জন্য আমাদের এখানে যোগাযোগ করবেন। এটা যে কারো জন্যেই, যে প্রশ্ন করেছে তার জন্য এবং আমাদের নিজেদেরও কখনো ইসলামের কোনো বিষয়ে কোনো ভুল ধারণা সৃষ্টি হতে পারে। ইসলামের ব্যাপারে, দ্বীনের ব্যাপারে কোনো সময় মাথায় উল্টো বুঝ এসে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে আমাদের প্রথম কাজই হল দ্রুত আলেমদের কাছে আসা, বুঝতে চেষ্টা করা। তাদেরকে সমস্যাটা খোলামেলা বলব। ইনশাআল্লাহ সমাধান হয়ে যাবে।

প্রশ্ন : ব্যাংকে চাকরি করা হারাম না হালাল?

উত্তর : আপনারা তো জানেনই ব্যাংকে সুদি কারবার হয়। অনেকেই প্রথম ক্যারিয়ারের জন্য সহজটা খোঁজ করে। ব্যাংকে যোগ দেয়। যখন গ্রাজুয়েট হবে, মাস্টার্স করবে এ চাকরির অফার আসবে, ওই চাকরির অফার আসবে। চাকরি আমরা ভালোটা খোঁজ করব। কিন্তু ব্যাংকের চাকরি খোঁজ করব না। ব্যাংকে সুদের কারবার হয়। তাই এখন থেকেই সংকল্প করা, নিয়ত করা। নিয়ত করলেই আল্লাহ তাআলা রাস্তা বের করে দেন। রাস্তা বের হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

এখন থেকেই এ নিয়ত করার দরকার নেই যে, আমি একজন ব্যাংকের অফিসার হয়ে যাব। ব্যাংকের অফিসার দেশের কত পার্সেন্ট লোক? ব্যাংকের অফিসার ছাড়া বাকিরা ভাত খায় না? তাহলে কেন আমি ব্যাংকে যাব? ব্যাংকের যে মালিক, যে শেয়ার হোল্ডাররা, ব্যাংকের যে বোর্ড অব ডিরেক্টরস তারা সুদের কারবার করে লাভবান হবে, আমি তাদের চাকরি করে যাব? অন্যে খাবে সুদ আর আমি...?

ব্যাংকের কাজটাও কঠিন। আপনাদের জানা থাকবে, ওখানে অফিস টাইম বলতে কথা নেই। যায় একটা টাইমে। কিন্তু আসবে যখন ব্যাংকের কাজ শেষ হবে। সন্ধ্যার পরে আসে। রাত আটটায় আসে। তো এতক্ষণ পর্যন্ত কাজ করলাম। আমি তো পরিশ্রম করে পয়সা নিলাম, কিন্তু ব্যবসা করল অন্যরা। আর গুনাহের ভাগী আমিও হলাম। আমি কেন শ্রম দিয়ে গুনাহের ভাগী হতে যাব? আমি অন্য কাজ করতে পারি না?

প্রশ্ন : হুজুর! যদি ইসলামী ব্যাংক হয়?

উত্তর : হাঁ, ইসলামী ব্যাংক যদি শুদ্ধভাবে চলে তাহলে ঠিক আছে। কিন্তু ইসলামী ব্যাংকের কেউ কেউ আছে, শুধু ইসলামী ব্যাংকিংয়ের নাম নেয়, শুদ্ধভাবে চলে না। তাহলে আবার সমস্যা। আর যদি শুদ্ধ ইসলামী ব্যাংক হয় তাহলে ঠিক আছে। এটা আমাদের কাছে আসলে বুঝিয়ে বলব ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন : আত্মীয়দের কার কার সাথে পর্দা করতে হয়? ভাইয়ের স্ত্রী, খালাতো বোন, চাচাতো বোন এবং চাচি, মামির সাথেও কি পর্দা করতে হয়?

উত্তর : কুরআন শরীফে চৌদ্দ শ্রেণির নাম আছে। চতুর্থ নাম্বার পারার শেষ, পঞ্চম পারার শুরু– এ অংশের মধ্যে। এখানে যে চৌদ্দ প্রকারের উল্লেখ আছে এরা ছাড়া সবার সাথে পর্দা করতে হবে। যেমন মা, দাদি, নানি, বোন, ফুফি, খালা, এবং এ জাতীয় আরো কিছু আছেন। তো তারা ছাড়া বাকি যারা দূরবর্তী আত্মীয় এবং অনাত্মীয় সকলের সাথেই পর্দা করতে হবে। আপনারা কুরআন শরীফের তরজমা পড়ে নিলেই পেয়ে যাবেন।

চাচি, মামি, খালাতো বোন, মামাতো বোনদের সাথে পর্দা করতে হবে। এদের কথা ওই ১৪ প্রকারের মধ্যে নেই। এরা যদিও আপনজন কিন্তু আপনজনকে শরীয়ত দু'ভাগে ভাগ করেছে। কিছু আত্মীয়ের সাথে পর্দা করতে হবে। কিছু আত্মীয়ের সাথে পর্দা করতে হবে না। দেখেন না মীরাস? মুরুব্বী মারা গেলে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের মধ্যে কেউ সম্পদ পায়, কেউ পায় না। খুব নিকটেরা পায়, অন্যরা পায় না।

তো চাচি মামী ভাবী আরো এ জাতীয় যারা আছে তাদেরকে আমরা পাশের কামরা থেকে সালাম দেব। আসসালামুআলাইকুম চাচি কেমন আছেন? স্কুল থেকে গেলাম কলেজ থেকে গেলাম তো এভাবে বলব। মামার বাড়িতে গেলাম, তো মামিকে সালাম দেব। কুশল বিনিময় করব। কথাবার্তা জিজ্ঞেস করব। কিন্তু সামনাসামনি হব না। এরপরও ঘটে, যে ঘরে পর্দা নেই, তারা হয়ত সামনে চলে এসেছে– কিরে বাবা! তুই আমার কাছে আসছস না কেন? তোরে কোলে নিয়ে বড় করলাম। এখন দেখো! পোলায় দেখাই দেয় না? এ রকম হয় না? হয়। বহুত হয়। হলে তখন নিচের দিকে তাকিয়ে আসসালামুআলাইকুম ভালো আছেন? আধা শব্দে বলে চলে আসবে। দু'-এক মিনিট দাঁড়ানোর পর বলবে যে, আমি ঐ ঘরে বসি। পাশের

Scanned by CamScanner

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি । বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম ভর্তি বিজ্ঞপ্তি ।।

আল-জামিয়াতুল মাদানিয়া ঢাকা

৪২/২ সি, কুমিল্লা পট্টি, উত্তর মানিকনগর, মুগদা, ঢাকা-১২০৩

নিম্নোক্ত বিভাগ সমুহে ছাত্র ভর্তি করা হবে ঃ

*** কিতাব বিভাগ ঃ**

১। ইফতা ঃ মেয়াদ কাল ১ বছর, ৩ ফাতরায় বিভক্ত

বিষয় ভিত্তিক মুহাদারা পেশ করবেন ঃ

মাওঃ মুফতি শিব্বির আহমদ সাহেব

মুফতি ও মুহাদ্দিস ঢালকানগর মাদরাসা, ঢাকা।

২। হিদায়াতুন্নাহু।

৩। হুফ্ফাজ (হাফেজদের জন্য কিতাব বিভাগের বিশেষ জামাত)

এই জামাতে গাইরে হাফেজ মেধাবী ছাত্রদেরও ভর্তি করা হবে।

বিঃ দ্রঃ প্রত্যেক জামাতেই নিয়মিত হাদিস মুখস্ত করানোর ব্যবস্থা থাকবে এবং সাপ্তাহিক (প্রতি শুক্রবারে) খত্বেরুক'আ প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

*** হিফজ বিভাগ।**

দোয়া প্রার্থী ঃ (মাওঃ) মোঃ আব্দুল হান্নান

উস্তাজুল হাদিস জামিয়া দারুল আরকাম আল-ইসলামিয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

যোগাযোগ ঃ ০১৭৩১-৪৫৬৭৬০, ০১৭৮১-৯৯৭৭৭৬, ০১৭১১-০০৫৬১৭

যাতায়াতঃ কমলাপুর রেল স্টেশন হতে পূর্ব -দক্ষিণে এবং সায়দাবাদ বাস ষ্টেশন হতে উত্তরে মানিকনগর বিশ্বরোড নেমে পুকুরপাড় জামে মসজিদের উত্তর পার্শ্বে ৪২/২ সি, কুমিল্লা পট্টি।

জামিয়াতুল মাআরিফ আলইসলামিয়া

৮৮/৯ উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা ১২০৪।

নিয়মিত বিভাগসমূহ

- ইফতা বিভাগ : (১ বছর মেয়াদী)
- লুগাহ্ ও আদব বিভাগ : (১ বছর মেয়াদী)
  (ইলমী ও আধুনিক আরবী ভাষা প্রশিক্ষণ বিভাগ)
- কিতাব বিভাগ : ১ম বর্ষ-৫ম বর্ষ
  (মাদানী নেসাব ও বেফাকের সমন্বয়ে)
- মাসিক মুযাবারা : প্রতি ইংরেজি মাসের ২য় শুক্রবার।

সাময়িকী তাদরীবসমূহ

উসূলুল ফিকহের বিভিন্ন কিতাব ও আধুনিক মাসায়েলের সমন্বয়ে

- ইফতা ভর্তি তাদরীব (২৫ শাবান থেকে ২৩ রমযান)
  (হিদায়া আখেরাইন ও নূরুল আনওয়ার)
- নাহু-সরফ ও আরবী ভাষা তাদরীব : (২৫শা. থেকে ২৩ রমযান)
- উসূলুল ফিকহের তাদরীব :
  প্রথম ও দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষার বিরতিতে ৭ দিন ব্যাপি

তত্ত্বাবধানে : মুফতি ইয়াহইয়া সাহেব দা. বা.
মুহতামিম, খাসলা মাদরাসা, যশোর।

উপদেষ্টা : মাও. জিকরুল্লাহ খান সাহেব দা.বা.
সিনিয়র মুহাদ্দিস, ফরিদাবাদ মাদরাসা, ঢাকা।

ভর্তি : ৭ থেকে ৯ই শাওয়াল

বিনীত : সাঈদ আহমাদ
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক
০১৭২৭ ৬৭৩৭৬২, ০১৯১০ ৮১৩৭১৩

মা'হাদু উলূমিল কুরআন ঢাকা

দ্বীনী ইলম শিখতে আগ্রহী সাধারণ শিক্ষিত যুবকদের জন্য ও ১৭ উর্ধ্ব বয়সের হাফেজদের জন্য মা'হাদু উলূমিল কুরআন ঢাকা এর নতুন উদ্যোগ

বিশেষ কিতাব বিভাগ

ভর্তি শুরু ৬ শাওয়াল

দাওরায়ে হাদীস সমাপনকারী কুরআন বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহীদের জন্য

আত্‌তাখাসসুস ফী উলূমিল কুরআন বিভাগ

ভর্তি: ৬-৮ শাওয়াল, পরীক্ষা: লিখিত ও মৌখিক উভয়ভাবে হবে।

লিখিত পরীক্ষার বিষয়: তাফসীরে জালালাইন (সূরা বাকারা) ও আল-ফাউযুল কাবীর

গাইরে হাফেজ নবীন আলিম ও ১৭ উর্ধ্ব বয়সের যুবকদের কুরআন হিফজ করতে আগ্রহীদের জন্য

বড়দের তাহফীজুল কুরআন বিভাগ

১৫ শা'বান হতে নির্ধারিত কোটা পূরণ সাপেক্ষে ভর্তি চলবে।

কলেজ-ভার্সিটির ছাত্র, চাকরীজীবী, ব্যবসায়ী ও পেশাজীবীদের জন্য

তাহসীনুল কুরআন বিভাগ

(সহীহ কুরআন তিলাওয়াত ও জরুরী মাসায়িল শিক্ষা বিভাগ)

ভর্তি শুরু: ১০ শাওয়াল মুতাবেক ৫ জুলাই, কোর্সের মেয়াদ: ১২০ দিন

গাইরে হাফেজ তালিবে ইলমদের সহজে পবিত্র কুরআন হিফজ করার জন্য

রমজান ভিত্তিক তাহফীজুল কুরআন

ভর্তি: ১৫ শা'বান-১৯ শা'বান। দরস শুরু: ২০ শা'বান। পরীক্ষা: ২০ রমযান

যোগাযোগের ঠিকানা: ৯৪০/১৬, বাইতুল আমান হাউজিং সোসাইটি, রোড নং-১৪, আদাবর, ঢাকা।
০২-৮১৯০১০৪, ০১৯৫০৮৪৩৩৯৬, ০১৭৯৫৬৮-১১০৫

Scanned by CamScanner

আরো একটু উঁচু মনে করে। আমি শুধু খেলা দেখিয়ে টাকা কামিয়ে ফেললাম– ইসলাম এটাকে ভালোভাবে দেখে না। এজন্য খেলার মাধ্যমে আমরা টাকা কামানোর চিন্তা করব না। শরীরচর্চার জন্য যতটুকু খেলা দরকার অতটুকু খেলব।

প্রশ্ন : কোনো মুসলমান কি খ্রিস্টানদের দ্বারা পরিচালিত এনজিও অথবা তাদের অফিসে কাজ করতে পারবে?
উত্তর : এটা এক কথায় জবাব দেয়া মুশকিল। এনজিওগুলো বিভিন্ন রকমের কাজ করে। বহু ধরনের এনজিও আছে। অনেক এনজিও-এর ব্যাপারে বহু পেপার-পত্রিকায় বিভিন্ন সময় এসেছে যে, তারা ধর্মান্তরিত করার জন্যে কেউ সরাসরি কেউ কৌশলে চেষ্টা করে। ওই ধরনের জায়গায় কাজ করা যাবে না। তাহলে তো আমি ওই কাজের সহযোগিতা করলাম। আর যদি ওগুলো থেকে মুক্ত হয় তাহলে সেখানে ঠিক আছে। এ জন্য আগে যাচাই করতে হবে। খবর নিতে হবে।

প্রশ্ন : নামাযে অন্য মনস্ক হয়ে গেলে কী করণীয়?
উত্তর : মনটাকে আবার ঘুরিয়ে নিয়ে আসা। আল্লাহর কথা মনে করা। আমি আল্লাহর সামনে আছি। আল্লাহর সাথে কথা বলছি। হাদীসে আছে–

إنما يناجي ربه

যখন তোমাদের কেউ নামায পড়ে, তখন يناجي ربه সে আল্লাহর সাথে একান্তে কথা বলে। يناجي মানে কানের সাথে মুখ লাগিয়ে কথা বলা। তো যেহেতু আল্লাহর সাথে কথা বলছি, তাই যখনই মন ছুটে যাবে, তখন ওহ! আল্লাহর সাথে না কথা বলছি– বলে মন ঘুরিয়ে নিয়ে আসব। নামায ঠিক হয়ে যাবে।

প্রশ্ন : আমার আম্মু নামায পড়েন না। অনেক চেষ্টা করি, তারপরও পড়েন না। শুধু টিভিতে হিন্দি নাটক দেখে। এজন্য কী করা উচিত?
উত্তর : হাঁ, এ রকম দুঃখজনক পরিস্থিতি অনেকের ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে। এ সমস্ত ক্ষেত্রে দুআ করা। নিজেদের মা-বাবার জন্যে দুআ করা বা আপনজন কেউ এমন হলে দুআ করা এবং যদি বুঝতে চায় বুঝানো। যদি না বুঝতে চায়, তাহলে তুমি বলবে না যে, আপনি নামায পড়ুন। নামায কেন পড়েন না? এরকম বলবে না। তুমি যেটা করবে, সেটা হল, এমন মায়েরই খেদমত সেবা-যত্ন তুমি বেশি করে করবে। তুমি নিজে নামায পড়বে, মসজিদ থেকে এসে খেদমত শুরু করবে। মসজিদে যাওয়ার আগে বলবে মা একটু নামাযটা পড়ে আসি আবার মসজিদ থেকে এসে বলবে, মা তোমাকে একটু পানি দিচ্ছি। এ করছি, সে করছি।
মা দেখবেন যে, ওহ, ছেলেটা দেখি মসজিদে যাওয়ার কারণে আমার খেদমত বেশি করে। তখন দেখবে– মা উল্টো নামাযী হবেন। নিজের আচরণ দিয়ে মায়ের কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করা। ওই যে সূরা লোকমান পড়া হল যে, মাগরিবের পরে ওখানে এটা আছে।

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا.

যদি মা বাবা তোমাকে জোর-জবরদস্তিও করে যে, তুমি গুনাহের কাজ কর। فلا تطعهما তখন তুমি তাঁদের অনুসরণ করো না।
কিন্তু এ কারণে তাদের সাথে দূরাচরণ করো না। কারণ–

وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

দুনিয়াতে তাদের সাথে সদাচার করো।
এ যে লোকমান হেকিম বিদ্বান ব্যক্তি, কেন তাঁর ছেলেকে এ বিষয়টা শেখালেন? এজন্য শেখালেন যে, এর দ্বারা মা-বাবা ছেলের প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং ছেলের ভালো ভালো গুণগুলো মা বাবার দিকে যাবে।

প্রশ্ন : আমরা যখন নামায পড়তে যাই, তখন বন্ধুরা সাথে থাকে। তাদেরকে নামাযের কথা বললে তারা বলে আমার কাপড় ঠিক নাই। এ ব্যাপারে হুকুম কী?
উত্তর : হাঁ, এটা অনেকেই বলে যে, কাপড় খারাপ। এ ওজর দেয়। বলতে হবে যে, ভাই! এতটুকু কাপড় খারাপ থাকলে শুনেছি নামায হয়ে যায়। আসো। অনেকেই মনে করে কাপড় খারাপ, কাপড় খারাপ মানে কী?
বড় মানুষের কাপড় আর কতটুকুই খারাপ হয়? এখানের মানুষ অজু-এস্তেনযার পরে পানি ব্যবহার করে। তো পানি ব্যবহার করলে কি আর অত নষ্ট হয়? যতটুকু হয় সেটা হল অনেক সময় রাস্তা-ঘাটে এখানে সেখানে প্রস্রাব করতে হয়। তো দু'–এক ফোঁটা প্রস্রাব লেগে থাকে। সেক্ষেত্রে সম্ভব হলে কাপড় বদলে পড়বে। না হয় আপাতত ওটা দিয়েই এখন নামায পড়ে ফেলবে। নামায হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। পরবর্তীতে বাসায় আসলে বদলে নেবে। বলবে ভাই! নামায হয়ে যায়। হুজুররা বলেছেন নামায হয়ে যায়। এসো নামায পড়ি।
আল্লাহ তাআলা আমাদের পুরো মজলিসটাকে কবুল করুন। ভবিষ্যতের জন্য এটা যেন আলোকবর্তিকা হয়। যেন আমাদেরকে সঠিক পথে চলার আলো দেখায়। আল্লাহ তাআলা কবুল করুন।

[অনুলিখন : **মুহাম্মাদুল্লাহ মাসুম**]

আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া ইদারাতুল উলূম ঢাকা
আফতাবনগর মাদরাসা
প্লট-২২, রোড-৯, ব্লক- এম জহুরুল ইসলাম সিটি
আফতাবনগর, বাড্ডা, ঢাকা -১২১২।

ভর্তি শুরু — **ভর্তির এলান**
২৩ জুন ২০১৮ ইং মুতাবিক ৮ শাওয়াল ১৪৩৯ হি.

বিভাগ সমূহ
- কিতাব বিভাগ (ইবতেদায়ী-দাওরায়ে হাদীস)
- উলূমে হাদীস (মেয়াদ ২ বছর)
- ইফতা (মেয়াদ ১ বছর)
- দা'ওয়া (মেয়াদ ১ বছর)
- হিফজ বিভাগ
- নূরানী বিভাগ

বি. দ্র.ঃ তাখাসুসুস বিভাগসমূহে দাওরায়ে হাদীসে নূন্যতম প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সাপেক্ষে সীমিত কোটায় ভর্তি করা হবে।

রমযানের বিশেষ কোর্স ১লা রমযান থেকে ২০ রমযান

আরবী ভাষা শিক্ষা
কোর্স করাবেন-
মাওলানা আরীফ উদ্দীন মারুফ # মাওলানা আবু যর # মাওলানা মাহফুযুর রহমান

ইংরেজী ভাষা শিক্ষা
কোর্স করাবেন- মাওলনা হাবীবুর রহমান, বিশেষ তত্ত্বাবধানে- মাওলানা হাবীবুল্লাহ

কোর্সে ভর্তির নিয়মাবলী
ভর্তির সময়সীমা : ২৯ শাবান
ভর্তি ফি : ১০০০ টাকা। (থাকা-খাওয়া ফ্রি)
যোগাযোগ : ০১৮৩৩৪০৪৩৫৩,০১৬৭৫৭৫৭৮৭০

নিবেদক
মুফতি মোহাম্মদ আলী
মুহতামিম, আফতাবনগর মাদরাসা

যাতায়াত: রামপুরা ব্রিজের উত্তর পার্শে ইস্টওয়েস্ট ভার্সিটির সামনে থেকে বা মেরাদিয়া সাঁকো থেকে রিকসা যোগে আফতাবনগর এম ব্লক মাদরাসা

ঘরে বসি। বুদ্ধি করে চলতে হবে।

প্রশ্ন : আমরা জানি, নামায রোযা না করলে গুনাহ হয়। তারপরও আমরা করি না, কিন্তু কেন? আমাদের মাঝে কি ঈমানের কোনো অভাব রয়েছে?

উত্তর : হাঁ, ঈমানটা জাগ্রত হয়ে ওঠেনি। প্রশ্নকারী বলছে যে, ঈমানের কি অভাব আছে? কেন করি না? ঈমানটা চাপা পড়ে যায়। এই যে উপরে লাইটটা জ্বলছে। এ লাইটের উপরে যদি একটা কালো পর্দা দিয়ে দেওয়া হয়, বা কালো একটা কাগজ দিয়ে দেওয়া হয়, তো কী হবে? লাইটের আলোটা কী দেখা যাবে? খুব কম দেখা যাবে। আলো চলে যাবে না। মনে হবে, বাহির থেকে একজন দেখতে পাবে যে, এখানে একটা কিছু আছেরে!! কালো জিনিসটার ভেতরে একটু ফর্সা ফর্সা লাগছে!! কিন্তু আলোটা বাহিরে ছড়াবে না। হাদীসের ভাষাটা এ রকমই। হাদীসে বলা হয়েছে যে, মুমিন বান্দা যখন গুনাহ করে, অন্তরের মধ্যে কালো দাগ পড়ে। যখন সে তাওবা করে, তো কালো দাগ মুছে যায়। আর যদি তাওবা না করে, আল্লাহর দিকে ফিরে না আসে এ কালো দাগ বাড়তে থাকে। বাড়তে থাকে। বাড়তে থাকলে এ আবরণ তৈরি হয়। ঈমানটা হল এ রকম নূর। আলো। যখন গুনাহ হয়, তো সেই আলোর উপর আবরণ তৈরি হয়। আবরণ তৈরি হলে আমরা আমাদের করণীয় কাজ ভুলে যাই। কিন্তু যখনই আমার বুঝ এসে যাবে তখনই আমি ফিরে আসব। তো দেখা যাবে ওই কালো দাগগুলো আস্তে আস্তে দূর হয়ে যাবে। তখন আবার ঈমানের আলো ফুটে ওঠবে। ঈমান যায়নি। ঈমানের ওপর গুনাহের আবরণ পড়েছে। সে আবরণ দূর করলেই আবার ঈমান আলো দেওয়া শুরু করবে।

প্রশ্ন : শুনেছি মোবাইলে এমনি ছবি তুললে সমস্যা নেই, যে ছবিটা ফ্রেমে আবদ্ধ করে রাখা হয় সেটা নিষিদ্ধ।

উত্তর : বিনা কারণে ছবি তোলা ঠিক নয়। তবে আপনার যাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ জায়েয, মা, সন্তান এদের ছবি যদি ওঠানো হয় এবং ওয়াল পেপারে না রাখা হয় বরং ভেতরে রাখা হয় তো কেউ কেউ বলেছেন একটা সুযোগ আছে। যাদের সাথে পর্দা করতে হয় তাদের ছবি রাখা যাবে না। ওয়াল পেপারেও ছবি রাখা যাবে না।

প্রশ্ন : পোশাকের সুন্নাহসম্মত পদ্ধতি কী? অনেকে মাদানী কাটিং অর্থাৎ নিচের দিকে ছোট করে সেলাইবিহীনকে সুন্নাত মনে করে, এটা কি ঠিক?

উত্তর : সেটা পরতে পারেন, এটাতে দোষ নেই। ওটাও সুন্নত। এরা যে পড়েছে এটাও সুন্নাত। এখানে যেভাবে আপনারা পাঞ্জাবী পরেন, সেটাও সুন্নাত। কোনো অসুবিধা নেই। পোশাকের মূল বিষয়টা হল, পোশাক হবে ঢিলাঢালা। যেমন, একজন জিজ্ঞেস করল যে, এমন পোশাক পরলাম যে প্রস্রাবই দাঁড়িয়ে করতে হয়। কেন যে আমরা অন্যদের এটাও অনুসরণ শুরু করলাম। অনুসরণ করতে করতে এত নিচে নামলাম যে, প্রসাব দাঁড়িয়ে করতে হয়!! বিব্রতকর পরিস্থিতি। জানি না, কোন দিন ওটাও শুরু করে দয়। সেটা হল, উন্নত রাষ্ট্রগুলোর টয়লেটে পুশশাওয়ার থাকে না। ইস্তেঞ্জাখানাতে বড় ইস্তেঞ্জার পরে আমরা বদনা দিয়ে পানি ব্যবহার করি, সাবান ব্যবহার করি, পানি খরচ করে পরিচ্ছন্ন হই। ওসব দেশে সেটা থাকে না। আমাদের এখানে আমেরিকা প্রবাসী ছাত্র আছে, ওদেরকে জিজ্ঞেস করতে পারেন। ওইসব দেশে শুধু টিস্যু ব্যবহার করে। পানির ব্যবহার নেই। আপনাদের এ এলাকার অনেক ছেলে সিঙ্গাপুর থাকে ওদের জিজ্ঞেস করলেও জানবেন। এখন আমরা কি ওটা শুরু করব? আমাদের টয়লেটগুলোতে পুশশাওয়ার দেব না?! পানি খরচের ব্যবস্থা দেব না!! ওরা দাঁড়িয়ে প্রস্রাবের ব্যবস্থা চালু করেছে বিধায় আমরাও সে সিস্টেম চালু করে দিয়েছি।

অনুসরণ করব, আরেকজনেরটা নিব। বিদেশীদেরটা নেব, একটু বুঝে শুনে তো নিতে হবে। রুচিতে লাগারও তো একটা ব্যাপার-স্যাপার আছে। কিন্তু আমরা যখন নেওয়া শুরু করি তো রুচি-টুচি আর চিন্তা করি না। নির্বিচারে অন্যদেরটা গ্রহণ করা শুরু করি।

আমি এ ছেলেদেরকে, যারা ভবিষ্যতে শিক্ষিত হবে, বড় শিক্ষিত হবে ইনশাআল্লাহ, জাতি, সমাজ এবং রাষ্ট্রে কাজ করবে, তাদেরকে এটাই বলি, তোমরা বুঝে শুনে নেবে। পৃথিবীর যে কোনো জায়গার ভালো কিছু নিতে কোনো দোষ নেই। নেব আমরা, কিন্তু বুঝে শুনে নেব। ইসলাম ভালো কিছু নিতে কোনো বাধা দেয় না।

الحكمة ضالة المؤمن

এটা ইসলামের শিক্ষা। আল হিকমাহ মানে বিদ্যা, বুদ্ধি, আবিষ্কার এসব 'দল্লাতুল মুমিন'– মুমিনের হারানো সম্পদ। মুসলিম যেখানে যা ভালো পাবে নেবে। কিন্তু অবশ্যই তার ঈমানের আলো দিয়ে বাছাই করে নেবে। দেখে নেবে।

আমি আলোচনায় একটা কথা বলতে চেয়েছিলাম, ভুলে গেছি। এখন আকাশ সংস্কৃতি গ্রামে-গঞ্জেও এসে গেছে। আগে ছিল না। এখন গ্রামে-গঞ্জেও অনেকের ঘরেই থাকে। কেউ বাধ্য হয়ে রাখে। কেউ সংবাদ শোনার নামে রাখে। দেখার নামে রাখে। কেউ আরো বিভিন্ন কারণে রাখে। টেলিভিশন ঘরে ঘরে থাকে। রিমোটের মধ্যে একশ দু'শ চ্যানেলের পরেও শেষ হয় না। টিপছে আর আসছে। আমি বলি না যে আপনি প্রথম দিনেই ঘর থেকে ছুড়ে ফেলে দিন। কারণ, আপনি ঝামেলায় পড়ে যাবেন। আপনার মধ্যে যখন ঈমানের আলো জ্বলে উঠবে, আপনিই তখন সিদ্ধান্ত নিবেন। কিন্তু এখন যেটা করবেন তা হচ্ছে বাছাই করুন! চুজ করুন। আমি ভাবব যে, কোনটা আমি দেখব। কোনটা দেখব না। আমার রুচিকে জিজ্ঞেস করব। আমার সভ্যতা-সংস্কৃতিকে জিজ্ঞেস করব। আবহমান কাল থেকে এ দেশে আমার মা-বাবা, দাদারা-দাদিরা এগুলো দেখলে কী মনে করত? কী বলত? এগুলো আমরা চিন্তা করব। তারপরে ভাবব যে, এটা দেখা আমার জন্য উচিত কি উচিত না? ইন্টারনেটের কল্যাণে আমরা পুরো বিশ্ব এখন দেখছি। পেয়ে যাচ্ছি। কিন্তু এ দেখার আগে আমি নিজের সাথে ভেবে নেব। আমাকে ধ্বংস করার জন্য পুরো বিশ্ব থেকে বহু গোষ্ঠী, পুঁজিবাদী গোষ্ঠী বহু রকমের বহু কিছু আমার মোবাইলে দিবে। আমার কম্পিউটারের মধ্যে দিবে। কিন্তু আমাকে বাছাই করে নিতে হবে। আমি সব নেব না। যেটা যেটা মনে করব যে এটা আমার ক্ষতি করবে, আমার ক্যারিয়ারের ক্ষতি করবে, আমার মূল পরিচয়ের ক্ষতি করবে সেটা আমি নিব না। আমি নিব বাছাই করে করে। এটা অন্তত করতে হবে। এটা একদিকে যেমন ঈমানের দাবি, তেমনি আমাদের এ অঞ্চলের সভ্যতা-সংস্কৃতিরও দাবি।

প্রশ্ন : আমি যদি খেলার মাধ্যমে টাকা পাই এবং তা দান করে দেই তাহলে কি সওয়াব হবে? কবুল হবে?

উত্তর : খেলা আমাদের ছেলেরাও খেলে। খেলাটা হল শরীরচর্চার জন্য। হালকা মানসিক চর্চাও। খেলাকে প্রফেশন হিসেবে নেওয়া, খেলা দিয়ে টাকা কামানো; মানুষের জীবনটাকে ইসলাম

سَفْحِ هَذَا الْجَبَلِ، أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ؟

আমি যদি তোমাদের বলি যে, একটি শত্রুদল এই পাহাড়ের ওপার থেকে তোমাদের উপর আক্রমণ করবে তোমরা কি আমার কথা বিশ্বাস করবে?

সকলে বলল–

مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا.

আমরা আপনাকে কখনো মিথ্যা বলতে দেখিনি।

তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদের জন্য এক কঠিন আযাবের আগের সতর্ককারী। ...সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৯৭১

এই ঘটনায় অনেকগুলো বিষয় রয়েছে। তবে এখানে প্রাসঙ্গিক বিষয়টি হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে তার জাতির সাক্ষ্য–

مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا.

আমরা কখনো আপনাকে মিথ্যা বলতে দেখিনি।

আরেক দৃষ্টান্ত

ইমাম বুখারী রাহ. সহীহ বুখারীতে হিরাক্লিয়াসের সাথে আবু সুফিয়ানের সাক্ষাৎ ও কথোপকথনের বিখ্যাত ঘটনা বর্ণনা করেছেন, আবু সুফিয়ান তখনো ইসলাম কবুল করেননি। তিনি ব্যবসার উদ্দেশ্যে শামে গিয়েছিলেন। শাম ঐ সময় বাইজেন্টাইন সাম্রাজের অধীনে ছিল, সম্রাট কোনো কারণে শামে অবস্থান করছিলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের সংবাদ তার নিকট পৌঁছেছিল। তিনি বিষয়টি সম্পর্কে আরো জানতে চাচ্ছিলেন। তো আদেশ দিলেন, এখানে যদি আরবের কেউ থাকে তাকে আমার কাছে নিয়ে আস, আমি আরবের নবী সম্পর্কে কিছু জানতে চাই। আবু সুফিয়ান শামে ছিলেন, তাকে হিরাক্লিয়াসের সামনে হাজির করা হল। হিরাক্লিয়াস অনেকগুলো প্রশ্ন করলেন। এর মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল–

فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟

তিনি নবুওতের দাবি করার আগে তোমরা কি কখনো তাকে মিথ্যাকথনে অভিযুক্ত করেছ?

আবু সুফিয়ান বলেন, আমি উত্তরে বললাম, না, এমন অভিজ্ঞতা আমাদের কখনো হয়নি; আমরা তাকে মিথ্যাবাদিতার অভিযোগে অভিযুক্ত করতে পারিনি।

হিরাক্লিয়াস যে বিষয়গুলো জানতে চেয়েছিলেন সে সম্পর্কে আবু সুফিয়ানের উত্তর শোনার পর তিনি নিজেই একে একে সেই প্রশ্ন ও উত্তরগুলো বিশ্লেষণ করেছেন। সত্যবাদিতা সংক্রান্ত প্রশ্নের ব্যাপারে বললেন, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, তোমরা কি তাকে নবুওত দাবির আগে মিথ্যাবাদিতার অভিযোগে অভিযুক্ত করতে পেরেছ? তুমি বলেছ, অভিযুক্ত করতে পারোনি। এ থেকে আমি বুঝতে পেরেছি, তিনি সত্য নবী। কারণ যে ব্যক্তি মানুষের ব্যাপারে মিথ্যা বলেন না, তিনি আল্লাহ্‌র ব্যাপারেও মিথ্যা বলতে পারেন না।

পুরো কথোপকথনটি সহীহ বুখারীতে (হাদীস নং ৭) আছে। যে কেউ তা দেখে নিতে পারেন।

এটি হচ্ছে তাঁর সম্পর্কে এমন এক ব্যক্তির সাক্ষ্য, যিনি ঐ সময় পর্যন্ত তাঁর প্রাণের দুশমন ছিলেন এবং তার মর্যাদাহানীর সুযোগ খুঁজছিলেন।

আরেক আশ্চর্য ঘটনা সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাত্র মদীনায় হিজরত করে এসেছেন, বদরের যুদ্ধের আগের উত্তপ্ত পরিস্থিতি। মদীনার নেতৃস্থানীয় সাহাবী হযরত সা'দ ইবনে মুআয রা. উমরার উদ্দেশ্যে মক্কায় গেলেন। মক্কা-মদীনার মাঝে আগে থেকেই যোগাযোগ ছিল, আসা-যাওয়া ছিল, তাদের মাঝে পরিচয়ও ছিল। সা'দ ইবনে মুআয রা. যখন মক্কায় যেতেন তখন মক্কার সরদার উমাইয়া ইবনে খালাফের বাড়িতে মেহমান হতেন। উমাইয়া ইবনে খালাফ যখন ব্যবসার উদ্দেশ্যে শামের দিকে যেত, তখন মদীনায় এলে সা'দ ইবনে মুআয রা.-এর বাড়িতে মেহমান হত। জাহেলী যুগ থেকেই এটা ছিল। তো সা'দ ইবনে মুআয রা. উমরার উদ্দেশ্যে মক্কায় গিয়েছেন, কা'বা শরীফ তাওয়াফ করতে হবে। কিন্তু কা'বা চত্বরে গিয়ে তাওয়াফ করবেন কীভাবে? তাঁরা মদীনার মুসলিম। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুহাজির সাহাবায়ে কেরামকে আশ্রয় দিয়েছেন। মক্কার কাফির নেতাদের চোখে তো এরা বড় অপরাধী। উমাইয়া ইবনে খালাফ বলল, অপেক্ষা করুন, দুপুরবেলায় প্রখর রৌদ্রের কারণে লোকজন কা'বার চত্বরে থাকে না, নিজ নিজ ঘরে থাকে। ঐ সময় কা'বা চত্বর ফাঁকা থাকে, তখন আপনি গিয়ে তাওয়াফ করে আসবেন। সা'দ ইবনে মুআয রা. সেভাবেই দুপুরবেলা তাওয়াফ করতে বের হলেন। গিয়েছেন নিরিবিলি তাওয়াফ করবার জন্য, তাওয়াফ করছেন, এমতাবস্থায় দেখা হয়ে গেল একেবারে আবু জেহেলের সাথে।

আবু জেহেল সা'দ ইবনে মুআয রা.-কে দেখে বলে উঠল–

مَنْ هَذَا الَّذِي يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ؟

কে রে এখানে কা'বার তাওয়াফ করে?

সা'দ ইবনে মুআয রা. বললেন–

أَنَا سَعْدٌ

আমি সা'দ।

আবু জেহেল বলল, -উত্তেজিত হয়ে- বাহ! কী নিরাপদে কা'বা শরীফের তাওয়াফ করছ! অথচ তোমরা মদীনার লোকেরা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তার সঙ্গীদের আশ্রয় দিয়েছ!

এভাবে তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়ে গেল। উমাইয়া ইবনে খালাফ সা'দ ইবনে মু'আয রা.-কে থামাতে চেষ্টা করে আর বলে–

لَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ عَلَى أَبِي الْحَكَمِ، فَإِنَّهُ سَيِّدُ أَهْلِ الْوَادِي.

সা'দ! আবুল হাকামের আওয়াজের উপরে তোমার আওয়াজ উঁচু করো না। তিনি এই মক্কা উপত্যকার সরদার! একটু আস্তে কথা বল। আস্তে কথা বল।

কয়েকবার যখন উমাইয়া হযরত সা'দ রা.-কে থামাবার চেষ্টা করল, সা'দ রা. বিরক্ত হলেন। বিরক্ত হয়ে উমাইয়া ইবনে খালাফকে লক্ষ করে বললেন–

دَعْنَا عَنْكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزْعُمُ أَنَّهُ قَاتِلُكَ.

এখন আবুল হাকামের পক্ষ নিচ্ছ? কুফরের এই নেতার পক্ষে ওকালতি করছ? এই পথে তোমার পরিণাম কী হবে সেটা চিন্তা করেছ? আমি তো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শুনেছি যে, তিনি তোমাকে হত্যা করবেন।

এই কথা শুনে উমাইয়া ইবনে খালাফ আতঙ্কিত হয়ে বলে উঠল–

إِيَّايَ؟

আমাকে?

সা'দ ইবনে মুআয রা. বললেন, হাঁ। তখন উমাইয়া ইবনে খালাফের আতঙ্কিত বাক্য–

وَاللهِ مَا يَكْذِبُ مُحَمَّدٌ إِذَا حَدَّثَ!

ওয়াল্লাহ! মুহাম্মাদ যখন কিছু বলেন তা মিথ্যা হয় না।'

উমাইয়া অস্থির হয়ে বাড়ি ফিরল। বাড়ি এসে বউকে বলল, শুনেছ, আমার ইয়াসরিবী ভাই কী বলেছে? বউ বলল, কী বলেছে? উমাইয়া বলল, সে নাকি মুহাম্মাদকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলতে শুনেছে যে, তিনি আমাকে হত্যা করবেন। একথা শুনে স্ত্রীও বলে উঠল–

فَوَاللهِ مَا يَكْذِبُ مُحَمَّدٌ!

আল্লাহর কসম! মুহাম্মাদ কখনো মিথ্যা বলেন না। (দ্র. সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৬৩২)

Scanned by CamScanner

আপনারা যদি বদরের যুদ্ধের ঘটনা পড়ে থাকেন তাহলে লক্ষ করেছেন যে, বদরের যুদ্ধের সময় মক্কার সর্দারেরা যখন মুসলমানদের শেষ করার জন্য প্রচণ্ড দর্পের সাথে মক্কা থেকে বের হচ্ছিল তখন উমাইয়া ইবনে খালাফের স্ত্রী স্বামীকে বলল, তুমি কি ভুলে গেছ, তোমার ইয়াসরিবী ভাই কী বলেছিল? স্ত্রীর এই কথা উমাইয়ার মনে এতই প্রভাব বিস্তার করল যে, সে নানা ফন্দি-ফিকির করতে লাগল, কোনোভাবে যদি বদরের ময়দানে না যাওয়া যায়, কোনোভাবে যদি এড়িয়ে যাওয়া যায়। অন্যরা বের হয়েছে, সে এই আসছি, এই বের হচ্ছি ইত্যাদি বলে ঘরে বসে আছে, সবাই যখন বের হয়ে গিয়েছে তখন আবু জেহেল দেখে, উমাইয়া ঘরে বসে আছে। সে এসে তাকে লজ্জা দিল, উত্তেজিত করল। নানা কথা বলার পরে উমাইয়া উত্তেজিত হয়ে মক্কা থেকে বের হল। কিন্তু বের হলেও সঙ্গে দুইটা সওয়ারি– একটাতে সে সওয়ার, আরেকটা সঙ্গে খালি। যেখানেই কাফেলা যাত্রাবিরতি করে, উমাইয়া পেছনে পেছনে থাকে এবং দ্বিতীয় সওয়ারিটা প্রস্তুত রাখে। কোনো বিপদ হলেই, যেন তাজাদম সওয়ারিতে লাফিয়ে চড়ে সোজা মক্কায় ফিরতে পারে।

কিন্তু মানুষ যতই ব্যবস্থা নিক, আল্লাহ্‌র ফয়সালা রদ করতে পারে না। দেখুন উমাইয়াও ঘরে বসে থাকতে পারেনি। সে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়েছে, মৃত্যুর আশঙ্কা করেছে, মৃত্যু থেকে পলায়নের ব্যবস্থাও নিয়েছে, কিন্তু এরপরও পায়ে পায়ে মৃত্যুর দিকেই এগিয়ে গেছে।

বদরের ময়দানে অধিকাংশ কাফির নেতার ধ্বংস হওয়াই ছিল আল্লাহ্‌র ফয়সালা। কাজেই ধ্বংসের জন্য তাদের এখানে আসতেই হবে। আল্লাহ পরিস্থিতি তৈরি করে দিয়েছেন, ওরাও প্ররোচিত হয়ে দর্পভরে নিজেদের ধ্বংসের দিকেই ছুটে গিয়েছে। চিন্তা করলে আল্লাহ্‌র নাফরমানদের জন্য কত বড় শিক্ষা আছে এখানে!

তো যে কথাটা বলতে চাচ্ছি তা হল, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যবাদিতার ব্যাপারে, তাঁর যবানে মোবারক থেকে বের হওয়া প্রতিটি বাক্যের ব্যাপারে তাঁর দুশমনেরও বিশ্বাস কীরূপ ছিল! এই তাঁর সীরাত; তাঁর জীবনটি এভাবেই কেটেছে; তাঁর কথা ও কাজ এমন ছিল যে, তাঁর জাতি তাঁর সত্যবাদিতার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিঃসংশয় ছিল। মুসলিম উম্মাহ্‌র কর্তব্য, প্রিয়নবীর এই বৈশিষ্ট্য অর্জনের চেষ্টা করা।

তো সত্যবাদিতা যাঁর জীবনে এই রকম প্রোজ্জ্বল ছিল তিনি সত্যবাদিতার ফযীলত বয়ান করেছেন এভাবে–

إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ،

সত্যবাদিতা পরিচালিত করে ভালো কর্মের দিকে। আর ভালো কর্ম জান্নাতের দিকে। পক্ষান্তরে মিথ্যাবাদিতা পরিচালিত করে মন্দ কর্মের দিকে আর মন্দ কর্ম জাহান্নামের দিকে। –সহীহ বুখারী, হাদীস ৬০৯৪

তাহলে পথ দুইটি : জান্নাতের পথ আর জাহান্নামের পথ। জান্নাতের পথের সূচনা হচ্ছে সত্যবাদিতা। আর জাহান্নামের পথের সূচনা মিথ্যাবাদিতা। এখন পথিকের ইচ্ছা সে কোন্ গন্তব্য অবলম্বন করবে এবং কোন্ পথে চলবে।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত ও অনুসারী হিসেবে আমাদের কর্তব্য, জীবনের সকল ক্ষেত্রে সত্যবাদিতাকে অবলম্বন করা। তিনি নিজেও ছিলেন শ্রেষ্ঠ সত্যবাদী আর তাঁর শিক্ষা ও সাহচর্যে গড়ে উঠেছিল সত্যবাদী ও সত্যনিষ্ঠদের এক মহান জামাত–সাহাবায়ে কেরাম।

কীভাবে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে সত্যবাদিতার শিক্ষা দান করেছেন। কীভাবে তাদের তরবিয়াত করেছেন সেটাও নবী-জীবনের আরেক উজ্জ্বল অধ্যায়। আল্লাহ পাক যদি তাওফীক দান করেন তাহলে ইনশাআল্লাহ অন্য অবসরে এই বিষয়ে কিছু বলার চেষ্টা করব।

আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে এই মহান গুণ অর্জন করার তাওফীক দান করুন– আমীন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

[ধারণ ও অনুলিখন : **আনাস বিন সা'দ**]

আলকাউসার ভলিউম

আলহামদু লিল্লাহ, মাসিক আলকাউসার ২০০৫ থেকে ২০১৭ মোট ১৩ সালের ভলিউম পাওয়া যাচ্ছে।

বোর্ড বাঁধাই ভালিউম-এর মূল্য

২০০৫ = ২৪০/-
২০০৬ = ২৪০/-
২০০৭ = ২৪০/-
২০০৮ = ২৪০/-
২০০৯ = ২৪০/-
২০১০ = ২৪০/-
২০১১ = ২৪০/-
২০১২ = ২৪০/-
২০১৩ = ২৪০/-
২০১৪ = ২৪০/-
২০১৫ = ২৪০/-
২০১৬ = ২৪০/-
২০১৭ = ২৪০/-

ডাকে নিতে চাইলে প্রতিটির ডাক খরচ ১৫/- (পনের টাকা) যোগ হবে।

অতিসত্ত্বর যোগাযোগ করুন
০১৯৮৪-৯৯ ৮৮ ৪৪
০১৯৮৪-৯৯ ৮৮ ৩৩

দারুল হুদা পুরুষ/মহিলা মাদরাসা

জরুরাতুত তাদরীব বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে

নাহু-ছরফ ও আরবী ভাষার

মুআল্লিম ও মুআল্লিমা প্রশিক্ষণ কোর্স

মু'আল্লিম কোর্সের তথ্যাবলী

১ম ধাপ :
১৫ শাবান থেকে ২৭ শাবান পর্যন্ত
ভর্তি ফি : ১৫০০/- থাকা খাওয়া ফ্রি
স্থান : দারুল হুদা আল-ইসলামিয়া মাদরাসা ভূইপড়, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ।

২য় ধাপ
১ম রমজান থেকে ২০ রমজান পর্যন্ত
ভর্তি ফি : ২০০০/- থাকা খাওয়া ফ্রি
স্থান : মূলকেন্দ্র সহ দেশের বিভিন্ন মাদরাসা ও জামিয়া।

মু'আল্লিমা কোর্সের তথ্যাবলী

১ম ধাপ :
১৫ শাবান থেকে ২৭ শাবান পর্যন্ত
ভর্তি ফি : ১৫০০/- থাকা খাওয়া ফ্রি
স্থান : দারুল হুদা মহিলা মাদরাসা ভূইপড়, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ।

২য় ধাপ :
১ম রমজান থেকে ২৫ রমজান পর্যন্ত
ভর্তি ফি : ২৫০০/- থাকা খাওয়া ফ্রি
স্থান : মূলকেন্দ্র সহ দেশের বিভিন্ন মহিলা মাদরাসা ও জামিয়া।

রমজানে কোর্স পরিচালনার জন্য মুআল্লিম/মুআল্লিমা নেওয়ার আগ্রহীদেরকে ১ শাবানের পূর্বে যোগাযোগ ও নিবন্ধন ফরম পূরণ করার অনুরোধ রইল।

১। কোর্স শেষে সনদ প্রদান করা হবে।
২। রমযান মাসে বিভিন্ন মাদরাসার/জামিয়াহ নাহু-ছরফ ও আরবী ভাষার কোর্সে মুআল্লিম/ মুআল্লিমা হিসেবে পাঠানো হবে।
৩। খেদমতে আগ্রহীদের খেদমতের ব্যবস্থা করারচেষ্টা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

সার্বিক পরিচালনায়
মুফতী মুস্তাফিজুর রহমান বিন ওয়াজেদ আলী
পরিচালক, জরুরাতুত তাদরীব বাংলাদেশ।

যাতায়াত
যাত্রাবাড়ী অথবা টিটাগাংরোড থেকে যেকোন বাসে সাইনবোর্ড নেমে অটোযোগে ভূইপড় বাসস্ট্যান্ড। অতঃপর রিক্সাযোগে রাইস মিল, আল আরাফা মসজিদ সংলগ্ন।

মোবাইল : ০১৬১৩-২০০০৭৬, ০১৯১৭-৬৩৬৩০৬, ০১৭৪৫-৪৭২১৫৮, ০১৮৬৮-৮৯২১৯৯

Scanned by CamScanner

নবী-জীবনে সত্যবাদিতা

মুহাম্মাদ যাকারিয়া আবদুল্লাহ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا.

সূরাতুল আহযাবের যে আয়াতটি তিলাওয়াত করেছি তা আমরা বারবার শুনেছি এবং তিলাওয়াত করেছি। এই আয়াতে আল্লাহ পাক মুমিনদের সম্বোধন করে বলেছেন, (তরজমা) 'তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) মাঝে রয়েছে উত্তম অনুসরণ'। অর্থাৎ তিনিই উম্মাহর আদর্শ, তাঁর অনুসরণই কাম্য। 'তোমাদের জন্য' মানে তোমরা যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি প্রত্যাশা কর, আখেরাতের নাজাত প্রত্যাশা কর, যারা আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ কর তাদের জন্য।

এই আয়াত থেকে জানা যাচ্ছে যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ, তাঁকে উসওয়া হিসেবে গ্রহণ করা ঈমানের প্রধান দাবি। এই দাবি পূরণের জন্য আমাদের নবী-আদর্শ সঠিকভাবে জানতে হবে এবং উপলব্ধি করতে হবে। যেন আমরা হতে পারি তাঁর প্রকৃত অনুসারী এবং আদায় করতে পারি তাঁর উম্মত হওয়ার হক।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনের সকল ক্ষেত্রে আমাদের আদর্শ। ইবাদত-বন্দেগী, আকীদা-বিশ্বাস, আচার-ব্যবহার, আদব-আখলাক, স্বভাব-চরিত্র– সকল বিষয়ে আদর্শ। আর তা ঘোষণা করেছেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা। কাজেই তাঁর আদর্শের অনুসরণে নিজের কর্ম ও জীবনকে গড়ে তোলা আল্লাহ্‌র আদেশ, এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জন সম্ভব হবে।

আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন পবিত্র ও নির্মল জীবনের নমুনা, কাজেই জীবনের যে ক্ষেত্রেই তাঁকে অনুসরণ করা হবে, জীবনের ঐ ক্ষেত্রটি পবিত্র ও নির্মল হয়ে উঠবে।

জীবনের অনেক অধ্যায়, অনেক অঙ্গন। এক বড় অধ্যায় স্বভাব-চরিত্র। কেউ যদি জীবনের এই অধ্যায়টিকে জ্যোতির্ময় করতে চায় তার কর্তব্য আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করা।

আল্লাহ পাক তাঁর সম্পর্কে এই সনদ দিয়েছেন–

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ

'নিঃসন্দেহে আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী, মহান আখলাকের অধিকারী।'

সুতরাং স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার উসওয়ায়ে রাসূলের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

আজকের মজলিসে আমরা শুধু একটি বিষয় নিয়ে একটুখানি আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। আর তা হচ্ছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যবাদিতা। তিনি কেমন সত্যবাদী ছিলেন, সত্যবাদিতার শিক্ষা কত তাকিদের সাথে দিয়েছেন, শুধু শিক্ষাই নয়, সত্যবাদিতার গুণে গুণান্বিত করবার জন্য তাঁর সাহাবীগণকে কীভাবে তারবিয়াত করেছেন, সুন্নাহ ও সীরাতের কিতাবে তা বিস্তারিতভাবে আছে।

তাঁর জীবনের, স্বভাবের এক উল্লেখযোগ্য দিক ছিল সত্যবাদিতা। নবুওতের আগ থেকেই তিনি তাঁর সমাজে প্রসিদ্ধ ছিলেন সত্যবাদী ও আমানতদার হিসেবে। আমরা সবাই এই বিষয়টি জানি। এই প্রসিদ্ধি কি একদিনে হয়েছিল? না, একদিনে হয়নি। ভাবমর্যাদা একদিনে গড়ে ওঠে না। তা গড়ে ওঠে ধীরে ধীরে, নানা ঘটনায়, নানা পরিস্থিতিতে। আরবের কুরাইশের মাঝে তাঁর জীবনের দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে। তাঁর কথা-কাজ, তাঁর আচার-আচরণ সব তাদের সামনে ছিল। তাঁর শৈশব, কৈশোর, যৌবন তাদের সামনে ছিল। এই দীর্ঘ জীবনে তাঁর কর্ম ও আচরণ থেকে তাঁর সমাজ এই বিশ্বাস গ্রহণ করেছে যে, এই মানুষটি একজন সত্যবাদী, আমানতদার মানুষ।

নবুওতের পূর্বের ঘটনাবলীও আলোচনা করা যেতে পারে। বিভিন্ন ঘটনা আপনাদেরও অনেকের জানা আছে। লম্বা আলোচনার সুযোগ নেই। তবে এক দুইটি দৃষ্টান্ত আমরা স্মরণ করতে পারি। সহীহ বুখারীতে এক অসাধারণ ঘটনা আছে।

আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যখন প্রথম ওহী নাযিল হল এবং তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বাড়ি ফিরলেন ঐ সময় উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজা রা. যে কথাগুলো বলে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছেন, তা তাঁর উন্নত কর্ম ও চরিত্রের এক অসাধারণ সনদ। আম্মাজানের কথাগুলো সহীহ সনদে, সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মুল মুমিনীন খাদীজা রা.-এর কাছে আশঙ্কা ব্যক্ত করে বলেছিলেন–

لقد خشيت على نفسي

আমি আজ যে অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছি, এতে আমার প্রাণের আশংকা হচ্ছে। উম্মুল মুমিনীন তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন–

كَلَّا، أَبْشِرْ، فَوَاللهِ لَا يُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَصْدُقُ الحَدِيثَ، وَتَحْمِلُ الكَلَّ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الحَقِّ.

না, এ হতেই পারে না। আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন! আল্লাহ পাক কখনো আপনাকে অপদস্থ করবেন না, (আল্লাহ পাক তো আপনাকে সম্মানিত করবেন,) কারণ আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন, সত্য কথা বলেন, অন্যের ভার বহন করেন, মেহমানদারী করেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষের পাশে দাঁড়ান– (এইসকল গুণের অধিকারী যিনি, তাকে আল্লাহ পাক সম্মানিত করবেন, তাকে তিনি কখনো অপদস্থ করবেন না।) –সহীহ বুখারী, হাদীস ৬৯৮২

এখানে হযরত খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা, যিনি এই মানুষটির সাথে ইতিমধ্যে পনের বছরের দাম্পত্য জীবন কাটিয়েছেন, তাঁর সনদ–

وَتَصْدُقُ الحَدِيثَ

'আপনি সত্য কথা বলেন।'

আরেকটি দৃষ্টান্ত : দাওয়াতের প্রথম দিকের ঐ ঘটনা তো আমাদের সবারই জানা আছে। সাফা পাহাড়ের ঘটনা। সহীহ বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, (কুরআন মাজীদে নিকটাত্মীয়দের দাওয়াতের আদেশ নাযিল হওয়ার পর) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফা পাহাড়ে উঠলেন এবং উচ্চস্বরে বললেন, 'ইয়া সাবাহাহ্!' অর্থাৎ বিপদ! বিপদ! কুরাইশের লোকেরা পাহাড়ের সামনে উপস্থিত হল। তিনি তাদের লক্ষ্য করে বললেন–

أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا تَخْرُجُ مِنْ

Scanned by CamScanner

মারকাযুল উলূম আল ইসলামিয়া বনশ্রী

বাড়ী#৫৬-৫৮, রোড#০৭, ব্লক#জি, বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা-১২১৯

মাদানী নেসাবের ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম বর্ষে

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

উপযুক্ত ছাত্রদের ১লা রমযান থেকে ভর্তি করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আরো রয়েছে

- মানসম্মত হিফজুল কুরআন বিভাগ।
- আদর্শ নূরানী বিভাগ।

বি:দ্র:

- ভর্তির সময় অভিভাবকের উপস্থিতি আবশ্যক।
- অসচ্ছলতা ও অপারগতার ক্ষেত্রে মেধাবী ও মেহনতী ছাত্রদের জন্য বিশেষ ছাড় রয়েছে।

সার্বিক যোগাযোগ :
০১৭১৪৬১৯১৬০
০১৭৩৬৮৩৬৩১৩

নিবেদক
মুফতী ইহতিশামুল হক নোমান
প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম
মারকাযুল উলূম আল ইসলামিয়া, বনশ্রী

যাতায়াত

ঢাকার যে কোন স্থান থেকে রামপুরা ব্রিজে নেমে বনশ্রী ১০ তলা মার্কেট সংলগ্ন।

الجامعة الاسلامية دارالعلوم ركابى بازار، منشى غنج
জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম রিকাবী বাজার

(রিকাবী বাজার মাদরাসা), মিরকাদিম পৌরসভা, মুন্সীগঞ্জ সদর। স্থাপিত : ১৯৭৬ ঈ.। ফোন : ০২-৭৬১০০২২

বিভাগসমূহ

- ফাতওয়া বিভাগ (এক বছর মেয়াদী। তবে দ্বিতীয় বছরও তামরীন ও মুতালায়ার সুযোগ রয়েছে)
- কিতাব বিভাগ
- হিফয বিভাগ ও
- নূরানী মক্তব বিভাগ

সকল বিভাগে ভর্তি চলছে

খোলার তারিখ ও ভর্তি শুরু
৮ শাওয়াল ১৪৩৯ হিজরী,
২৩ জুন ২০১৮ ঈ., শনিবার।
(ইফতা ব্যতীত অন্যান্য বিভাগে বার্ষিক পরীক্ষার পর থেকেই ভর্তির সুযোগ রয়েছে)

ইফতা বিভাগের ভর্তি পরীক্ষা

লিখিত : ১০ শাওয়াল, ২৫ জুন, সোমবার, সকাল ০৯ : ০০।
মৌখিক : ১১ শাওয়াল, ২৬ জুন, মঙ্গলবার, সকাল ০৯ : ০০।
বিষয় : হেদায়া (কিতাবুল বুয়ূ) ও নূরুল আনওয়ার (কিতাবুল্লাহ) এবং অন্যান্য বিষয়।
ফলাফল ও ভর্তি : ১১ শাওয়াল, ২৬ জুন, মঙ্গলবার, বাদ যোহর।

ইফতা, দাওরা ও মেশকাত জামাতের ছাত্রদের 'নফকা' জামিয়ার পক্ষ থেকে বহন করা হয়।

যোগাযোগ

মাওলানা আজহার উদ্দিন
(মুহতামিম)
০১৭৩১-১৫৭৯৩০, ০১৬২৬-৯৩৬০০৬

মাওলানা মিজানুর রহমান
(আমিনুত তা'লীম)
০১৬৮১-৬৩৬৭২৯, ০১৯১৯-৮০৭৯২১

মুফতী রুহুল্লাহ নোমানী
(প্রধান মুফতী)
০১৮১৭-৬২৪৩৮৬, ০১৯১৯-১৬৫৭৫৬

যাতায়াত

১. সদরঘাট ও দক্ষিণাঞ্চল থেকে কাঠপট্টি লঞ্চঘাট। পাশেই মাদরাসা।
২. গুলিস্তান, পোস্তগোলা ও নারায়ণগঞ্জ থেকে মোক্তারপুর হয়ে মাদরাসা।
৩. মাওয়া ও নিমতলা থেকে সিপাহীপাড়া হয়ে মাদরাসা।

Scanned by CamScanner

সিরিয়া : বিধ্বস্ত মানবতার বীভৎস রূপ

মুহাম্মাদ খালিদ

মুহাম্মাদ বূআযীযী যখন গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছিলেন তখন কি তিনি জানতেন তার এই আত্মাহুতি বিশ্ব রাজনীতিতে কতটা প্রভাব বিস্তার করবে? বূআযীযী ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক পাশ করা বেকার, যিনি চাকুরি না পেয়ে ফুটপাতে সবজি বিক্রি শুরু করেছিলেন। পুলিশ তার গাড়ি এবং ওজন মাপার ইলেকট্রিক যন্ত্র কেড়ে নিয়েছিল, দুর্ব্যবহারও করেছিল। ক্ষোভে-দুঃখে তিনি কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন এবং জনসমক্ষে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে আত্মহত্যা করেন। তার শরীরের এই আগুন যে পুরো মধ্যপ্রাচ্যে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল তা বূআযীযী দেখে যেতে পারেননি। সেই আগুনে মিশর পুড়েছে, পুড়েছে লিবিয়া, পুড়ছে ইয়েমেন আর এখনো জ্বলছে নবীদের পুণ্যভূমি সিরিয়া।

যেখান থেকে যুদ্ধ

সিরিয়া প্রসঙ্গ অবতারণার আগে আরব বসন্তের প্রেক্ষাপটে একবার চোখ বুলিয়ে নেয়া দরকার। বর্তমান উত্তর আফ্রিকার মিশর, লিবিয়া, তিউনিসিয়াসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে উসমানী খেলাফতের অধীনে ছিল। পাশ্চাত্য ষড়যন্ত্রে ১৯২৪ সালে উসমানী খেলাফতের পতনের আগ-পরে এই অঞ্চলগুলো নিজেদের মত করে আলাদা হয়ে যায় এবং স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের আকৃতি লাভ করে। এই আরব দেশগুলোর অবস্থা তখন স্থিতিশীল ছিল না। অভ্যুত্থান-পাল্টা অভ্যুত্থানে তারা ছিল জর্জরিত। এরপর ধীরে ধীরে দেশগুলোতে একনায়কেরা বসে যান। কেউ বাদশাহ, কেউ প্রেসিডেন্ট, কেউ একদলীয় শাসনতন্ত্রের প্রধান, কেউ সামরিক শাসক হিসেবে ক্ষমতায় বসলেও সবার শাসনপদ্ধতি ছিল একই। একনায়কতন্ত্রের ভিত্তিতে এক ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছায় পরিচালিত হত পুরো রাষ্ট্র।

বিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষ দিকে নজর বুলালে দেখা যায়, মিশরে হোসনি মোবারক, তিউনিসিয়ায় বেন আলি, ইরাকে সাদ্দাম হোসাইন, লিবিয়ায় মোয়াম্মার গাদ্দাফি, ইয়েমেনে আলি আব্দুল্লাহ সালেহ এবং সিরিয়ায় হাফিজ আলআসাদের মত ব্যক্তিরা অনেকটা একনায়কের মত যুগ যুগ ধরে দেশগুলো শাসন করেছে।

উল্লেখিত দেশগুলোর পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য আরব দেশেও সেসময় ইসলামী খেলাফত যেমন ছিল না, তেমনি প্রচলিত ধারার গণতন্ত্রও সেখানে ছিল অনুপস্থিত। ফলে জনগণের মতপ্রকাশের কোনো সুযোগ ছিল না। তেল-বিপ্লবের পর লিবিয়া, কাতার, বাহরাইন, আরব আমিরাত, কুয়েত, ওমান, সৌদির মত কয়েকটি দেশে সরকারি উদ্যোগে রাষ্ট্রীয় সুযোগসুবিধার উন্নয়ন ও জনগণের আর্থিক সমৃদ্ধি হলেও অন্যান্য দেশ আগের অবস্থাতেই পড়ে ছিল। ভুল রাষ্ট্রনীতি, বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলিম স্বার্থবিরোধী কাজকর্ম, বিশেষত ফিলিস্তিন ইস্যুতে শাসকদের ব্যর্থতায় জনগণ মনক্ষুণ্ন ছিল। পাশাপাশি প্রত্যেক দেশেই শাসক পরিবারের সীমাহীন সম্পদ-ভোগবিলাস-দুর্নীতি এবং কঠোর হস্তে বিরোধী মতকে দমন করার মত বিষয়গুলো বৃহৎ জনসাধারণকে বিষিয়ে তুলেছিল। অধিকাংশ দেশেই রাজনৈতিক দল বা সংগঠন করার সুযোগ নেই। ফলে সরকার যত বড় ও বিতর্কিত কাজই করুক না কেন জনগণের কিছুই বলার সুযোগ ছিল না। বিরোধী মতের লোকদের প্রকাশ্যে গ্রেফতার বা গোপনে গুম করে ফেলা হত। সব মিলিয়ে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ দানা বেঁধে উঠলেও সেই ক্ষোভ প্রকাশের মত দল বা সংগঠন তাদের ছিল না। একাকী মানুষের পক্ষে তো কিছু করা সম্ভব না।

দীর্ঘদিন ধরে সরকারি নিপীড়ন আর অচল জীবনব্যবস্থায় ত্যক্ত বিরক্ত বূআযীযী যখন পুলিশের হাতে নিজের জীবিকার শেষ অবলম্বনটুকু হারিয়ে আত্মাহুতি দিলেন তখন টনক নড়ল জনগণের। নিরীহ যুবকের নির্মম মৃত্যু নাড়া দিল তিউনিসিয়ার অসংখ্য মানুষকে। ভাগ্য বিড়ম্বনার শিকার মানুষগুলো ১৭ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে ঘটে যাওয়া এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজপথে নেমে এল। বহুদিন তারা সহ্য করেছে। এই একটা উপলক্ষকে কেন্দ্র করে তারা নিজেদের ভেতরে দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত ক্ষোভকে রাজপথে এসে উগরে দিল। শেষমেশ তারা বেন আলীর সরকার পতনের ডাক দিয়ে বসল। এই ধরনের অপরিকল্পিত আন্দোলনের জন্য তিউনিসিয়া সরকার প্রস্তুত ছিল না। সচরাচর এমন আন্দোলন হয় না বিধায় এগুলো দমন করতেও তারা অভ্যস্ত ছিল না। সবমিলিয়ে প্রবল জনবিক্ষোভের মুখে জানুয়ারির ৪ তারিখে শাসক পরিবার তল্পিতল্পা গুটিয়ে এবং বিপুল পরিমাণ ধনসম্পদ হাতিয়ে সৌদি পালিয়ে গেল।

তিউনিসীয় জনগণের এ অভূতপূর্ব সফলতা প্রবলভাবে উৎসাহিত করল অন্যান্য আরবদেশের জনগণকে। বূআযীযীর মত অন্যান্য রাষ্ট্রের আরো কিছু মানুষ আগুনে আত্মাহুতি দিল। এদের মধ্যে মিশরের দু'জন সাংবাদিকও আছেন। এই ঘটনাগুলো আগুনে ঘি ঢালার কাজ করল। প্রথমে মিশর এরপর একে একে বাহরাইন, ইয়েমেন, লিবিয়া, আলজেরিয়া ও সিরিয়ায় ব্যাপক গণআন্দোলন শুরু হল। মানুষের ক্ষোভ প্রশমিত করার জন্য সৌদি সরকার বেতন দুই থেকে তিন গুণ বাড়িয়ে দিল।

২০১১ সালের মাঝামাঝি থেকে শেষ দিকে উত্তর আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে ছড়িয়ে পড়া এই মারমুখী বিক্ষোভে স্বৈরশাসকেরা অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। কারণ বিগত বিশ-পঁচিশ বছরের ইতিহাসে মানুষ এভাবে কখনো রাস্তায় নেমে আসে নি। প্রবল বিক্ষোভে মিশরের হোসনি মোবারক এবং ইয়েমেনের আলী আব্দুল্লাহ সালেহ পদত্যাগ করলেন। লিবিয়ায় গাদ্দাফির পতন ঘটল আট মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর। কিন্তু সিরিয়া পড়ে গেল মহাসংকটে।

গৃহযুদ্ধের সূচনা

২০১১ সালের ২৬ শে জানুয়ারিকে সিরিয়ার মানুষ আজীবন মনে রাখবে। এই সময়েই যে তাদের বিপ্লবের সূচনা! বাথ পার্টির করাল গ্রাস থেকে মুক্তি পেতে এ সময়েই শুরু হয়েছিল তাদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলন। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা ভালো, উসমানী সালতানাত থেকে আলাদা হওয়ার অল্পকিছু দিন পরেই ফ্রান্স সিরিয়া দখল করে নিয়েছিল। সেখানে সুন্নী হচ্ছে মোট জনসংখ্যার ৭৪ ভাগ, আলাবী ১২ ভাগ এবং খ্রিস্টান ১০ ভাগ। বিস্ময়করভাবে দেশের প্রধান সুন্নী জনগোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে একেবারে সংখ্যালঘু শিয়া আলাবী সম্প্রদায়ের সাথে ফরাসীদের খাতির গড়ে উঠে এবং তাদের দিয়েই ফরাসিরা সিরিয়ার জাতীয় সেনাবাহিনী গঠন করে। পাশাপাশি এই শিয়াদেরকে তারা জাতীয় নেতৃত্বে নিয়ে আসে। শেষতক এদের হাতেই দেশের ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে ফরাসিরা চলে যায়। এরপর আলাবী সম্প্রদায় বাথ পার্টির নাম নিয়ে ক্ষমতায় চেপে বসে। হাফিজ আলআসাদ ১৯৭১ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত শাসন করে মৃত্যুবরণ করার পর তার

Scanned by CamScanner

ছেলে বাশার আলআসাদ ক্ষমতায় আরোহণ করে। চলতি বছর তার ক্ষমতারোহণের দেড় যুগ পূর্ণ হতে যাচ্ছে।

কথিত আরব বসন্তের প্রেক্ষাপটে অন্যান্য আরবদেশে যে সমস্যাবলী ছিল তা সিরিয়াতেও বিদ্যমান। পাশাপাশি মাত্র ১০ ভাগ মানুষ পুরো দেশের ৯০ ভাগ মানুষকে জিম্মি করে অর্ধশতাব্দী ধরে শাসন ও দমন-নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে– এটা সিরীয় আপামর জনসাধারণ কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছিল না। যুগের পর যুগ ধরে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ মনের মধ্যে পুষে রেখে তারা একটা সুযোগের অপেক্ষা করছিল। আরব বসন্ত তাদের সেই সুযোগ এনে দেয়।

আরব বসন্তে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রথমে রাজধানী দামেস্ক এরপর গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ দারার জনগণ রাস্তায় নেমে আসাদ ও বাথ পার্টির ক্ষমতা ত্যাগের দাবি তোলে। ক্রমেই আন্দোলন জোরদার হতে থাকে। একপর্যায়ে আসাদ সরকার বিক্ষোভকারীদের ঠেকাতে রাস্তায় ট্যাংক বহরসহ আর্মি নামিয়ে দেয়। এতে জনতা আরো বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং সরকারি বাহিনীর সাথে তাদের সংঘর্ষ তীব্র আকার ধারণ করে। ইতিমধ্যে সিরিয়ার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশে আন্দোলনের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে। সেনাবাহিনীর সাথে জনতার সংঘর্ষে মৃতের সংখ্যা বাড়তে থাকে। মৃত্যুর মিছিলের সাথে বাড়তে থাকে প্রতিবাদকারীদের ক্ষোভ। এমতাবস্থায় সিরিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন। পাশাপাশি তুরস্কের এরদোয়ান সরকার তাদের দেশে আসাদ বিরোধীদের অফিস খোলার সুযোগ করে দেয়।

জুলাই নাগাদ সংঘর্ষে মৃতের সংখ্যা ১৪০০ ছাড়িয়ে যায়। তা সত্ত্বেও বিক্ষোভে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। সেনাবাহিনীর সাথে জনতার সংঘাত চরম আকার ধারণ করে। বাশার অনুগত সেনাবাহিনীতে সুন্নী যত সৈনিক ছিল তারা দলত্যাগ করে বিরোধী শিবিরে যোগ দিতে শুরু করে। এতদিনে বিভিন্ন প্রদেশে বাশার বিরোধীরা মিলিশিয়া-যোদ্ধাবাহিনী তৈরি করে ফেলেছিল। বিদ্রোহী সৈন্যরা এসব গ্রুপকে একত্র করে ২০১১ সালের অক্টোবরে তৈরি করেন আলজাইশ আসসূরী আলহুর বা 'ফ্রি সিরিয়ান আর্মি'। সেনাবাহিনী এতদিন সাধারণ মানুষের ওপর ট্যাংক চালিয়ে দিলেও এখন যুদ্ধ শুরু হয় সশস্ত্র বিদ্রোহীদের সাথে। আন্তর্জাতিক শক্তিগুলোর মধ্যে ইরান ও রাশিয়া বাশারের পক্ষে অবস্থান নেয়, বিপরীতে তুরস্ক, সৌদি, আমেরিকা এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন বিদ্রোহীদের সমর্থন দিতে শুরু করে।

বাইরের শক্তির উপস্থিতি

এই প্রেক্ষাপটে সিরিয়ায় আন্তর্জাতিক শক্তিগুলোর স্বার্থ ও পক্ষপাতের কারণ সামনে থাকা জরুরি। আন্তর্জাতিক শক্তিগুলো সিরিয়াতে যে দুই ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে তা মূলত আগ থেকে চলে আসা বিশ্ব রাজনীতির সমীকরণের অনিবার্য ফল। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রভাব বিস্তারকে কেন্দ্র করে আমেরিকা-রাশিয়ার দ্বন্দ্ব বেশ পুরনো। সে মতে বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলোতে আমেরিকার রয়েছে একচ্ছত্র আধিপত্য। আরব শাসকদের গোলামির জালে বন্দী করে সেসব দেশে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করে আমেরিকা সে অঞ্চলে মোড়লগিরি করে। একমাত্র সিরিয়া এর ব্যতিক্রম। হাফিজ আলআসাদ এবং তদীয় উত্তরসূরী বাশার আলআসাদ আমেরিকার বলয়ে না গিয়ে রাশিয়া পক্ষে যোগ দিয়েছিল। সুতরাং সিরিয়া ছিল মধ্যপ্রাচ্যে রাশিয়ার সর্বশেষ এবং একমাত্র ঘাঁটি। আমেরিকা দেখল, আরব বসন্তের ঢেউয়ে সিরিয়ায় যে সরকারবিরোধী বিক্ষোভ শুরু হয়েছিল তা এখন সশস্ত্র সংগ্রামে পরিণত হয়েছে। এমতাবস্থায় যদি বিদ্রোহীদের অস্ত্র ও অর্থ সহায়তা দিয়ে তাদের মাধ্যমে বাশারের পতন ঘটানো যায় তাহলে মধ্যপ্রাচ্যে তার প্রতিদ্বন্দ্বী রাশিয়ার সর্বশেষ আশ্রয়টুকুও শেষ হয়ে যাবে। সুতরাং এটা তার সামনে সুবর্ণ সুযোগ হয়ে দেখা দিল। বিপরীতে একই চিন্তা রাশিয়ার মাথাতেও আসল। বাশারের পরাজয় ঘটলে মধ্যপ্রাচের মত গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে সে তার সর্বশেষ মিত্রকে হারাবে। তাই যে কোনো মূল্যে বাশারকে ক্ষমতায় রাখতে হবে।

সিরিয়া যুদ্ধের পালামঞ্চে আমরা যে নাটক মঞ্চস্থ হতে দেখি সেখানে আমেরিকা-রাশিয়ার পাশাপাশি আরো কিছু দেশকে অভিনয়ে দেখা যায়। প্রশ্ন হচ্ছে এখানে তাদের কী স্বার্থ? আঞ্চলিক রাজনীতি বলতে একটা ব্যাপার আছে। সৌদি আরব মধ্যপ্রাচ্যে তার আধিপত্য ধরে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করছে। বিপরীতে বিভিন্ন সময়ে ফাঁস হওয়া নথিতে দেখা গেছে, ইরান সৌদির হেজাযভূমিসহ সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য নিজেদের দখলে নিয়ে বৃহৎ শিয়ারাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছে। ইরানের এমন স্বপ্ন সৌদির জন্য মারাত্মক হুমকির ব্যাপার। এখানে শিয়া-সুন্নী দ্বন্দ্বের বিষয়টি সামনে আসতে পারে। সে দৃষ্টিকোণ থেকে সিরিয়ার বাশার সৌদির প্রতিপক্ষ এবং ইরানের মিত্র।

দুইয়ে দুইয়ে চার মিলালে দেখা যায় একপাশে সিরিয়া, তাদের পৃষ্ঠপোষক রাশিয়া, ইরান এবং লেবাননের সামরিক শিয়াগোষ্ঠী হিজবুল্লাহ। বিপরীতে সিরিয়ার বিদ্রোহী বাহিনী, তাদের সমর্থন যোগাচ্ছে আমেরিকা, ইসরাঈল, সৌদিআরব, তুরস্ক এবং তাদের মিত্ররা।

প্রথমদিকে আমেরিকা ও সৌদি মদদপুষ্ট সিরিয়ান বিদ্রোহীদের বাশার একাই সেনাবাহিনী দিয়ে প্রতিহত করার চেষ্টা করছিল। তাতে বছর দেড়েক যুদ্ধের পর বাশার বাহিনী এতটাই কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল যে, তাদের পতন সময়ের ব্যাপার বলে মনে হচ্ছিল। এমতাবস্থায় আমেরিকা যখন মধ্যপ্রাচ্য থেকে তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীর সর্বশেষ ঘাঁটিটি ধ্বংসের আনন্দে বিভোর ঠিক তখনই রাশিয়া সরাসরি সৈন্য, অস্ত্র ও যুদ্ধবিমান নিয়ে মাঠে অবতীর্ণ হয়। ইরান থেকেও আসে বিপুল পরিমাণ সৈনিক ও অফিসার। এমনকি লেবাননের হিজবুল্লাহ যোদ্ধাদেরও রণাঙ্গনে বাশারের পক্ষে লড়তে দেখা যায়। মিত্রদের এমন অভাবনীয় সহায়তায় বাশার বাহিনী আবার ফুলে ফেঁপে ওঠে এবং দ্রুত যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি পাল্টে যায়। এই সময়টায় যুদ্ধ সবচেয়ে হিংস্র ও মারাত্মক আকার ধারণ করে।

আইএস

এমন পরিস্থিতিতে আইএসের উত্থান সিরিয়া সংকটকে আরো জটিল করে তোলে। সাবেক আলকায়েদা নেতা আবু বকর বাগদাদি ২০১৩ সালের ৮ এপ্রিল ইরাকে ইসলামিক স্টেট অব ইরাক অ্যান্ড লেভান্ট প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। এরপর ক্রমেই তারা ইরাক ও সিরিয়ায় বিস্তার লাভ করতে থাকে। একপর্যায়ে ২০১৪ সালের জুন মাসে তারা ইরাকের দ্বিতীয় বৃহত্তম ও ঐতিহাসিক শহর মসুল দখল করে। ২০১৪ সালের ২৯শে জুন রমজান মাসে মসুলের ঐতিহ্যবাহী নূরী গ্রান্ড মসজিদে জুম্মার খুতবায় বাগদাদী খেলাফতের ঘোষণা দেন। পরবর্তীতে ইরাক ও সিরিয়ায় আইএসের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকে। একসময় তারা সিরিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শহর রাক্কা দখল করে তাদের রাজধানী ঘোষণা করে।

আইএসের উত্থানের পর সিরিয়া যুদ্ধ ত্রিমুখী আকার ধারণ করে। বাশার, বিদ্রোহী বাহিনী, আইএস– প্রত্যেকে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকে। মাঝখান দিয়ে আইএস দমনের নামে শুরু

Scanned by CamScanner

হয় আমেরিকা-ইসরাঈলের বর্বরতা। তাদের ক্রমাগত বিমান হামলায় মৃত্যু ঘটে অসংখ্য নিরীহ মানুষের। সবমিলিয়ে ২০১৩ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত ত্রিমুখী যুদ্ধ অপূরণীয় ক্ষতি করেছে ইরাক ও সিরীয় জনগণের। ২০১৭ সালের জুলাই মাসে মসুল পতনের মাধ্যমে আইএসের খেলাফতের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটলেও বাশার বাহিনী এবং বিদ্রোহীদের মধ্যকার দ্বিমুখী যুদ্ধ অব্যাহত থাকে।

বর্তমান অবস্থা

বর্তমানে রাশিয়া, ইরান ও হিজবুল্লাহর সমর্থনপুষ্ট বাশার বাহিনী অত্যন্ত সুবিধাজনক অবস্থানে আছে। তাদের হামলায় একের পর এক বিদ্রোহী নিয়ন্ত্রিত শহরের পতন ঘটছে। যখন যে শহরে অভিযান শুরু হয় সেখানকার মানুষ মারাত্মক মানবিক বিপর্যয়ে পড়ে। বাশার বাহিনী ও রাশিয়া সর্বশেষ গণহত্যা চালায় দামেস্কের উপকণ্ঠে অবস্থিত গৌতায়। চলতি বছরের ১৮ ফেব্রুয়ারি হামলা শুরু করে ১৮ মার্চ তারা গৌতা দখল করে। এই সময়ে কিয়ামতের বিভীষিকা নেমে এসেছে গৌতাবাসীর ওপর। মুহুর্মুহু বিমান হামলায় কেঁপে উঠেছে আকাশ-বাতাস। বিমান হামলা, ট্যাংক, কামান ও মেশিনগানের গোলাবর্ষণে শহরটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। মানুষ গুলির আঘাতে মরেছে, বিমান হামলায় মরেছে, আগুনে পুড়ে মরেছে। ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে বিধ্বস্ত হওয়া ভবনের ইট-পাথরের নিচে চাপা পড়ে মৃত্যুবরণ করেছে নাম না জানা কত মানুষ। চিকিৎসার অভাবে মাটিতে পড়ে কাতরেছে আহত শিশুরা। এরপর অনাহারে বিনা চিকিৎসায়, ফুলের মত শিশুরা বুকভরা অভিমান নিয়ে নিষ্ঠুর এই পৃথিবী ত্যাগ করেছে। তাদের নিয়ে শহর ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগটুকু বাবা-মায়েরা পায়নি। মাসব্যাপী হামলায় খাবারের মজুদ ফুরিয়ে গেছে। গরু-ছাগলের মত ঘাস খেয়ে কেটেছে তাদের দিন। এক ফোঁটা পানির জন্য হাহাকার উঠেছে গৌতার অলিগলিতে। কিন্তু না, তাদের হাহাকারে, তাদের আহাজারিতে কিছুই আসে যায় না মানুষের খোলস পরা এই পৃথিবীর হায়েনাদের। বিধ্বস্ত ভবনের ভগ্ন দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে, এসেছে তাদের আর্তনাদ। তাদের ফরিয়াদ শোনার মত সময় এই ব্যস্ত পৃথিবীর নেই। নিষ্ঠুর পৃথিবীর এ এক বীভৎস রূপ।

একই বর্বরতার শিকার হয়েছিল বিদ্রোহীদের সবচেয়ে বড় ঘাঁটি আলেপ্পো (হালাব)-এর জনগণ। মাসের পর মাস ব্যাপী অবরোধে আলেপ্পোর মানুষ কীভাবে কালাতিপাত করেছিল তার স্থির ও ভিডিও চিত্র দেখলে পৃথিবীর পাষাণতম মানুষেরও অন্তরাত্মা কেঁপে উঠবে। মানবতা ও মনুষ্যত্বকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে অসহায় নারী-শিশুর রক্ত পান করে এভাবেই বাশার বাহিনী দখল করছে একের পর এক শহর।

১৯ মার্চ নিজে গাড়ি ড্রাইভ করে বাশার বিজয়ী বেশে গৌতায় প্রবেশ করেছে। তার মাটি চাই। ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া গৌতার মাটি বাশার পেয়েছে। কিন্তু সেই মাটিতে লেগে আছে ছোপ ছোপ রক্ত, সেই মাটিতে মিশে আছে অসহায় নারীর তপ্তাশ্রু, সেই মাটি সাক্ষী হয়ে আছে একবিংশ শতাব্দীর নিষ্ঠুরতম গণহত্যার।

গৌতায় হামলার সময় সিরিয়ায় তুর্কি অভিযানের কথা বেশ আলোচিত হয়েছে। বুঝে না বুঝে অনেকেই বগল বাজিয়েছে। অথচ সিরিয়ার মূল যুদ্ধক্ষেত্রের ধারেকাছে তুরস্ক যায়নি। তাদের টার্গেট ছিল তুর্কি সীমান্তে অবস্থিত সিরিয়ার আফরিন এলাকা। যেখানে বিপুল পরিমাণ কুর্দির বসবাস। এই কুর্দিরা অস্থিশীলতার সুযোগে আলাদা কুর্দিস্তান তৈরি করতে চাচ্ছে, যাকে তুরস্ক নিজের জন্য হুমকি মনে করে। কারণ এতে তুরস্কের ভেতরে থাকা কুর্দিরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে এবং তুরস্কের সীমান্তবর্তী বিশাল ভূখণ্ডসহ কুর্দিস্তানের সাথে মিশে যেতে চাইবে। এদের দমনের জন্য তুরস্কের এই অভিযান। এর সাথে সিরিয়ার মূল লড়াইয়ের কোনো যোগসাজশ নেই।

শেষকথা

সিরিয়া যুদ্ধ যেভাবে মোড় নিয়েছে তাতে অভাবনীয় কিছু না ঘটলে বাশারের চূড়ান্ত বিজয় সময়ের ব্যাপার। রাশিয়ার অস্ত্র আর ইরানী ও হিজবুল্লাহ যোদ্ধাদের সহায়তায় দেশের সিংহভাগ এলাকা তার আয়ত্তে চলে এসেছে। নিকটতম সময়ের মধ্যেই তারা হয়ত সিরিয়া যুদ্ধের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করবে। বিদ্রোহী গ্রুপের পক্ষে আমেরিকা ও অন্যান্য রাষ্ট্রের সমর্থন ও সহায়তা সত্ত্বেও কেন এই পরাজয়? এর কারণ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা অতি প্রয়োজন। বাশারবিরোধী জোটের অনৈক্য ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের ভিন্নতার ব্যাপারটি মোটেই উপেক্ষা করার মতো নয়। যে কারণে তা শুধু ধ্বংসই টেনে আনল। যে উদ্দেশ্যে এই বিপুল প্রাণহানী তা অধরাই থেকে গেল। সিরিয়া আগে বাশারের হাতে ছিল, এখন আটবছর যুদ্ধের পরেও হয়ত তার হাতেই থাকবে। কিন্তু দুই সিরিয়ার মাঝে কত তফাৎ! মাঝখানের আটবছরের গৃহযুদ্ধ পুরো দেশটাকে তছনছ করে দিল। স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালত, ব্যাংক, হাসপাতাল, দামেশকের সমৃদ্ধ প্রকাশনীগুলো– সব মিশে গেছে মাটির সাথে। যুদ্ধশেষে বাশার যে দেশটা হাতে পাবে তা ভগ্ন, বিধ্বস্ত, জনশূন্য ভুতুড়ে এক দেশ। সে দেশের আকাশ নীল হয়ে আছে স্বজনহারা মানুষের বেদনায়, সে দেশের বাতাস ভারি হয়ে আছে নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের হাহাকারে। এক যুদ্ধ সব কেড়ে নিল, সব।

সিরিয়া যুদ্ধ যত সমাপ্তির দিকে যাচ্ছে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন ততই বড় হয়ে আমাদের সামনে দুলতে শুরু করেছে। আমাদের ভাইদের এত অশ্রু ঝরলো, এত জীবনপ্রদীপ নিভলো, আমরা কী করলাম? আমাদের মুসলিম শাসকেরা কী করল? ওআইসি, আরবলীগ কিংবা এসিতে বসে বিলাস করা 'খাদিমুল হারামাইন'রা কী করলো? অন্যের বিপদে তারা কুলুপ এঁটে রইল কিংবা দু'লাইনের বিবৃতি দিয়ে দায়িত্ব পূরণ করল, হায়েনার হিংস্র থাবা যখন তাদের দেশে পড়বে তখন কে দাঁড়াবে তাদের পাশে? ইরাক, আফগান, কাশ্মীর, ফিলিস্তীন, মিয়ানমার, সিরিয়া– উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু সর্বত্র রক্ত ঝরছে কেবল মুসলিমের। এ নিয়ে কোন মাথাব্যথা আছে আমাদের কিংবা মুসলিম রাষ্ট্রনায়কদের? পরিবার নিয়ে আরামআয়েশ করে দিব্যি খেয়ে-পরে দিন কাটাতে পারলেই যদি সন্তুষ্ট থাকি তবে কী পার্থক্য চতুষ্পদ জন্তুর সাথে? 'আপন জান বাঁচা'র এই ধান্ধা আর কতদিন? আপন জান বাঁচানোর জন্যই যে সবে মিলে অন্যকে রক্ষা করতে হবে, নইলে শকুনের বিষাক্ত দৃষ্টি একদিন আমাদের ওপরও পড়বে– সেই অমোঘ সত্য কে বোঝাবে আমাদের? ●

ভর্তি চলছে! ভর্তি চলছে!! ভর্তি চলছে!!!

শাইখুল হিন্দ রহ. ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার

আবাসিক/অনাবসিক

আমাদের বিভাগ সমূহ

আবাসিক/অনাবসিক

- নূরাণী ও নাজেরা বিভাগ
- হিফজুল কুরআন বিভাগ
- বয়স্ক কুরআন শিক্ষার আসর ও কর্মজীবিদের নৈশ মাদরাসা
- মাদানী নেসাব ১ম, ২য় ও ৩য় বর্ষ
- ইফতা বিভাগ (১ বছর)
- আরবী সাহিত্য (আদব) বিভাগ (১ বছর)

যোগাযোগঃ সানারপাড়, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। ০১৭১৬-৪৮৯১৫৬, ০১৭৬২-৯৩০৪৯৯, ০১৮৪২-৪৮৯১৫৬

মুহতামিম মুফতী খালেদ সাইফুল্লাহ

Scanned by CamScanner

মিসবাহুল কুরআন মাদরাসা
মাদানী নেসাব

১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বর্ষে
১৪৩৯/৪০ হিজরী শিক্ষাবর্ষের

ভর্তিতথ্য

- তত্ত্বাবধানে
  হাফেজ মাওলানা আরিফ হাস্সানি (ঢাকার হুজুর) দা: বা:।
- ফরম বিতরণ, ভর্তি পরীক্ষা ও ভর্তি: ৮ই শাওয়াল থেকে।
- আবাসন ও অন্যান্য তারতীব: ১০ই শাওয়াল।
- দরস শুরু: ১১ই শাওয়াল।

আরজগুজার : **মাওলানা মোঃ ইসহাক হোসাইন**
মুহতামিম, অত্র মাদরাসা

বি: দ্র: যাতায়াত- রামপুরা বাজার থেকে রিক্সাযোগে পূর্বরামপুরা মোল্লাবাড়ি (কাঁচা বাজার) পুষ্পশ্রী জামে মসজিদ সংলগ্ন।
যোগাযোগ: ০১৯৮৬০৬৯৬৫৮, ০১৭৬৩৫৩১৫২৪

জামিয়া ইসলামিয়া ইব্রাহীমিয়া দারুল উলূম
(মেরাজনগর মাদরাসা)
মেরাজনগর, কদমতলী, ঢাকা-১৩৬২।

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

১৪৩৯/৪০ হি. শিক্ষাবর্ষে দুই বিভাগে সীমিত সংখ্যক আগ্রহী তালীবুল ইলম ভর্তি করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আদব বিভাগ: মেয়াদ- এক বছর।

ইফতা বিভাগ: মেয়াদ- দুই বছর (দ্বিতীয় বছর ঐচ্ছিক)

- বিষয়ভিত্তিক সাপ্তাহিক মুহাযারার ব্যবস্থা।
- মুশরিফ উস্তাদের সুপারিশক্রমে সালে ছানীতে মেধাবী ও নাশিত তালিবুল ইলমদের রাখা হবে এবং তাদেরকে মাসিক সম্মানীও প্রদান করা হবে ইনশাআল্লাহ।
- ইফতা বিভাগের লিখিত পরীক্ষার বিষয়: আল-হিদায়া ৩য় খন্ড, নূরুল আনওয়ার (কিতাবুল্লাহ)।
- আদব বিভাগ: ইনশা ৩য় খন্ড

উভয় বিভাগের পরীক্ষার তারিখ: ৮-১০ শাওয়াল।

যোগাযোগ: ০১৮১৮-৫৬৭১৪৪, ০১৮২৯-০১৭২০৪

মারকাযুল উলূম আলইসলামিয়া হাজীপাড়া, নারায়ণগঞ্জ
মোবাইল ঃ ০১৭৪৩৮৩৮৯৫৯

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

মকতব থেকে তাকমীল পর্যন্ত তাখাস্সুসাতসহ সকল বিভাগে ৮ শাওয়াল থেকে ১২ শাওয়াল পর্যন্ত ভর্তি চলবে-ইনশাআল্লাহ্

উলূমুল হাদিস বিভাগ (দুই বছর মেয়াদি)
ভর্তি পরীক্ষা: লিখিত: ফাতহুল বারী প্রথম খণ্ড উমদাতুল কারী প্রথম খণ্ড এবং আরবী ও বাংলা সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ।
মৌখিক : প্রাসঙ্গিক যে কোন বিষয়।

ফিক্‌হ ও ফাতাওয়া বিভাগ (এক বছর মেয়াদি)
ভর্তি পরীক্ষা: লিখিত: হিদায়া ৩য় খণ্ড (কিতাবুল বুয়ূ) ও নূরুল আনওয়ার (কিতাবুল্লাহ)
মৌখিক : প্রাসঙ্গিক যে কোন বিষয়।
বিঃ দ্রঃ আগ্রহী ও মেহনতী তালিবুল ইলমদেরকে ২য় বর্ষে পড়ার সুযোগ দেওয়া হয়।

আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ (এক বছর মেয়াদি)
ভর্তি পরীক্ষা: লিখিত: নাহু-সরফের জরুরী কাওয়াঈদ ও প্রাথমিক ইনশা।
মৌখিক : যে কোন আরবী কিতাব।

পরীক্ষার তারিখ : ১ম বার: ৮ শাওয়াল, ২য় বার: ১০ শাওয়াল ১৪৩৯ হি.(সকাল ৯টা থেকে)

রমযানে বিশেষ মেহনত (১ রমযান থেকে ১৯ রমযান পর্যন্ত)
❑ ফিক্‌হ ও উলূমুল হাদিসে আগ্রহী তালিবুল ইলমদের মোতালাআর ব্যবস্থা ❑ নাহু-সরফ্ ভিত্তিক কিতাব পড়া ও বুঝার মেহনত
❑ হিফজুল হাদিস ❑ খত্তে রুকআ ও হাতের লেখা সুন্দর করার প্রশিক্ষণ।
বিঃ দ্রঃ- এতে অংশগ্রহণকারী তলাবাদের ভর্তি ফি ৫০০ টাকা ধার্য্য করা হয়েছে। তবে ওযর থাকলে বিবেচনা করা হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য
মারকাযে ভর্তিচ্ছুক তালিবুল ইলম জন্ম নিবন্ধন/জাতীয় পরিচয় পত্র ও পাসপোর্ট সাইজের ২ কপি ছবি সঙ্গে নিয়ে আসবেন।

মুহতাজে দু'আ
মাওলানা আবদুল আউয়াল
মুহতামিম, হাজীপাড়া মাদরাসা

যাতায়াত : নারায়ণগঞ্জ শহর/পঞ্চবটি থেকে রিক্সা/অটোরিক্সায় কাশীপুর দেওয়ানবাড়ী, হাজীপাড়া মাদরাসা

Scanned by CamScanner

জীবন থেকে

সুস্থতা-অসুস্থতা : দুটি নিআমত

হযরত মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানবী রাহ.

কখনো কখনো ছোট একটি ঘটনাও মানুষের জন্য উপদেশের অনেক বড় বার্তা নিয়ে আসে। আমার ব্যস্ততা কিংবা অলসতার দরুন বায়্যেনাত (মাসিক পত্রিকা) তৈরি হয়ে প্রেসে যেতে সবসময় দেরি হয়ে যায়। যিলকদ সংখ্যাটি প্রেসে গিয়েছে যিলকদের প্রথম দিকে। তাই এবার সঙ্গীদের বলেছিলাম, যিলহজ্ব সংখ্যাটিও যেন একসাথে আট-দশ দিনের মধ্যেই তৈরি করে ফেলা হয়। এ সময় অন্য সকল ব্যস্ততা বন্ধ। বিলম্বের এ ধারা যেন এখানেই শেষ হয়।

এটা সম্ভবত ২ যিলকদ বৃহস্পতিবারের ঘটনা। ৩ যিলকদ জুমার দিন গোসল করার সময় ডান কানের নিচে সামান্য ব্যাথা অনুভূত হল। পিঁপড়ার কামড়ের মতো। চিন্তার দূরতম সীমায়ও একথা আসেনি যে, এটা কোনো কঠিন অসুস্থতার পূর্বাভাস। জুমা পড়া হল। জুমার পর অভ্যাস অনুযায়ী খাবার খেয়ে কিছুক্ষণ কাইলুলাহ। আসরের পূর্বে শরীরের তাপ একটু একটু বাড়তে থাকে। সাথে অবসাদ আর ক্লান্তি। বাদ আসর জিকিরের মজলিসে আর শরিক হতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু অলসতাকে প্রশ্রয় দিলাম না। অযু করে অভ্যাস অনুযায়ী জিকিরের মজলিসে শরিক হওয়ার জন্য মাদরাসায় চলে গেলাম। সেখান থেকে মাগরিবের পূর্বে গেলাম আল ইখওয়ান মসজিদে। (জুমার দিন বাদ মাগরিব সেখানে দরসে কুরআন হয়।) দরস শেষ করে গাড়ীতে পৌঁছার আগেই শরীরে প্রচণ্ড কাঁপুনি শুরু হল। খুব কষ্টে বাসায় এলাম। শরীর কাঁপার সাথে শুরু হল প্রচণ্ড জ্বর। কানের নিচে যেখানে ব্যাথা অনুভূত হচ্ছিল সে জায়গাটা ফুলে গেল।-ফোলাভাব ২/৩ দিনের মধ্যে ছড়িয়ে গেল সমস্ত ঘাড়ে। কানে বড় বড় ফোড়া দেখা দিল। পানি পড়তে লাগল সেখান থেকে। এমন জ্বালা হচ্ছিল যে, কোনো দিকেই পাশ ফিরতে পারছিলাম না। জ্বর ছিল একশ চার-পাঁচ ডিগ্রি। মনে হচ্ছিল গরম চুলায় জ্বলছি। অস্থিরতা ও অশান্তির কোনো শেষ ছিল না।

ডাক্তার জ্বরের ঔষধ দিল। তাতে এ পরিমাণ ঘাম হচ্ছিল যে, দৈনিক তিন-চারবার ভেজা কাপড় দিয়ে শরীর মোছা হত। এরপরও জ্বরের তীব্রতা কমত না। অনবরত কয়েক রাত এক ফোটাও ঘুম হয়নি। পনের দিন এভাবেই বিছানায় পড়ে রইলাম। রোগের কারণে একদম দুর্বল হয়ে গেলাম। আল্লাহ তাআলার লাখো শুকরিয়া তিনি নিজ দয়া ও অনুগ্রহে পুনরায় সুস্থতা দান করেছেন। আমি যেন নবজীবন লাভ করেছি।

বাহ্যিকভাবে এটা খুব সামান্য একটি ঘটনা। এ ধরনের ঘটনা মানুষের জীবনে প্রতিনিয়ত ঘটছে। আলোচনা করার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় না। কারণ উদ্‌ঘাটন কিংবা এ থেকে কোনো ফলাফল বের করার প্রয়োজনীয়তাও হয়তো মনে হবে না অনেকের কাছে। কিন্তু এই সামান্য ঘটনাটি অসামান্য উপদেশের বার্তা বয়ে নিয়ে এসেছিল আমার জন্য। শারীরিকভাবে যেমন প্রভাবিত হয়েছিলাম তেমনি চিন্তা-চেতনায় এবং মন-মস্তিষ্কে গভীর রেখা অংকন করেছিল ঘটনাটি। পাঠকের সামনে সেই অনুভূতিগুলো কিছুটা তুলে ধরার চেষ্টা করব।

* * *

সুস্থতা আল্লাহ তাআলার অনেক বড় নিআমত। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে–

نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ.

দুটি নিআমতের ক্ষেত্রে অনেক মানুষ ধোঁকার মধ্যে রয়েছে : ১. সুস্থতা ২. অবসর। –সহীহ বুখারী, হাদীস ৬৪১২

অনেক মানুষ ধোঁকার মধ্যে থাকার অর্থ হল, প্রথমত এই দুই নিআমত সাধারণত একসাথে লাভ হয় না। অনেক মানুষ সুস্থ, কিন্তু তার অবসর নেই। আবার অনেকে অবসর, কিন্তু সুস্থ নয়। আর কারো ভাগ্যে যদি উভয় নিআমতই একসাথে মিলে যায় তবে এর প্রকৃত মূল্যায়ন খুব কম মানুষই করে থাকে; বরং অযথা কাজকর্মে এ দুই নিআমত নষ্ট হয়ে যায়।

অসুস্থতাও আল্লাহ তাআলার অনেক বড় নিআমত। বিভিন্ন হাদীসে রোগ-শোক ও বালা-মসিবতেরও তাৎপর্য ও ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। অসুস্থতা দেহের যাকাত স্বরূপ। এর দ্বারা শরীর গুনাহমুক্ত হয়, পাক-পবিত্র হয়। আল্লাহর কাছে বান্দার মর্যাদা বুলন্দ হয়। ভবিষ্যত জীবনের জন্য উপদেশ গ্রহণের সুযোগ তৈরি হয়।

জামে তিরমিযীর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, কিয়ামতের দিন বিপদগ্রস্ত লোকদেরকে যে মহা পুরস্কার দেয়া হবে তা দেখে আফিয়াতের অধিকারী লোকেরা কামনা করবে, হায়! দুনিয়াতে যদি তাদের দেহ কাঁচি দিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করা হত (আর তার বিনিময়ে আখেরাতের এ মহা পুরস্কার লাভ হত) –জামে তিরমিযী, হাদীস ২৪০২

অসুস্থতার সময় নিজের দুর্বলতা ও অক্ষমতা মানুষের কাছে স্পষ্টরূপে ফুটে উঠে। শারীরিক শক্তি ও সুস্থতা, আভ্যন্তরীণ প্রতিভা ও সৃষ্টিশীলতার মিথ্যা অহমিকা অনেকেরই আছে। কোনো অভিনব সৃষ্টিশীল কাজ করে নিজের দিকে তা সম্পৃক্ত করে পুলক অনুভব করার মানসিকতা আছে সবারই। কখনো কোনো বড় কাজ করতে পারলে বুদ্ধির অপরিপক্কতা ও অপূর্ণতার দরুন উজ্‌ব ও অত্মমুগ্ধতার শিকার হয়ে যায় অনেকেই। কখনো এই মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতা এ পর্যায়ে পৌঁছে যে, ব্যক্তি নিজেকেই নিজের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রক ও সর্বেসর্বা মনে করে বসে। অথচ মানুষ এতটাই দুর্বল ও অক্ষম যে, তাকে পরাভূত করার জন্য ছোট্ট একটা পাখীই যথেষ্ট।

অধিকাংশ সময়ই মানুষ ভুলে যায় যে, তার শারীরিক শক্তি ও সুস্থতা, প্রতিভা ও যোগ্যতা তার নিজের ক্ষমতাবলে পাওয়া নয়; বরং তা মালিকের দান। তিনি দিয়েছেন। চাইলে আবার ছিনিয়েও নিতে পারেন। তাছাড়া মানুষের শক্তি, সুস্থতা ও যোগ্যতার ব্যবহারও আল্লাহ তাআলার দয়া ও তাওফীকের উপর নির্ভরশীল। মানুষের কৃত কল্যাণকর কাজ নিজের শক্তিবলে নয়; বরং দয়ালু ও মহান প্রতিপালকের দয়া ও করুণার কারণেই সম্পাদিত হয়। যদি এক মুহূর্তের জন্যও তিনি তাওফীকের ছায়া উঠিয়ে নেন তাহলে মানুষ এক পাও উপরে উঠাতে পারবে না। যেমনিভাবে বিদ্যুৎ ছাড়া কারখানার সকল মেশিন অচল পড়ে থাকে তেমনিভাবে আল্লাহর দয়া ও তাওফীক ছাড়া মানুষের সকল প্রতিভা ও যোগ্যতা অচল পড়ে থাকবে। মানুষের অস্তিত্ব, শারীরিক-আত্মিক সকল শক্তি ও প্রতিভা প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ তাআলার হেফাযত ও তত্ত্বাবধানের মুখাপেক্ষী। তিনি যদি হেফাযতের কুদরতি চাদর একটুখানি উঠিয়ে নেন তাহলে মানুষের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে। সকল প্রতিভা ও যোগ্যতা

Scanned by CamScanner

মূল্যহীন হয়ে পড়বে। মানুষ দুর্বল কোনো পাখী কিংবা কীট-পতঙ্গ থেকেও নিজেকে রক্ষা করতে পারে না।

قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمٰنِ.

বল, রাতে ও দিনে দয়াময় ছাড়া আর কে তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে।–সূরা আম্বিয়া (২১) : ৪২

মোটকথা মানুষের সবকিছুই মহান মালিকের দান। মানুষ যেমন নিজের অস্তিত্বের জন্য তাঁর মুখাপেক্ষী তেমনি নিজের হেফাযত ও নিরাপত্তা এবং বাহ্যিক ও ভেতরগত সকল শক্তির সঠিক ব্যবহারের জন্যও তাঁর মুখাপেক্ষী।

মানুষের সকল গুণই অপসৃয়মান। এখন হয়ত আছে কিছুক্ষণ পর আবার দূর হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু অক্ষমতা, দুর্বলতা ও মুখাপেক্ষিতা মানবজীবনের এমন অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা এক মুহূর্তের জন্যও দূর হয় না। প্রত্যেক মুসলমানের হৃদয়ে এ বিশ্বাস থাকলেও বিশ্বাসের উপলব্ধি জাগরুক নেই অনেকের মাঝেই।

* * *

হযরত আরেফ বিল্লাহ ড. আবদুল হাই রাহ. অনেক সময় বলতেন, আমলকে যদি নিজের দিকে সম্বন্ধযুক্ত কর তাহলে এর জন্য পস্তাতে হবে তোমাকে। যদি নেক আমল কর তাহলে তো উজ্ব ও গর্বে ফুলে উঠবে। আর যদি আমলের মধ্যে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকে তাহলে হতাশ হয়ে আমলের হিম্মতই হারিয়ে ফেলবে। হযরত বলতেন, সবসময় আমলকে আল্লাহ্র দিকে নিসবত কর। তাঁর দান এবং ইহসান মনে কর। এতে মনে কখনো আত্মগর্ব জাগবে না। আবার কখনো হতাশও হবে না। কোনো কামাল বা পূর্ণতার দিকে দৃষ্টি গেলে সাথে সাথে শুকরিয়া আদায় করে বল–

الحمد لله، اللهُم لَكَ الْحَمْدُ ولك الشكر.

হে আল্লাহ! আপনার শুকরিয়া, আপনি এ মহা নিআমত আমাকে দান করেছেন। আর যদি কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় তাহলেও মালিকের দান মনে করে তার সঠিক মূল্যায়ন করবে।

পবিত্র কুরআনের ইরশাদ–

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ.

তোমরা আল্লাহ্র নিআমত গণনা করে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয়ই মানুষ অকৃতজ্ঞ ও নাফরমান। –সূরা ইবরাহীম (১৪) : ৩৪

শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমাদ উসমানী রাহ. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখেন, 'আল্লাহ তাআলার নিআমত এত অসংখ্য যে, যদি তোমরা সবাই মিলে ভাসাভাসাভাবেও গণনা শুরু কর তাহলেও ক্লান্ত হয়ে বসে পড়বে। শেষ অংশের ব্যাখ্যায় বলেন– 'মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অকৃতজ্ঞ ও জালেম ঐ ব্যক্তি, যে এত অসংখ্য নিআমত দেখেও নিজের প্রকৃত ও মহান দাতার হক সম্পর্কে সচেতন হয়নি।

আমরা আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায়ের ক্ষেত্রে কত অক্ষম! তাঁর একটি নিআমতের শুকরিয়াও আমাদের পক্ষে যথাযথভাবে আদায় করা সম্ভব নয়। শুধু আফিয়াতের নিআমতের কথাই চিন্তা করুন। কত বিস্তৃত এই নিআমাত! কত অসংখ্য তার শাখা-প্রশাখা। এই অসংখ্য শাখা-প্রশাখার অধিকাংশের ক্ষেত্রেই আমাদের মনে হয় না যে, এরও শুকরিয়া আদায় করা উচিত।

প্রতিটি মুহূর্তে আমরা কত নিআমতের মধ্যে ডুবে আছি। অনেক নিআমতের দিকে তো মানুষের দৃষ্টি যায় এবং কিছু না কিছু হলেও শুকরিয়া আদায় করে। কিন্তু লাখো-কোটি নিআমত এমন, যা মানুষের উপলব্ধি- সীমারও বাইরে; সেগুলোর শুকরিয়া আদায় হবে কীভাবে? আমাদের এই দেহযন্ত্রের প্রতিটি অংশের জন্যই কি আলাদা আলাদাভাবে শুকরিয়া করা উচিত নয়? কিন্তু আমাদের মধ্যে কে এমন আছে, যার দেহের কোনো একটি অঙ্গের সুস্থতা ও আফিয়াতের জন্য সার্বক্ষণিক শুকরিয়া আদায়ের সৌভাগ্য হয়েছে।

দিনের তুলনায় রাতের বেলা রোগের কষ্ট ও তীব্রতা সাধারণত বেড়ে যায়। এর কারণ এটা হতে পারে যে, দিনের কোলাহল ও কর্মের আয়োজনে অসুস্থতার প্রতি রুগীর মনযোগ থাকে না। কিন্তু যখন সকল আয়োজন ও কর্মচাঞ্চল্য শেষ হয়ে যায় তখন রাতের নির্জনতায় অসুস্থ ব্যক্তির সকল মনোযোগ নিবদ্ধ হয় রোগের প্রতি। তাই কষ্টের অনুভূতিও তখন বেড়ে যায়। আরেকটি কারণ এ-ও হতে পারে যে, রাত হচ্ছে বিশ্রামের সময়। এজন্য স্বভাবগতভাবেই মানুষ রাতের বেলা একটু আরাম ও বিশ্রাম করতে চায়। তবে অসুস্থতা এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ফলে কষ্টের অনুভূতিও দ্বিগুণ হয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ– এক ব্যক্তি সুস্থ। শারীরিক কোনো রোগ তার নেই। সে ঘুমাতে চাচ্ছে। কিন্তু অন্য একজন তাকে ঘুমুতে দিচ্ছে না। অনবরত কয়েক রাত এভাবেই কেটে গেল। সে হয়তো অসুস্থ নয়। কোন ব্যথা-বেদনাও নেই তার শরীরে। কিন্তু বিশ্রাম না করতে পারাটা তার জন্য অনেক বড় কষ্টের ব্যাপার। এখন যদি ব্যথা-বেদনার পাশাপাশি বিশ্রামের আনন্দ থেকেও বঞ্চিত থাকে তাহলে স্বাভাবিকভাবেই এতে রোগীর কষ্ট আরো বেড়ে যায়। এসব কারণে রাত আসার কল্পনাই অসুস্থকে অস্থির করে তোলে। হায় আল্লাহ! রাত কাটাব কী করে!

রাতের বেলা যে বিষয়টি আমার গভীরভাবে উপলব্ধি হত এবং আমার দুর্বলতা অস্থিরতা, মানসিক কষ্ট ও বেচাইনি আরো বাড়িয়ে দিত, তা হল, এটা তো আমার সেই পরিচিত ঘর, বছরের পর বছর যেখানে আমি আছি; সেই পরিচিত বিছানা, সবসময় যেখানে আমি বিশ্রাম করি। এখানে চিকিৎসার জন্য ডাক্তার আছে, ঔষধ আছে, খাবার আছে। সেবার জন্য মানুষ আছে। এরপরও শুধু রাতের অন্ধকার ও নির্জনতা আমার রোগের প্রকোপ আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে। তাহলে কবরের অন্ধকার ও নির্জনতায় কী পরিমাণ অস্থিরতা ও একাকিত্ব বোধ হবে। সেখানের সবকিছুই তো অপরিচিত। সেই জগৎ। সেই জায়গা। সেই মাটির বিছানা। যেখানে শোয়ার সুযোগ আর কখনো হয়নি। সেখানে আপন কেউ নেই। কোনো সেবক নেই। কোনো পরিচিতজন নেই। নেই কোনো সহমর্মী। রাতের নির্জনতা ও অন্ধকার যখন মনের মাঝে এ পরিমাণ অস্থিরতা ও বেকারারী সৃষ্টি করে তাহলে কবরের নির্জনতা, অন্ধকার ও একাকিত্ব কীভাবে সহ্য হবে। আর (নাউযুবিল্লাহ, ছুম্মা নাউযুবিল্লাহ) ঐখানে যদি কোনো কষ্টের, কোনো শাস্তির সম্মুখীন হই তাহলে বাঁচার কী উপায় হবে? খুব অস্থির হয়ে বার বার اللهم آنس وحشتي في قبري

দুআটি পড়তাম। সেইসাথে গভীরভাবে উপলব্ধি হত– শুধু আল্লাহর সাথে হৃদয়ের সম্পর্কই তো কাজে আসবে কবরে। এই সম্পর্ক যাদের নসীব হয়েছে, কোথাও কোনো অবস্থাতেই তাদের নিঃসঙ্গতা ও একাকিত্ববোধ হয় না। কিন্তু আমরা তো মাখলুককে মন দিয়ে দিয়েছি। তার সাথে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে তুলেছি। যদি মাখলুকের সাথে নয়, আল্লাহর সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক হত তাহলে কবরের নিঃসঙ্গতার আশংকা আর মনে জাগত না। মোটকথা, অসুস্থ ব্যক্তির জন্য রাতের নির্জনতা উপদেশ গ্রহণের বার্তা নিয়ে আসে। কবরের একাকিত্বের চিন্তা মনের মাঝে জাগিয়ে তোলে।

* * *

অসুস্থতা হচ্ছে মৃত্যুর কিনারা। অসুস্থ

Scanned by CamScanner

ব্যক্তি যখন রোগযন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে তখন একটি মাত্র ধাক্কাই যথেষ্ট জীবন-নৌকা থেকে মৃত্যুর নদীতে ফেলে দেয়ার জন্য। জীবনসায়াহ্নের মুহূর্তটাকে 'জীবন-মৃত্যুর যুদ্ধ' বলার ভুল একটা প্রচলন সমাজে আছে। অথচ জীবন আর মৃত্যুর মাঝে কোনো যুদ্ধ হয় না। মৃত্যু নির্দিষ্ট সময়ে এসে জীবন প্রদীপকে এক ফুৎকারে নিভিয়ে দেয়। হ্যাঁ, এটাকে আশা ও নিরাশা, শংকা ও সম্ভাবনার যুদ্ধ বলা যেতে পারে।

বারবার মনে জাগছিল, রোগের প্রকোপ যদি আরেকটু বেড়ে যায় তাহলে এখনি হয়তো আমার মৃত্যু হতে পারে। মৃত্যুর পর আশপাশের সবাই, আমার বন্ধু-বান্ধব, আমার স্ত্রী-পুত্র, আমার পরিবার-পরিজন, এই বিশাল পৃথিবীর মানুষেরা আমার কী উপকার করতে পারবে?! আমার সামনে তো তখন আখেরাত, শুধুই আখেরাত। যে আমল শুধু আখেরাতের জন্য করা হয়েছে তাই শুধু কাজে আসবে। দুনিয়া ও দুনিয়ার সকল ধান্দা মরুভূমির মরীচিকা। মিথ্যা প্রহেলিকা। এতে বিভোর হয়ে আখেরাত ভুলে যাওয়া কত বড় মূর্খতা! কত বড় নির্বুদ্ধিতা! আফসোস! আমরা সবাই এই নির্বুদ্ধিতার মাঝেই ডুবে আছি।

মানুষ খুব দ্রুত অতীতের কথা ভুলে যায়। পবিত্র কুরআনেও এ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে–

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ.

মানুষকে যখন বিপদ স্পর্শ করে তখন শুয়ে-বসে-দাঁড়ানো অবস্থায় আমাকে ডাকতে থাকে। আর যখন তাকে বিপদ মুক্ত করে দেই তখন এমনভাবে চলে যায় যেন সে বিপদে পড়ে আমাকে ডাকেইনি। –সূরা ইউনুস (১০) : ১২

শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বির আহমাদ উসমানী রাহ. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখেন– 'অর্থাৎ মানুষ মূর্খতাবশত নিজেই আযাব চাইতে থাকে, কিন্তু যখন বিপদের সামান্য ঝাঁকুনি খায় তখন হতবিহ্বল হয়ে আমাকে ডাকা শুরু করে। মসিবত যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ দাঁড়িয়ে-বসে-শুয়ে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ডাকতে থাকে। আর যখন বিপদ সরিয়ে নেয়া হয় তখন সবকিছু ভুলে যায়। তখন আর আল্লাহর কথা মনে থাকে না। সেই গাফলত, সেই উদাসিনতা, সেই পাপাচারে আবার মেতে ওঠে। ইতিপূর্বে যেগুলোর মাঝে সে আকণ্ঠ ডুবে ছিল।

সুখের অবস্থায় তুমি আল্লাহকে স্মরণ কর, বিপদের অবস্থায় তিনি তোমাকে স্মরণ করবেন।

মুমিনের শান হল, সে কখনো আল্লাহকে ভুলে যায় না। বিপদ-আপদে সবর করে আর সুখে-শান্তিতে শোকর করে। মুমিন ছাড়া এই সৌভাগ্য আর কারো ভাগ্যে জুটে না।

আমাদের অনেকেই বিপদ-আপদ ও অসুস্থ অবস্থায় আল্লাহ তাআলাকে খুব ডাকতে থাকে। মান্নত করে, আল্লাহ তাআলার সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করে, জীবন ধারা বদলে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয়। আর যখন বিপদ-মুক্ত হয়ে যায় তখন সব অঙ্গীকার, সব প্রতিশ্রুতি ভুলে যায়। জীবনটাকে আর বদলানো হয় না। অসুস্থাবস্থায় মুখে যিকিরের যে জীবন্ত উচ্চারণ ছিল, দুআ ও ইনাবাত ইলাল্লাহ্‌র মাধ্যমে হৃদয়ে যে স্বাদ ও সজীবতার অনুভব ছিল, মনের মাঝে আখেরাতের যে জাগ্রত উপস্থিতি ছিল, সুস্থ হওয়ার পর তার কিছুটা ছোঁয়া, কিছুটা ছায়া থাকলেও দিলের সেই কাইফিয়াত, হৃদয়ের সেই স্বাদ ও সজীবতা আর নেই।

এতে মনের মধ্যে ব্যথা অবশ্যই আছে। তবে গাফলতের এ সামান্য ছায়াপাতও আল্লাহ পাকের অনেক বড় নিআমত। কারণ, আমাদের মত দুর্বলদের জন্য আল্লাহ তাআলার সার্বক্ষণিক স্মরণ সাধ্যের বাইরে। তবে হ্যাঁ, পিছনের অবস্থা একদম ভুলে যাওয়া, সুস্থ হওয়ার পর শুকরিয়া আদায়ের পরিবর্তে অকৃতজ্ঞ হওয়া এবং অতীতের মত আবার পাপাচারে ডুবে যাওয়া– এ ধরনের গাফলত খুবই নিন্দনীয়। পবিত্র কুরআনে এর নিন্দা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা এ ধরনের গাফলত ও উদাসীনতা থেকে আমাদের রক্ষা করুন।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয রাহ. -এর কাছে সংবাদ এল, তার অমুক ভাই মারা গেছে। পরবর্তীতে জানা গেল, খবরটি ভুল। সে ভাই এখনো জীবিত আছে। ওমর ইবনে আব্দুল আযীয রাহ. তখন তার ভাইকে চিঠি লিখলেন, প্রথম সংবাদটি যদিও ভুল ছিল, তবুও আমরা তোমার ব্যাপারে মনে করি, মৃত্যুর পর আল্লাহ তাআলা তোমাকে আবার দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। যেন প্রথম জীবনের ভুল-ত্রুটির সংশোধন তুমি করতে পারো। তাই তোমার কর্তব্য, নবজীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে গণীমত মনে করে তা অহেতুক কাজকর্মে নষ্ট করা থেকে বিরত থাকবে।

কঠিন রোগ-ব্যাধি ও অসুস্থতা থেকে সুস্থ হওয়ার পর মনে মনে এ ধারণাই করা উচিত, আমি মারা গিয়েছিলাম। আল্লাহ তাআলা দয়া ও অনুগ্রহবশত আমাকে পুনরায় জীবন দান করে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। তাই জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে বেশি থেকে বেশি ফলপ্রসূ বানানোর চিন্তা করা উচিত। ●

[অনুবাদে : শাহাদাত ছাকিব]

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি ! বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম ভর্তি বিজ্ঞপ্তি !!

আল-জামিয়াতুল মাদানিয়া ঢাকা

৪২/২ সি, কুমিল্লা পট্টি, উত্তর মানিকনগর, মুগদা, ঢাকা-১২০৩

নিম্নোক্ত বিভাগ সমূহে ছাত্র ভর্তি করা হবে ঃ

* কিতাব বিভাগ ঃ

১। ইফতা ঃ মেয়াদ কাল ১ বছর, ৩ ফাতরায় বিভক্ত
দক্ষ মুফতীয়ানে কেরাম দ্বারা পরিচালিত।

বিষয় ভিত্তিক মুহাদারা পেশ করবেন ঃ

মাওঃ মুফতি শিব্বির আহমদ সাহেব
মুফতি ও মুহাদ্দিস ঢালকানগর মাদরাসা, ঢাকা।

২। হিদায়াতুন্নাহু।

৩। হুফ্‌ফাজ (বিশেষ জামাত)
এই জামাতে তাইছির, মিজান ও নাহবেমীরের গুরুত্বপূর্ণ কিতাবসমূহ এক বছরেই যত্নসহকারে পাঠদান করা হবে। এই জামাতে গাইরে হাফেজ মেধাবী ছাত্রদেরও ভর্তি করা হবে।

বিঃ দ্রঃ প্রত্যেক জামাতেই নিয়মিত হাদিস মুখস্ত করানোর ব্যবস্থা থাকবে এবং সাপ্তাহিক (প্রতি শুক্রবারে) খত্তেরুক'আ প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

* হিফজ বিভাগ।

দোয়া প্রার্থী ঃ (মাওঃ) মোঃ আব্দুল হান্নান
উস্তাজুল হাদিস জামিয়া দারুল আরকাম আল-ইসলামিয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
যোগাযোগ ঃ ০১৭৩১-৪৫৬৭৬০, ০১৭৮১-৯৯৭৭৭৬, ০১৭১১-০০৫৬১৭

যাতায়াতঃ কমলাপুর রেল স্টেশন হতে পূর্ব -দক্ষিণে এবং সায়দাবাদ বাস ষ্টেশন হতে উত্তরে মানিকনগর বিশ্বরোড নেমে পুকুরপাড় জামে মসজিদের উত্তর পার্শ্বে ৪২/২ সি, কুমিল্লা পট্টি।

Scanned by CamScanner

বফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ-এর পরিচালনায় ৩০ দিন ব্যাপী

বেফাক নূরানী শিক্ষক প্রশিক্ষণ

স্থান : জামিয়া ইসলামিয়া রসূলপুর

আব্দুল্লাহপুর, দক্ষিণ কেরণীগঞ্জ, ঢাকা।

প্রশিক্ষণের তথ্যাবলী

১৫ শা'বান ১৪৩৯ হিঃ হতে ভর্তি কার্যক্রম শুরু। ২০ শা'বান থেকে ২০ রমযান পর্যন্ত প্রশিক্ষণ চলবে। ইনশা আল্লাহ। খানা ও ভর্তি বাবদ ১৫০০/=

প্রশিক্ষণ দিবেন

হযরত মাওলানা হারুনুর রশীদ (দাঃ বাঃ)
হযরত মাওলানা কারী ইবরাহীম (দাঃ বাঃ)
হাফেজ কারী আব্দুল হান্নান (দাঃ বাঃ)

বিশেষ দ্রষ্টব্য

প্রশিক্ষণে উত্তীর্ণদের বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়ারসনদ প্রদান করা হবে। আগামী ৬ শাওয়াল ১৪৩৯হিঃ হতে দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত

যোগাযোগ :
০১৭৩১-২৬০২৭৮ (মাদরাসা)
০১৭১৭-১৬৬৫৪৬ (বেফাক)

যাতায়াতঃ যাত্রাবাড়ী/পোস্তগোলা ব্রীজ বা গুলিস্তান/নয়াবাজার ব্রীজ হতে মাওয়া রোডে চলাচলকারী বাস/লেগুনা যোগে আব্দুল্লাহপুর নেমেই রসূলপুর মাদ্রাসা।

মারকাযুশ শারাফাহ আল-ইসলামী ঢাকা

গবেষণামূলক ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র

ভর্তি তথ্য

১৪৩৯-৪০ হি. শিক্ষাবর্ষ

(২ বছর) قسم التخصص فى علوم الحديث الشريف
(২ বছর) قسم التخصص فى الفقه والافتاء والاقتصاد الاسلامي

উভয় বিভাগে সীমিত সংখ্যক নির্বাচিত তালেবুল ইলম ভর্তি করা হবে ইনশাআল্লাহ।

ভর্তির নিয়মাবলীঃ

প্রথম পর্ব : ৭ শাওয়াল, দ্বিতীয় পর্ব: ১০ শাওয়াল
মৌখিক সকাল ৯টা, লিখিত দুপুর ২,৩০টা।

উলূমুল হাদীস বিভাগ
লিখিত : শরহুন নুখবা, ফাতহুল বারী (১ম খন্ড) ও আরবী, বাংলা প্রবন্ধ।

ইফতা ও ইকতেসাদ বিভাগ
লিখিত: হেদায়া (৩য় খন্ড), নূরুল আনওয়ার ও আরবী বাংলা প্রবন্ধ।

মৌখিক : উভয় বিভাগ যে কোন কিতাব থেকে।

২৫ শাবান থেকে **ভর্তি কোর্স** ২০ রমজান

উলূমুল হাদীস ও ইফতা বিভাগ

ভর্তি ও খাবার ২০০০ টাকা।

নিবেদক
মুফতী জাফরউল্লাহ মাহবুব কাসেমী
মুহতামিম মারকাযুশ শারাফাহ আল ইসলামী

০১৭৯৯৯২২২৮৮, ০১৭৬৫২৭১৯৬৪, ০১৭৬০৬৮২৫০৩

যাতায়াত: কামরাঙ্গীরচর লোহার ব্রীজ পার হয়ে দক্ষিণে ইব্রাহীমনগর বালুরমাঠ মারকাযুশ শারাফাহ আল ইসলামী ঢাকা-১২১১

শামসুল উলূম হাজীবাড়ী মাদরাসা নরসিংদী

ভর্তি

৬ই শাওয়াল থেকে
১২ই শাওয়াল পর্যন্ত

অন্যান্য বিভাগসমূহ

নূরানী বিভাগ, হিফজ বিভাগ
ইবতিদাইয়্যাহ থেকে
দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত
কিতাব বিভাগ

বিভাগসমূহ

- ইফতা বিভাগ (১ বছর মেয়াদী)
- তাফসীর বিভাগ (১ বছর মেয়াদী)
- মাদানী নেসাব পৃথক ব্যবস্থাপনায় মাদানী নেসাব : ১ম বর্ষ, ২য় বর্ষ

পৃষ্ঠপোষকতায় : হযরত মাওলানা ইউসুফ তাওলুবী, দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত
প্রতিবছর হযরত এখানে দাওরায়ে হাদীসে বাবুল ওহী এবং ইফতায় আদ্দুররুল মুখতারের মুকাদ্দিমার দরস প্রদান করে থাকেন।

যোগাযোগ : হাজীবাড়ী, মূলপাড়া, পাঁচদোনা, নরসিংদী
মোবাইল : ০১৭৬৬ ৭৫ ৬৬ ৬২, ০১৯১৫ ৩৪ ০০ ০১

সালামান্তে
মুফতী আবু হুরায়রা কাসেমী, মুহতামিম

যাতায়াত : ঢাকা থেকে নরসিংদী রোডে পাঁচদোনা মোড় নেমে সিএনজি যোগে হাজীবাড়ী মাদরাসা

Scanned by CamScanner

হতাশা মুমিনের চরিত্র নয়

মাওলানা শিব্বীর আহমদ

দুনিয়ার এ জীবনে বিপদ আসেই। নানান সময় নানান দিক থেকে বিপদ এসে হামলে পড়ে আমাদের ওপর। অর্থসম্পদ সন্তানাদি সম্মান-মর্যাদা– আক্রান্ত হয় সবকিছুই। দুনিয়ার জীবনে এ বিপদের মুখে পড়ার কথা অবশ্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সুস্পষ্টভাবেই জানিয়ে দেয়া হয়েছে–

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব সামান্য ভয় ও ক্ষুধা এবং জান-মাল ও ফসলের কিছুটা ক্ষতি দিয়ে; আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও– যাদের ওপর কোনো মসিবত এলে বলে, 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন'– নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর আর অবশ্যই আমরা তাঁর কাছেই ফিরে যাব। –সূরা বাকারা (২) : ১৫৫-১৫৬

বোঝা গেল, বিপদ আসবেই। বিপদের মুহূর্তে কী করতে হবে সেই নির্দেশনাও দেয়া আছে এ আয়াতে। কিন্তু বিপদ যখন কিছুটা দীর্ঘস্থায়ী হয়, তা কেটে যাওয়ার মতো কোনো স্বাভাবিক সম্ভাবনা যখন মানুষের সামনে থাকে না, তখন আঘাত হানে হতাশা। হতাশা তাকে আল্লাহর রহমতের কথা ভুলিয়ে দিতে চায়। আল্লাহর কুদরত থেকে তার দৃষ্টিকে সরিয়ে দিতে চায়। আল্লাহর সীমাহীন অনুগ্রহ এবং দয়াকে আড়াল করে দিতে চায়। অথচ পবিত্র কুরআনের ভাষ্য মতে– মুমিন কখনোই হতাশ হতে পারে না। কুরআনে বর্ণিত ঘটনা। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যখন বার্ধক্যে উপনীত, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একদল ফেরেশতা এসে তখন তাঁকে এক জ্ঞানী পুত্রের সুসংবাদ শোনাল। বিস্ময়ভরা কণ্ঠে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম জিজ্ঞেস করলেন– আমাকে তো বার্ধক্য পেয়ে বসেছে, এরপরও তোমরা আমাকে এ সুসংবাদ দিচ্ছ?! কীসের ভিত্তিতে তোমরা এ সুসংবাদ দিচ্ছ? ফেরেশতারা বলল, আমরা তো সত্য কথাই বলছি। আপনাকে সত্য সুসংবাদই দিচ্ছি। বার্ধক্য আপনাকে স্পর্শ করেছে করুক, এ বৃদ্ধ বয়সেই আপনার সন্তান হবে। আপনি নিরাশদের দলে যাবেন না। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাদের কথার জবাবে বললেন, পথভ্রষ্টরা ছাড়া আর কে আপন প্রতিপালকের রহমত থেকে নিরাশ হতে পারে? (সূরা হিজর, ৫৩-৫৬ নং আয়াত দ্রষ্টব্য)

আরেকজন নবীর আরেকটি ঘটনা। হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের সর্বাধিক প্রিয় সন্তান ছিলেন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম। কিন্তু তাঁর ভাইয়েরা বাবার এই আদরকে সহজে মেনে নিতে পারেনি, তাই কৌশলে তাঁকে একদিন বাবার কাছ থেকে নিয়ে গিয়ে কূপে ফেলে দিল। আল্লাহর অসীম কুদরতে কূপ থেকে উঠে এসে একদিন তিনি মিশরের ধনভাণ্ডারের দায়িত্বশীল হলেন। আর যে ভাইয়েরা তাঁকে নিয়ে চক্রান্ত করেছিল, দুর্ভিক্ষের শিকার হয়ে তারা খাবার আনতে হাজির হলো তাঁর কাছে। এরপর এক কৌশলে তিনি তাঁর সহোদর বিনইয়ামীনকে নিজের সঙ্গে রেখে দিলেন। দুই ছেলে হারিয়ে বাবা হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম অন্য ছেলেদের বললেন, (তরজমা) 'হে আমার ছেলেরা! তোমরা যাও, ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সন্ধান করো। তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চিত জেনো, আল্লাহর রহমত থেকে তো কাফের ছাড়া অন্য কেউ নিরাশ হতে পারে না।' –সূরা ইউসুফ (১২) : ৮৭

এ দুই নবীর শেষ কথা– এক আল্লাহকে যারা বিশ্বাস করে, যারা মুমিন, যারা সঠিক পথের অনুসারী, তারা তো কিছুতেই আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হতে পারে না। তাঁরা উভয়েই ছিলেন পার্থিব বিপদের শিকার। একজন সন্তানহীন অবস্থায় পুরো জীবন কাটিয়ে বার্ধক্যে পৌঁছে গেছেন, আরেকজন এক সন্তানের শোকেই যখন পাথর হওয়ার অবস্থা, তখন হারালেন আরেক সন্তান! তবুও তাঁরা আল্লাহর অসীম কুদরতের কাছে আশাবাদী ছিলেন। হতাশা তাদের স্পর্শ করতে পারেনি। পরিশেষে তাঁরা উভয়েই এই পৃথিবীতে থেকেই এর ফল ভোগ করে গেছেন।

মুমিনের শান এমনই হওয়া উচিত। যতকাল বেঁচে থাকবে, আল্লাহর রহমতের কাছে আশাবাদী হয়েই সে বেঁচে থাকবে। সাধ্যে যতটুকু কুলায়, চেষ্টা করে যাবে। একবারের চেষ্টা ব্যর্থ হলে আবার করবে। বারবার করবে। কবি যেমনটি বলেছেন : 'পারিব না এ কথাটি বলিও না আর/ একবার না পারিলে দেখ শতবার।'

হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম দুই সন্তান হারিয়ে চরম সংকটের মুহূর্তেও ছেলেদের বলছেন– তোমরা গিয়ে ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সন্ধান করো! অর্থাৎ তিনি নিজেও আশাবাদী, আশা পোষণ করছেন। অন্যদের মনেও আশার সঞ্চার করতে চাচ্ছেন।

বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছেন, 'হাবরু হাযিহিল উম্মাহ'–এই উম্মতের বিদ্বান ব্যক্তি। তিনি বলেছেন, 'সবচেয়ে বড় কবিরা গোনাহ হচ্ছে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে শিরক করা, আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে যাওয়া আর আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে পড়া। –মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, হাদীস ১৯৭০১

বিপদে পড়লে মানুষ যে কীভাবে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে এর কিছু বর্ণনা পবিত্র কুরআনেও আছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا.

আমি মানুষকে যখন কোনো নিআমত দিই তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও পাশ কাটিয়ে যায়। আর যদি কোনো অনিষ্ট তাকে স্পর্শ করে তাহলে সে সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে পড়ে! –সূরা বনী ইসরাঈল (১৭) : ৮৩

নানা কারণেই মানুষ হতাশায় আক্রান্ত হতে পারে। বিপদে যদি কেউ ধৈর্যধারণ করতে না পারে তখন দেখা যায়– সামান্য সংকটেই সে ভেঙ্গে পড়ে। কখনো হতাশাগ্রস্তদের সঙ্গও আরেকজনকে হতাশ করে দেয়। আরবীতে প্রবাদ আছে–المرأ على دين خليله অর্থাৎ মানুষ তার বন্ধুর আদর্শই গ্রহণ করে থাকে। এটাই স্বাভাবিকতা। তাই কেউ যদি হতাশাগ্রস্তদের সঙ্গে ওঠাবসা করে, তাহলে এই হতাশায় একসময় সেও আক্রান্ত হবেই। কখনো আবার প্রত্যাশার পাহাড়ও মানুষকে হতাশ করে। নিজের জীবন নিয়ে কিংবা জীবনের কোনো দিক নিয়ে যখন কেউ নিজ সামর্থ্যের বিবেচনা না করে অনেক উঁচু স্বপ্ন দেখতে থাকে, এর পরিণতিতেও সে হতাশাগ্রস্ত হতে পারে। একের পর এক যখন আশাভঙ্গ হতে থাকে, তখন হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে সে। আবার এমনও হয়– আকস্মিক কোনো বিপদ কাউকে এতটাই ঝাঁকুনি দেয়, যার ফলে সে আর মাথা সোজা করে সামনে এগিয়ে চলার হিম্মত করতে পারে না। পরিণামে কেবলই হতাশা।

Scanned by CamScanner

হতাশা যে কেবল পার্থিব বিষয়াদিকেই আক্রান্ত করে এমন নয়, দ্বীনী ও পরকালীন বিষয়েও মানুষ হতাশাগ্রস্ত হয়। কারও যখন পাপের পরিমাণ বেশি থাকে, সারাদিন যখন কেউ বড় বড় পাপে ডুবে থাকে, যখন নিজেও পাপ করে, অন্যকেও পাপের দিকে ডাকে, মোটকথা, দিনের পর দিন মাসের পর মাস ধরে কেউ যখন কেবলই পাপই করে চলে, এমতাবস্থায় কেউ যদি দয়াময় প্রভুকে স্মরণ করতে চায়, তখন একরাশ হতাশা তাকে ঘিরে ধরতে পারে– আমার যে এত এত পাপ, আমারও কি এখান থেকে মুক্তি সম্ভব? গোনাহের পঙ্কিলতা থেকে পরিচ্ছন্ন হওয়ার সম্ভাবনা যতটুকু থাকে, তাও এ হতাশার আঘাতে শেষ হয়ে যায়। আবার এমন গোনাহগার কাউকে দেখে দ্বীনদার লোকেরাও অনেক সময় হতাশ হয়ে পড়ে– একে মনে হয় আর ভালো পথে আনা যাবে না! কথা কি, এ উভয় হতাশাই আল্লাহ তাআলার রহমত সম্পর্কে অজ্ঞতার ফল। আল্লাহর রহমত যখন ভাগ্যে জুটে, তখন তো ইসলামের চরম দুশমনও মুহূর্তের ব্যবধানে অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হয়। একটি উদাহরণ দিই।

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রা.। তাঁর ইসলামগ্রহণের কাহিনী আমরা অনেকেই জানি– যখন নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতি কার্যক্রমকে কিছুতেই কাফের কুরাইশরা প্রতিহত করতে পারছিল না, আবার আরবের কঠিন গোত্রপ্রীতির কারণে কেউ তাঁকে হত্যা করার মতো সাহসও করছিল না, তখন এক মজলিসে ঘোষিত হল পুরস্কার। নবী মুহাম্মাদকে হত্যার পুরস্কার। বীর সাহসী তো সেখানে কতজনই ছিল। কিন্তু এক উমর ছাড়া কেউ সেদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। তিনি খোলা তরবারি নিয়ে ছুটলেন নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার লক্ষ্যে। কিন্তু আল্লাহ তাআলার রহমত ও কুদরত দেখুন। কাফেরদের পুরো সমাজ মিলে যে কাজটি করার হিম্মত করতে পারেনি, একা উমর তা সম্পন্ন করার দুঃসাহস দেখাতে বেরিয়ে পড়ল। তাও কেমন অপরাধ– ইসলামের নবীকে সরাসরি হত্যা! উমরের এ মিশন সফল হলে তো ইসলাম এখানেই শেষ! এমন জঘন্য ও গুরুতর এক অপরাধের দিকে ছুটে চলা উমর পথিমধ্যে আল্লাহ তাআলার রহমতের বর্ষণে এতটাই সিক্ত হলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গেলেন। এখানেই কি শেষ! তিনি ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুনিয়াতেই সুনির্দিষ্টভাবে যে দশজন সাহাবীকে জান্নাতী বলে ঘোষণা করেছেন, যাদেরকে আমরা 'আশারায়ে মুবাশশারা' বলে স্মরণ করি, তিনি তাঁদের দ্বিতীয়জন।

আমাদের ইসলামী ইতিহাসের পরতে পরতে এমন অনেক বরেণ্য মনীষীর দেখা মিলবে, যারা শুরুর জীবনে নানামুখী পাপে ডুবে ছিলেন। পরবর্তী জীবনে তারা এতটাই বড় হয়েছেন, এখনো আমরা তাদেরকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। ফুযায়ল ইবনে ইয়ায, মালিক ইবনে দিনারের মতো নামের এখানে অভাবে নেই। তাজা উদাহরণ দিই। সারা বিশ্বের মুসলমানদের শোকের সাগরে ভাসিয়ে এ দুনিয়া থেকে আকস্মিকভাবে বিদায় নিলেন পাকিস্তানের সঙ্গীতশিল্পী জুনায়েদ জামশেদ। শুরুর জীবনে ছিলেন পপতারকা। সেই জগতে তিনি ছিলেন যারপরনাই সফল। বিশ্বজোড়া তার খ্যাতি। জগতটা যে কতটা নোংরা– তা কি বলার অপেক্ষা রাখে! অথচ সেখান থেকে তিনি উঠে এলেন এমন উচ্চতায়, বিশ্বজুড়ে দ্বীনদার মুসলমানদের কাছে তিনি হয়ে উঠলেন একজন প্রিয় মানুষ। আর তাবলীগ জামাতের বিশ্বব্যাপী মেহনতের বদৌলতে বর্তমান পৃথিবীর আনাচেকানাচে এমন কত জুনায়েদ জামশেদ ছড়িয়ে আছে– কে জানে? গায়ক হয়ে উঠছেন ধর্মপ্রাণ মুসলমান। সন্ত্রাসী-ডাকাত, ইসলামের দুশমন, অমুসলিম ধর্মগুরু, মন্দির-গীর্জার প্রধান ব্যক্তি উঠে আসছেন ইসলামের আলোকিত সীমানায়। এই বাস্তবতাকে সামনে রেখে কি দ্বীন-ধর্ম আর পরকাল নিয়ে হতাশ হওয়ার কোনো সুযোগ আছে? আল্লাহ তাআলার কী দ্ব্যর্থহীন আহ্বান–

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ، اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا، اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

বলো, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ, তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল গোনাহ ক্ষমা করে দেন। সন্দেহ নেই, তিনিই ক্ষমাশীল দয়ালু। –সূরা যুমার (৩৯) : ৫৩

একই কথা পার্থিব সংকট নিয়েও। এখানকার কোনো সংকটই স্থায়ী নয়। দুনিয়াই যেখানে ক্ষণস্থায়ী, সেখানে এসব সংকট স্থায়ী হবে কীভাবে? পবিত্র কুরআনের একটি ছোট সূরা 'সূরা আলাম নাশরাহ'। এ সূরায় আল্লাহ তাআলার ওয়াদা–

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.

কষ্টের সঙ্গেই তো স্বস্তি আছে। অবশ্যই কষ্টের সঙ্গেই স্বস্তি আছে। –সূরা আলাম নাশরাহ (৯৪) : ৫-৬

আল্লাহ তাআলার এ ওয়াদা সর্বকালের জন্যেই সত্য। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাকের একটি বৈশিষ্ট্য এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْاَرْضِ، ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ، قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ.

বরং তিনি, যিনি অসহায়ের আহ্বানে সাড়া দেন, যখন সে তাঁকে ডাকে এবং তিনি বিপদাপদ দূর করে দেন আর পৃথিবীতে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করেন। আল্লাহর সঙ্গে কি অন্য কোনো মাবুদ আছে? তোমরা খুব সামান্যই উপদেশ গ্রহণ কর। –সূরা নাম্‌ল (২৭) : ৬২

তাই হতাশ নয়; মুমিন হবে আশাবাদী। আল্লাহর রহমতের আশায় থাকবে সে; নিরেট পার্থিব বিষয় নিয়েও, দ্বীনী ও পরকালীন বিষয়েও। সর্বশক্তিমান দয়ালু আল্লাহর গুণবাচক নামগুলোর প্রতি যার বিশ্বাস থাকবে অটুট, তার অবশ্য হতাশ হওয়ার সুযোগ কোথায়! এ বিশ্বাস হতাশাকে দূর করবেই। ●

উলামা-তুলাবা ও দ্বীনদার ব্যক্তিবর্গের জন্য সু-খবর !!!
'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অনুমোদিত'
ঢাকা হলি সার্ভে ট্রেনিং সেন্টার এর অধীনে
বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ এর তত্ত্বাবধানে
ভূমি জরীপ ও ডিজিটাল সার্ভে প্রশিক্ষণ
প্রশিক্ষণ : ৯ দিন
আবাসিক ব্যবস্থাপনায়
প্রশিক্ষণ শুরু
৭ মে ২০১৮ই থেকে
১৫ মে পর্যন্ত
প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন
মুফতী মুহা. উসমান গনী
মুহাদ্দিস: জামি'আ দ্বীনিয়া ইসলামিয়া কল্যাণপুর, ঢাকা
চেয়ারম্যান: 'ঢাকা হলি সার্ভে ট্রেনিং সেন্টার' বাংলাদেশ
লেখক: ভূমি জরীপ শিখার সহজ উপায়
প্রধান পরিচালক
সার্ভে ক্যাম্প, বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ।
প্রশিক্ষণ কেন্দ্র :
বেফাক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
ভাঙ্গাপ্রেস, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।
বি. দ্র.
যে কোনো মাদ্রাসায় ১৫/২০ জন ছাত্র এক সাথে পড়তে চাইলে প্রশিক্ষকের জন্য যোগাযোগ করুন
ভর্তি বিষয়ে জানতে: ০১৭৩৪-৩৩০ ৯৬৯

Scanned by CamScanner

নূরানী হিজবুল মু'আল্লিমীন বাংলাদেশ কর্তৃক পরিচালিত

কার্যালয়: নূরানী মাঞ্জিল, শান্তি ধারা, সাইনবোর্ড, ঢাকা।

তারিখ: ২৭ শাবান (১৩ মে) হতে ৩০ দিন

মু'আল্লিম প্রশিক্ষণ কোর্স

স্কুল কলেজ ভার্সিটির ছাত্রদের জন্য কুরআন ও দ্বীন শিক্ষা কোর্স

মু'আল্লিমাহ্ প্রশিক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে।

বিঃ দ্রঃ
কোর্স শেষে সনদ দেয়া হবে এবং খেদমতের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করা হবে ইনশাআল্লাহ্!

যোগাযোগ :-
০১৮২১-৪৩৭৮২৯
০১৮৬৩-৪৩৩২৭০

প্রশিক্ষণ দিবেন

জোরার সাহারা মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা
মাওঃ ক্বারী হোসাইন আহমাদ দা. বা.

বিশেষ দরস দিবেন

হাফেজ ক্বারী আব্দুল হক দা. বা.
হাফেজ ক্বারী নাজমুল হাসান দা. বা.
মাওলানা ক্বারী আনিসুর রহমান দা. বা.

মোবাইল : ০১৫৫৯৮-৭৯৫৪৪০৩

স্থান:
জামিয়া হোসাইনিয়া শফিকুল উলুম, ঢাকা
অত্র মাদরাসায় নূরানী, হিফজ, মাদানি নেসাবে (১ম ও ২য় বর্ষ) ভর্তি চলিতেছে

যাতায়াত
যাত্রাবাড়ী অথবা কাঁচপুর হতে সান্দাম মার্কেট নেমে ৮০ গজ দক্ষিনে

সার্বক্ষণিক নেগরানিতে :
ক্বারী মাহমুদুল হাসান বিন হুসাইন আহমাদ

Sponsor : deskshopbd.com

উম্মুল ক্বোরা মাদরাসা

মোহাম্মদবাগ, কদমতলী, ঢাকা।

ভর্তি শুরু
৭ই শাওয়াল

বিভাগসমূহ

নূরানী বিভাগ, হিফজ বিভাগ
১ম - ৫ম বর্ষ (মাদানী নেসাব)
কিসমুল লুগাহ আল আরাবিয়্যাহ

মুশরিফঃ মাও. নাজমুল হুদা
ফাযেল: জামিয়া উম্মুল ক্বোরা, মক্কা মোকাররমা।

যাতায়াত
যাত্রাবাড়ী/ চিটাগাং রোড থেকে রায়েরবাগ নেমে সি.এন.জি যোগে মোহাম্মদবাগ চৌরাস্তা।

পরিচালনায়:
মাও. নাজমুল হুদা
(মুদীর) ০১৮১৯-৪১৯৫৩০
০১৬৩৮-৫১০২১৬

বাংলাদেশ নূরানী তা'লীমুল কুরআন

প্রতিষ্ঠাতা, রঈসুল মু'আল্লিমীন মাওলানা রহমতুল্লাহ্ সাহেব দা.বা.

প্রশিক্ষণ শেষে খেদমতের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করা হয়।

তাদরীব শেষে সনদ দেওয়া হয়।

কেন্দ্রীয় নূরানী
মু'আল্লিম
ট্রেনিং-২০১৮

২৫শে শা'বান হতে প্রাক্টিক্যালসহ ৩০ দিন
স্থান : জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া সাত মসজিদ মুহাম্মদপুর, ঢাকা
কেন্দ্রীয় কার্যালয় : ১লা রমযান হতে প্রাক্টিক্যালসহ ২৭ দিন
কেন্দ্রীয় কার্যালয় : ২২ শে জুন (৭ শাওয়াল) হতে প্রাক্টিক্যালসহ ৩০ দিন
ভর্তি ও থাকা-খাওয়াসহ মাত্র ৩৫০০/- টাকা

শীঘ্রই শুরু হচ্ছে!

ভর্তি শুরু ১লা রমযান থেকে...

ঢাকাতে এই প্রথম ১ বছরে নূরানী কোর্স

নূরানী তা'লীমুল কুরআন কেন্দ্রীয় মাদরাসা

হযরত মাওলানা রহমতুল্লাহ সাহেব দা.বা. এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত

বাংলাদেশ নূরানী তা'লীমুল কুরআন
কেন্দ্রীয় কার্যালয় : বাড়ি # ২৪/১, রোড # ২ দক্ষিণ, ব্লক- বি, ঢাকা উদ্যান, মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
মোবাইল: ০১৮২০-৫৭০০৫০, ০১৭১১-২০৭৪৯০, ০১৭১১-২৭৯৩৫৩

Scanned by CamScanner

সু খবর! সু খবর! সু খবর!

কুদূরীর মতনের সাথে হাশিয়া আকারে ৬০০ টাকার আল লুবাবসহ মাত্র ৩০০ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে

দ্বিতীয় সংস্করণে আমাদের কাজ

কম্পিউটার কম্পোজকৃত, ফিকহে হানাফীর সুপ্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য কিতাব মুখতাসারুল কুদূরীর এক বিশুদ্ধও সুন্দরতম নুসখা-এর সাথে আললুবাব শরাহটি ফ্রি পাওয়া যাচ্ছে। নুসখাটিতে আমাদের উল্লেখযোগ্য কাজ :

১ বিভিন্ন সহীহ নুসখার সাথে মিলিয়ে মতনকে সকল প্রকার মুদ্রণত্রুটি থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং ছুটে যাওয়া মতনকে সংযুক্ত করা হয়েছে।
২ ইমলা ও খতের নিয়ম রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়েছে।
৩ একই বিষয়ের মাসয়ালাগুলোকে প্যারাবদ্ধভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।
৪ সহজে মাসয়ালা আয়ত্ব করার লক্ষ্যে প্রত্যেক প্যারার শুরুতে শিরোণাম যুক্ত করা হয়েছে।
৬ মুফতাবিহী কওলসমূহকে দাগ দিয়ে চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে। প্রত্যেক পৃষ্ঠায় মতন ও হাশিয়ার মাঝে মিল রাখা হয়েছে ফলে এক পৃষ্ঠার হাশিয়া অন্য পৃষ্ঠায় যায়নি।
৭ উলেখ্য, এর হাশিয়াতে যুক্ত করা হয়েছে কুদুরির সবচেয়ে উপকারী শরাহ 'আললুবাব'।

প্রাপ্তিস্থান

মাকতাবাতুল আযহারের সকল শাখা || আল মাকতাবাতুল বোরহানিয়া ৫৫/১, উত্তর যাত্রাবাড়ী জামি'আ আবু বকর সিদ্দিক রাঃ ঢাকা-১২০৪। মোবা:০১৭১২৫৫৬৪১৮,০১৯১৭৬৯০৫৫

জামি'আ আবু বকর সিদ্দীক (রা.)

৫৫/১, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪।

বিভাগসমূহ:

আদব বিভাগ- ১ বছর * ইফতা বিভাগ- ১বছর।
কিতাব বিভাগ- ১ম বর্ষ থেকে ৭ম বর্ষ (দাওরা) পর্যন্ত

বিশেষ আকর্ষণ

শরহে বেকায়া থেকে দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত প্রত্যেক জামাতে ৫জন করে মেধাবী ছাত্র নেয়া হবে। ভর্তি পরীক্ষায় ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীদের জন্য থাকা-খাওয়া বাবদ কোনো প্রদেয় নেই।

ইফতা বিভাগ মেয়াদকাল ১ বছর

কোর্সসমূহ:

নাহু-সরফ ও আরবী ভাষা প্রশিক্ষণ কোর্স : রোজার ৫দিন পূর্ব হতে ৩০ দিন
পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষ্যে ৩০ দিন দরসে তাফসীরুল কুরআন
দরস শুরু : রোজার ৫ দিন পূর্ব হতে ৩০দিন।

দরস প্রদান করবেন

হযরত মাওলানা মুফতী বোরহান উদ্দিন রাব্বানী।
তথ্যের জন্য যোগাযোগ
০১৭১২-৫৫৬৪১৮, ০১৯১৭-৬৯৭০৫৫

কুতুবখালী মহিলা মাদরাসা

নূরানী ট্রেনিং সেন্টার

নূরানী মুআল্লিমা ট্রেনিংসমূহ ২০১৮

১মে(শবে বরাত), ১জুলাই, ১সেপ্টেম্বর, ১নভেম্বর

প্রতি ব্যাচে পূর্বের মাসের ২০ তারিখের আগে ভর্তি হলে খরচ ২০% কম

যোগ্যতাসম্পন্ন মুআল্লিমাদের খেদমতের ব্যবস্থা হবে ইনশাআল্লাহ

বিভাগ সমূহ

❖বয়স্কা মহিলা ও শিশুদের নূরানী❖স্কুল (প্লে-৭ম)
❖হিফযুল কুরআন ❖কিতাব বিভাগ

নিয়োগ

স্কুল, নুরানী, হিফয ও কিতাব বিভাগের জন্য ৪/৫ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিক্ষিকা আবশ্যক।
কম্পিউটার (আরবী) জানা থাকলে অগ্রাধিকার

নাহবেমীর ও মীযান জামাতে ভর্তিচ্ছু ছাত্রীদের সুবর্ণ সুযোগ!
ইবতেদায়ী মারহালায় বেফাক বোর্ডে মেধা তালিকায় স্থানপ্রাপ্ত ছাত্রীদের থাকা-খাওয়া সম্পূর্ণ ফ্রী

অন্যান্য বিভাগেও গরীব ও মেধাবীদের বিশেষ ছাড় রয়েছে।

২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি চলিতেছে!
৩০ রমযান পর্যন্ত ভর্তি ফি ৬০% কম।

২০২, দক্ষিণ কুতুবখালী, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা। (যাত্রাবাড়ী বড় মাদরাসার সামনে)
01675024838, 01920789594 (Bkas-p 6-Roc-p)

Scanned by CamScanner

বহু আকাবিরের সোহবতধন্য

মাওলানা আলী আহমাদ রাহ.

মাওলানা যাকারিয়া বিন আব্দুল ওয়াহহাব

[মাওলানা আলী আহমাদ ছাহেব রাহ. আমার দাদাশ্বশুর, সে সুবাদে বিভিন্ন সময় তাঁর কাছে যাওয়ার সুযোগ হত। তিনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন। শারীরিক বিভিন্ন অসুস্থতা সত্ত্বেও সর্বদা তাঁকে যিকির ও কুরআন তিলাওয়াতে মশগুল থাকতে দেখতাম। তিনি বড় দরদ ও আবেগ নিয়ে দারুল উলূম দেওবন্দ ও আকাবিরে দেওবন্দের বিভিন্ন হেকায়েত ও হালাতের তাযকেরা করতেন। যার বেশ কিছু অংশ আমার মুসাজ্জিলায় সংরক্ষিত আছে। -যাকারিয়া আবদুল ওয়াহহাব]

মাওলানা আলী আহমাদ ছাহেব, যিনি তাঁর সকল কর্মক্ষেত্রে 'লাকসামের হুযূর' নামে পরিচিত। প্রবীণ এই ব্যক্তিত্ব মাওলানা ইবরাহীম বলিয়াভী রাহ., শায়খুল ইসলাম মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী রাহ., মাওলানা যফর আহমাদ উসমানী রাহ., কারী তৈয়্যব রাহ., মুফতী আমীমুল ইহসান রাহ., টুমচরের বড় হুযূর মাওলানা আশরাফ আলী ছাহেব রাহ., হাফেজ্জী হুযূর রাহ. ও হযরতজী ইউসুফ রাহ. প্রমুখ আকাবিরের সোহবত লাভ করেছেন। তাঁদের স্মৃতিচারণে তিনি আবেগাপ্লুত হতেন এবং তার দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ত।

জন্ম ও প্রাথমিক শিক্ষা

তিনি ১১ বৈশাখ, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ (আনুমানিক ২৪ এপ্রিল, ১৯২৭ ঈসাব্দ) রবিবার, রাত প্রায় ১১ টার সময় কুমিল্লা জেলাধীন সদর দক্ষিণ থানার (জালগাঁও রোডে) খিলপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মাওলানা আলী আহমাদ ছাহেব বলেন, 'জন্ম-তথ্যটি আমার চাচা লিখে রেখেছিলেন।'

তিনি ১৯৩৭ ঈসাব্দের জানুয়ারি মাসে ৯ বছর বয়সে স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখানে পড়াশুনার পাশাপাশি একজন কারী ছাহেবের নিকট মক্তবে সকালে কুরআন মাজীদ পড়তেন। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে ১৯৪২ ঈসাব্দে কুমিল্লা জেলাধীন লাকসাম থানায় অবস্থিত যুক্তিখোলা সিনিয়র মাদরাসায় ভর্তি হন। সেখানে তিনি হাফতুম জামাত (বর্তমান অষ্টম শ্রেণি) পর্যন্ত পড়ালেখা করেন।

১৯৪৪ ঈসাব্দের জানুয়ারি মাসে লক্ষ্মীপুরস্থ টুমচর মাদরাসায় চার বছর পাঞ্জুম জামাত পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। পাঞ্জুম জামাতে (বর্তমান দাখিল শ্রেণি) তিনি নোয়াখালী জমিয়তের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে বৃত্তি লাভ করেন।[১] মাওলানা আলী আহমাদ ছাহেব টুমচর মাদরাসা ও এলাকার প্রতি অনেক বেশি দুর্বল ছিলেন। ছাত্রজামানা, শিক্ষকতা ও মাদরাসা-পরিচালনার সময়কাল মিলিয়ে জীবনের প্রায় ষাট বছর তিনি সেখানে কাটিয়েছেন। বৃদ্ধ বয়সেও সেখানে গেলে শারীরিক ও মানসিকভাবে অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন।

টুমচর মাদরাসা সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে মাওলানা আলী আহমাদ ছাহেব বলেন, ১৯২১ ঈসাব্দে মাওলানা সাআদুল্লাহ নামে এক ব্যক্তি টুমচর মাদরাসার সূচনা করেন। তখন এটি প্রাথমিক পর্যায়ের মাদরাসা ছিল। বড় হুযূর মাওলানা আশরাফ আলী রাহ.-এর আগমনের পরে এটা দ্রুত উন্নতি লাভ করে। তিনি ছারছীনার পীর মাওলানা নেছারুদ্দীন আহমাদ ছাহেবের খলীফা ছিলেন। কিন্তু পীর-মুরীদির কাজ করতেন না। তাঁর একজন মুরীদও ছিল না। তিনি মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রাহ.-এর কিতাবসমূহ প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ ও মুতালাআ করতেন এবং থানভী রাহ.-এর ইলমী তাহকীকের প্রতি তাঁর গভীর আস্থা ছিল।

তিনি বলেন, আমি ছোটবেলায় সেখানে ভর্তি হই। বড় হুযূর রাহ. ছিলেন ছাত্র-গড়ার প্রতি মনোযোগী একজন যোগ্য শিক্ষক। সবসময় এ ভাবনায় থাকতেন, কীভাবে ছাত্রদের যোগ্য করে গড়ে তোলা যাবে। রাতের বেলায়ও ছাত্রদের খোঁজখবর নিতেন, ছাত্ররা পড়াশুনা করছে কি না তদারকি করতেন। কখনো কোথাও দাওয়াতে গেলে সাথে একজন ছাত্র নিয়ে যেতেন। তাকে আগে থেকে বলে রাখতেন, তুমি অমুক কিতাবের যে পর্যন্ত পড়েছ, তা দেখে নিও। সারা পথে এই কিতাবের খুঁটিনাটি সকল বিষয় তাকে জিজ্ঞাসা করতেন। যাতে উক্ত কিতাব পথেই অনেকটা আত্মস্থ হয়ে যায়। তিনি মাদরাসার কুতুবখানায় থাকতেন। যখন গোসলের জন্য পুকুরে যেতেন, লুঙ্গি-গামছা ইত্যাদি সাথে নিয়ে একজন ছাত্র থাকত। যাওয়ার পথে মাদরাসার ছাত্রদের নেগরানীর পাশাপাশি উক্ত ছাত্রকে বিভিন্ন সীগাহ, মাসদার, গর্দান অর্থাৎ নাহু সরফ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করতেন।

তিনি সবসময় মাদরাসায় থাকতেন। বাড়ি মাদরাসার নিকটেই ছিল। শুধু আসরের সময় বাড়ি যেতেন। মাগরিবের পরে আবার চলে আসতেন।

মাওলানা আলী আহমাদ ছাহেব বলেন, বড় হুযূর রাহ. খুব ধীরস্থিরভাবে সবক পড়াতেন। কোনো মুদাররিস দরসে আসতে দেরি করলে খুব অসন্তুষ্ট হতেন। ছাত্রদের প্রতি নির্দেশনা ছিল, উস্তায আসতে দশ মিনিট দেরি হলে তাঁকে যেন জানানো হয়। কখনো এমন হয়েছে যে, বড় হুযূর রাহ. জ্বরের কারণে লেপ গায়ে দিয়ে শুয়ে আছেন; কোনো ছাত্র এসে বলল, আমাদের শিক্ষক এখনো আসেননি। জ্বর নিয়েই তিনি তখন লেপ গায়ে দিয়ে দরসে চলে যেতেন; যেন কোনো ঘণ্টা খালি না থাকে। টুমচর মাদরাসার বৈশিষ্ট্য ছিল; যেদিন মাদরাসা বন্ধ হবে সেদিনও বিকাল চারটা পর্যন্ত ক্লাস চলত এবং খোলার তারিখ ১ম ঘণ্টায় খুব গুরুত্বের সাথে ছবক হত। সকল ছাত্র-শিক্ষকের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক ছিল। কেউ অনুপস্থিত থাকতে পারত না।

উচ্চশিক্ষা

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারিতে তিনি নোয়াখালী ইসলামিয়া আলিয়া মাদরাসায় চাহারুম জামাতে (বর্তমান আলিম জামাত) ভর্তি হন। সেখানে মোট চার বছর পড়ালেখা করেন।

মাওলানা আলী আহমাদ ছাহেব বলেন, সে বছর রমযান মাসে আমি মোমিনবাড়ীতে কারী ইবরাহীম ছাহেব রাহ.-এর নিকট কেরাত পড়ি। কারী ইবরাহীম ছাহেব সাহারানপুর মাদরাসা থেকে ফারেগ, তিনি বহুত বড় মুহাক্কিক কারী ছিলেন।

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারি মাসে ঢাকা আলিয়া মাদরাসায় কামিল (ফিকহ বিভাগে) ভর্তি হয়ে ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে পড়াশুনা সম্পন্ন করেন। ঢাকা আলিয়া মাদরাসায় থাকাকালীন দুই বছর মাওলানা যফর আহমাদ উসমানী রাহ.-এর নিকট বুখারী ১ম খণ্ড ও মুফতী আমীমুল ইহসান ছাহেবের নিকট বুখারী ২য় খণ্ড পড়েন।[২]

হাফেজ্জী হুযূর রাহ.-এর সাথে ইসলাহী সম্পর্ক

মাওলানা আলী আহমাদ ছাহেব বলেন,

১. মাওলানা আলী আহমাদ ছাহেব বলেন, সে সময়ে দাখিল, আলিম ইত্যাদি শব্দের প্রচলন ছিল না।

Scanned by CamScanner

'হাফেজ্জী হুযূর রাহ.-এর সাথে আমার ইসলাহী সম্পর্ক ছিল। আমার বিভিন্ন অবস্থা জানিয়ে হযরতকে চিঠি লিখতাম; তিনি উত্তর দিতেন। চৈত্র-বৈশাখ মাসে গরমের সময়ে যখন দিন বড় হত তখন ঢাকা আলিয়া মাদরাসা ছুটি হলে আমি লালবাগ শাহী মসজিদে গিয়ে আসরের নামায পড়তাম এবং হাফেজ্জী হুযূরের মজলিসে বসতাম।

দারুল উলূম দেওবন্দ গমন

মাদরাসায়ে আলিয়া ঢাকা হতে পড়াশুনা শেষ করার পর তিনি দারুল উলূম দেওবন্দ যাওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু ভিসা না হওয়ায় হাফেজ্জী হুযূর রাহ. তাঁকে বর্তমান লক্ষ্মীপুর জেলার রামগঞ্জ থানাধীন ফতেহপুর আলিয়া মাদরাসায় যোগদান করার পরামর্শ দেন। তখন হাফেজ্জী হুযূর রাহ.-এর সাথে সদরঘাট হতে লঞ্চযোগে চাঁদপুর যান। সেখানে হাফেজ্জী হুযূর রাহ.-এর সাথে তাঁর এক ঘনিষ্ঠজনের বাড়িতে কয়েক দিন অবস্থান করেন। সেখান থেকে একই নৌকায় রায়পুরে আসেন। এ সময় তিনি প্রায় দশ দিন খুব কাছ থেকে হাফেজ্জী হুযূরের সোহবত লাভ করেন। তারপর তিনি ফতেহপুর মাদরাসায় যোগদান করেন। সেখানে থাকাকালীন হাফেজ্জী হুযূর রাহ. যতদিন বাড়িতে থাকতেন ততদিন নিয়মিত হাফেজ্জী হুযূর রাহ.-এর মজলিসে আসতেন।

ইতিমধ্যে তিনি দেওবন্দ যাওয়ার ভিসা পেয়ে যান এবং শাবান মাস পর্যন্ত ফতেহপুর মাদরাসায় পড়িয়ে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে দেওবন্দ মাদরাসায় ফুনূনাতে ভর্তি হন। সেখানে তিনি আল্লামা ইবরাহীম বলয়াভী রাহ., কারী তৈয়্যব ছাহেব ও শায়খুল ইসলাম মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী রাহ. প্রমুখের নিকট পড়েন। মাওলানা আলী আহমাদ ছাহেব বলেন, আমি দেওবন্দে আল্লামা ইবরাহীম বলয়াভী রাহ.-এর নিকট শরহে আকায়েদের হাশিয়া-'খেয়ালী' পড়ি। আর মুহতামিম কারী তৈয়ব ছাহেবের নিকট পড়ি 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ'। তিনি মাগরিবের পরে কিতাবটি পড়াতেন। কারী তৈয়্যব ছাহেব রাহ.-এর বাসায় রাত্রে অনেক মজলিস হত, সেখানেও শরীক হতাম। আমি ভাবতাম, এসেছি মাত্র এক বছরের জন্য! যত বেশি ফায়েদা হাসিল করা যায়। শায়খুল ইসলাম মাদানী রাহ.-এর খানকার ইসলাহী মজলিসে শরীক হতাম। খানকার পাশে মসজিদ ছিল, অনেক সময় সেখানে নামায পড়েছি। বি-বাড়ীয়ার মাওলানা নূরুল্লাহ ছাহেব রাহ. সেখানের ইমাম ছিলেন।

শায়খুল ইসলাম মাদানী রাহ.-এর দরস ও ব্যক্তিগত বিষয়ের স্মৃতিচারণ

মাওলানা আলী আহমাদ ছাহেব বলেন, মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী রাহ. সাধারণত দুপুর ১২টার দিকে বুখারী শরীফের একটি দরস দিতেন আর রাতে এশার পর ৯/১০টা থেকে ১২/১টা পর্যন্ত প্রায় দুই-তিন ঘণ্টা দরস দিতেন। এসময় মাঝে মাঝে ঘুম দূর করার জন্য ছাত্ররা মাদানী রাহ.-কে পরচা (চিরকুট) দিত। তিনি সে পরচাগুলো উচ্চ আওয়াজে পড়ে শোনাতেন। তাঁর দরসে শিক্ষণীয় অনেক মজার মজার কথা হত। মাদানী রাহ.-এর দরসে দারুল উলূম দেওবন্দের অনেক বড় বড় মুদাররিস শরীক হতেন।

মাওলানা আলী আহমাদ ছাহেব বলেন, মাদানী রাহ. ফুল খুব পছন্দ করতেন। কেউ হযরতের সামনে ফুল পেশ করলে খুব খুশি হতেন। মাদরাসার সামনে ফুলবাগান ছিল। ফুলবাগানের পরিচর্যার জন্য দু'জন অভিজ্ঞ মালি ছিল।

কর্মজীবন

দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে দেশে ফিরে তিনি বরিশালের ঝালকাঠিতে এক মাদরাসায় কিছুদিন খেদমত করেন। তারপর তাঁর উস্তায টুমচর মাদরাসার ছোট হুযূর মাওলানা আব্দুস সুবহান ছাহেব রাহ.-এর বিশেষ অনুরোধে টুমচর মাদরাসায় সিনিয়র শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। সেখানে ১৯৫৬ ঈসাব্দ হতে ১৯৬৯ ঈসাব্দ পর্যন্ত প্রায় ১৪ বছর ছিলেন।

টুমচর মাদরাসায় থাকাকালীন মাওলানা লুৎফর রহমান ছাহেব রাহ.-এর মাধ্যমে তিনি দাওয়াত ও তাবলীগের কাজের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত হন। ১৩৮৪ হিজরী মোতাবেক ১৯৬৫ ঈসাব্দে হযরতজী ইউসুফ ছাহেব রাহ. (মৃত্যু : ২৯ জিলক্বদ, ১৩৮৪ হি./২ এপ্রিল, ১৯৬৫ ঈ.) বাংলাদেশে আসেন। তখন নোয়াখালী ও চট্টগ্রামে সফরকালীন তিনি তাঁর সান্নিধ্য লাভ করেন। এ ছাড়াও তাবলীগের মুরব্বী মাওলানা আলী আকবর ছাহেব রাহ. (জন্ম : ১৯০৮ ঈ.-মৃত্যু ১৯৯৩ ঈ.), নোয়াখালীর মাওলানা মুনীর ছাহেব ও মাওলানা আব্দুল আযীয ছাহেব রাহ. প্রমুখের সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল।

পরবর্তী সময়ে তাঁদের অনুরোধে ১৯৬৯ ঈসাব্দে কুমিল্লার নূর মসজিদ (তাবলীগের মারকায মসজিদ) সংলগ্ন নূরুল উলূম মাদরাসায় কিতাব বিভাগের প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানটিতে শরহে জামী জামাত পর্যন্ত নিয়মিত পড়ানো হত। কখনো বিশেষ ছাত্রদের অনুরোধে জালালাইন ও মেশকাত শরীফ পড়াতেন। তিনি ১৯৬৯ ঈসাব্দ থেকে ১৯৮২ ঈসাব্দ পর্যন্ত প্রায় ১৩ বছর সেখানে ছিলেন।

১৯৮২ ঈসাব্দে টুমচর মাদরাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা হাফিজুল্লাহ ছাহেব রাহ. -এর বিশেষ অনুরোধে তিনি পুনরায় টুমচর মাদরাসায় যোগদান করেন এবং পরবর্তী সময়ে তিনি তাঁকে ভাইস প্রিন্সিপাল হিসেবে নিয়োগ দেন। ১৯৮৪ ঈসাব্দে মাওলানা হাফিজুল্লাহ ছাহেব[৩] রাহ.-এর ইন্তেকালের পর তিনি টুমচর মাদরাসার প্রিন্সিপাল পদে নিযুক্ত হন এবং ১৯৯৮ ঈসাব্দ পর্যন্ত প্রায় ১৪ বছর উক্ত পদে দায়িত্ব পালন করে অবসর গ্রহণ করেন।

অবসর গ্রহণের পর বেশ কয়েক বছর তাঁর বাড়ির পার্শ্ববর্তী আহমেদাবাদ (চাউল ভাণ্ডার) 'হেমায়েতে ইসলাম কওমী মাদরাসা' পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন।

ইন্তেকাল

এ মহান ব্যক্তিত্ব গত ২৯ রবিউল আউয়াল ১৪৩৯ হিজরী মোতাবেক ১৯ ডিসেম্বর ২০১৭ ঈসাব্দ, রোজ মঙ্গলবার, দুপুর ১১ টায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহুম্মাগফির লাহু ওয়ারহামহু।

মৃত্যুর সময় মরহুমের বয়স ছিল ৯১ বছর। তাঁকে হেমায়েতে ইসলাম মাদরাসা-মসজিদের উত্তর পাশে পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়।

মরহুম ছিলেন পাঁচ পুত্র ও দুই কন্যার পিতা। তিনি তাঁর সকল ছেলেকে যোগ্য আলেম হিসেবে গড়ে তোলেন। বর্তমানে সকল সন্তান দ্বীনী খেদমতের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন। ছাত্র ও শিক্ষকতার জীবন মিলিয়ে ষাট বছরের বেশি সময় মরহুম মাওলানা আলী আহমাদ ছাহেব রাহ. আলিয়া মাদরাসাতে কাটিয়েছেন। তা সত্ত্বেও চার ছেলেকে কওমী মাদরাসাতে লেখাপড়া করান এবং মেয়েদেরকে কওমী আলেমদের নিকট বিবাহ দেন।

তিনি যুগ ও সমাজসচেতন একজন আলিমেদ্বীন ছিলেন। সর্বদা তাকওয়া মণ্ডিত জীবন-যাপন করতেন। নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে সবকিছু পালন করতেন। তিনি ছিলেন আপাদমস্তক সুন্নাতের অনুসারী। তাঁকে দেখলে আল্লাহকে স্মরণ হত, তাঁর কথায় আখেরাতের ইয়াদ তাজা হতো। আল্লাহ তাআলা মরহুমকে মাগফিরাত করুন, জান্নাতুল ফিরদাউস নসিব করুন– আমীন।

২. মাওলানা আলী আহমাদ ছাহেব বলেন, 'মাওলানা মযফর আহমাদ উসমানী রাহ. উর্দুতে পড়াতেন। ছাত্ররাও দরসে তাঁর সাথে উর্দুতে কথাবার্তা বলত। তৎকালীন আলিয়া মাদরাসাগুলোতে উর্দু-ফার্সীর ব্যাপক প্রচলন ছিল।'

৩. বড় হুযূর রাহ.-এর জামাতা এবং টুমচর মাদরাসার বর্তমান প্রিন্সিপাল হারুন আলমাদানী ছাহেব (হাফিযাহুল্লাহ)-এর পিতা।

Scanned by CamScanner

مركز الثقافة الإسلامية

মারকাযুল ফিক্‌হিল ইসলামী

(একটি ইসলামী গবেষণামূলক আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান)

বাড়ী # ২, রোড # ১, সেক্টর # ১০, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০ ফোনঃ ০২-৫৫০৯১৯৫৪, মোবাইলঃ ০১৯৩৬-০৭৪৪৮১

E-mail: Admin@markazulfiqhilislami.com Web: www.markazulfiqhilislami.com

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

বিভাগসমূহ : ইফতা বিভাগ, কিতাব বিভাগ, হিফজ বিভাগ, মকতব বিভাগ।

ইফতা বিভাগ :
দুই বছর মেয়াদি ইফতা বিভাগ।

পরীক্ষার্থীর শর্তসমূহ :
পরীক্ষার্থীকে দাওরায়ে হাদিসে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হতে হবে এবং মারকাযের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তির যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।
মেধা তালিকায় উত্তীর্ণ ছাত্রদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

পরীক্ষার বিষয়সমূহ :

লিখিত :
হেদায়া ৩য় খন্ড ও নুরুল আনওয়ার (কিতাবুল্লাহ)

মৌখিক :
আনুসঙ্গিক যে কোন বিষয় ও ফাতহুল কাদীর (কিতাবুল্লাহ)

পরীক্ষার তারিখ : লিখিত ৯ই শাওয়াল মৌখিক ১০ই শাওয়াল

কিতাব বিভাগ :
বিশেষ জামাত থেকে মুতাওয়াসসিতাহ (নাহবেমির) পর্যন্ত ও তাকমীল জামাতে ভর্তি চলবে।

বি: দ্র:
বুখারি ১ম খণ্ড পূর্ণ দরস প্রদান করবেন:
হযরত মাওলানা মুফতি আব্দুল গাফ্‌ফার দা. বা.

হিফজ বিভাগ :
নিয়মিত মশকের ব্যবস্থা।

মকতব বিভাগ (বাংলা ও ইংলিশ ভার্সন) :
প্লে থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদান।

ভর্তির তারিখ ১লা রমজান হতে ১২ই শাওয়াল পর্যন্ত

বিস্তারিত জানতে মাদরাসার ওয়েবসাইটে দেখুন অথবা মোবাইলে যোগাযোগ করুন।

সার্বিক তত্ত্বাবধানে : শাইখুল হাদিস মুফতি আব্দুল গফ্‌ফার দা. বা.
শাইখুল হাদিস ও প্রধান মুফতি ঢালকানগর ও উক্ত মাদরাসা

পরিচালনায় : মাওলানা মাহফুজুর রহমান

মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা

প্রকাশনা বিভাগ ৩০/১২, পল্লবী (মিরপুর-১২) ঢাকা-১২১৬

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক দা. বা. রচিত আরো চারটি গ্রন্থ

লোকমুখে প্রসিদ্ধ ভিত্তিহীন বর্ণনাসমূহের উপর হাদীস শাস্ত্রের আলোকে রচিত প্রামাণ্য গ্রন্থ।

এসব হাদীস নয় -২
বহু প্রতীক্ষিত প্রচলিত জাল হাদীসের ২য় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে, 'এসব হাদীস নয়-২' নামে।

এসব হাদীস নয় -১
পূর্বে প্রকাশিত 'প্রচলিত জাল হাদীস'-এর বর্ধিত, পরিমার্জিত ও উন্নত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে 'এসব হাদীস নয়-১' নামে।

ইঞ্জিল ও প্রচলিত ইঞ্জিল
একটি পর্যালোচনা
আবু মাইসারা মুনশী মুহাম্মাদ মহিউদ্দিন

هٰكَذَا فَهِمَ الصَّحَابَةُ
যেমন ছিল তাঁদের দৃষ্টি
নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের উন্নত চিন্তা, দৃষ্টি, বোধ ও উপলব্ধির কিছু উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত
মূল-সালেহ আহমদ শামী
অনুবাদ : মাওলানা আব্দুল মাজীদ

প্রকাশের পথে...

তাসাওউফের মূল তত্ত্ব
মুফতী মাহমূদ আশরাফ উসমানী
[তাসাওউফ, তাসাওউফ সংক্রান্ত শরয়ী দৃষ্টিভঙ্গী, সিলসিলা, যিকির ও ওযীফা ইত্যাদির হাকীকতা

তাসাওউফ : তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ
মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক
[তাসাওউফের মূলতত্ত্ব, তার সঠিক পথ বহুবিধ ভ্রান্তির নিরসন, বাড়াবাড়ি-শিথিলতার সংশোধনা

প্রচলিত ভুল

উম্মাহর ঐক্য : পথ ও পন্থা

নির্বাচিত প্রবন্ধ ১-২

আমাদের পরিবেশক-প্রতিনিধিগণ

মাকতাবাতুল আশরাফ
রাহনুমা প্রকাশনী
আলমাহমুদ প্রকাশন
মাকতাবাতুল আযহার
নাদিয়াতুল কুরআন লাইব্রেরি
ইদরীসিয়া কুতুবখানা
(মাদানী নগর)

ডাকযোগে পেতে চাইলে যোগাযোগ করুন : ০১৯৭৩-২৯৫ ২৯৫

Scanned by CamScanner

প্রচলিত ভুল

ভিত্তিহীন বর্ণনা

রজব মাসের নামায বিষয়ে কিছু ভিত্তিহীন বর্ণনা

বার চাঁদের আমল শিরোনামের কিছু কিছু পুস্তিকায় রজব মাসের বর্ণনা দিতে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের ভিত্তিহীন বর্ণনার সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। একটি বইয়ে লেখা হয়েছে–

রজব মাসের প্রথম তারিখে মাগরিবের নামায ও ইশার নামাযের মাঝখানে বিশ রাকাত নফল নামায পড়বে। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস ৩ বার, সূরা কাফিরূন ৩ বার পড়বে। তাহলে আল্লাহ পাক হাশরের দিন তাকে শহীদের দলের সহিত উঠাবেন এবং আল্লাহ পাকের নিকট সে বড় আবেদ বলে গণ্য হবে।

রজব মাসের প্রত্যেক জুমার দিন জুমার পর আসরের নামাযের আগে চার রাকাত নামায এক সালামে পড়বে। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর ৭ বার আয়াতুল কুরসি ও পাঁচবার সূরা ইখলাস পড়বে...।

এই মাসের ১৫ তারিখকে শবে ইস্তেফতাহ বলা হয়। যে ব্যক্তি এই রাত্রিতে ৭০ রাকাত নফল নামায দুই রাকাত করে পড়বে...।

১৫ তারিখ রাতে তাহাজ্জুদের নামাযের সময়ে ৫০ রাকাত নফল নামায দুই রাকাত করে পড়বে...তার সমস্ত দুআ কবুল করা হবে, কবর আলোকিত হবে এবং শহীদদের সাথে তার হাশর হবে এবং পয়গাম্বারদের সঙ্গে সে বেহেশতে যেতে পারবে।

১৫ তারিখ দ্বিপ্রহরের পর গোসল করে আট রাকাত নফল নামায পড়বে; দুই রাকাত করে। প্রত্যেক রাকাতে...।

এ বর্ণনাগুলো মোসাম্মৎ আমেনা বেগমের লেখা 'বার চাঁদের আমল ও ঘটনা' নামক পুস্তিকায় রয়েছে। এছাড়াও শুধু রজব মাসের নামায সংক্রান্তই আরো কিছু বর্ণনা ও ঘটনা সেখানে রয়েছে, যা এখানে উল্লেখ করা হল না। এ পুস্তিকা, মকসুদুল মুমিনীন ও বারো চান্দের ফযীলত শিরোনামে লেখা অন্যান্য পুস্তিকায়ও রজব মাসের বিভিন্ন দিন-তারিখের বিভিন্ন সময়ের নামাযের বর্ণনা এবং তার বিরাট বিরাট ফযীলত লেখা হয়েছে। এই বর্ণনাগুলো এতই উদ্ভট যে, এর মধ্যে কিছু বর্ণনার অংশবিশেষ জাল হাদীসের কিতাবে পাওয়া গেলেও অন্যগুলো জাল হাদীসের ভাণ্ডারেও পাওয়া যায় না।

অষ্টম শতকের বিখ্যাত হাদীস বিশারদ হাফেয ইবনে রজব রাহ. বলেন–

فأما الصلاة فلم يصح في شهر رجب صلاة مخصوصة تختص به.

অর্থাৎ রজব মাসের নির্দিষ্ট কোনো নামায প্রমাণিত নয়। –লাতায়েফুল মাআরেফ পৃ. ২২৮

তেমনিভাবে রজব মাসের বিশেষ বিশেষ রোযা বিষয়েও বিভিন্ন ধরনের জাল বর্ণনা এসকল পুস্তিকায় পাওয়া যায়, যার কোনোই ভিত্তি নেই। হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রাহ. বলেন–

لم يرد في فضل شهر رجب، ولا في صيامه، ولا في صيام شيء منه معين، ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة.

রজব মাসের ফযীলত, রজব মাসে রোযা রাখার ফযীলত বা রজব মাসের নির্দিষ্ট কোনো দিন রোযা রাখার ফযীলত অথবা রজব মাসের নির্দিষ্ট কোনো রাতে নামায-ইবাদত করার ফযীলত সম্পর্কে প্রমাণ হওয়ার উপযুক্ত কোনো হাদীস নেই। –তাবয়ীনুল আজাব বিমা ওয়ারাদা ফী শাহরি রাজাব, পৃ. ১১

মোটকথা, রজব মাসের নির্দিষ্ট কোনো নামায বা রোযা নেই। এ মাসে নির্দিষ্ট কোনো দিনে নফল নামায বা রোযা পালনের বিশেষ কোনো ফযীলতের কথাও হাদীসে নেই। সুতরাং আমরা এগুলো বিশ্বাস করব না।

(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : তাবয়ীনুল আজাব বিমা ওয়ারাদা ফী শাহরি রাজাব, ইবনে হাজার আসকালানী; কিতাবুল মাউযূআত, ইবনুল জাওযী; আললাআলিল মাছনূআহ, জালালু-দ্দিন সুয়ূতী; তানযীহুশ শারীআহ, ইবনে আররাক; তাযকিরাতুল মাউযূআত, তাহের পাটনী; আলফাওয়াইদুল মাজমূআ, শাওকানী; আলআসারুল মারফূআহ, আবদুল হাই লখনবী ইত্যাদি কিতাবের রজব মাস বা এ সংশ্লিষ্ট বর্ণনা সংক্রান্ত অধ্যায়)

তবে রজব মাস যেহেতু 'আশহুরে হুরুম' তথা সম্মানিত চার মাসের অন্তর্ভুক্ত, তাই নির্দিষ্ট কোনো দিন-তারিখ নির্ধারণ বা নির্দিষ্ট ফযীলতের বিশ্বাস ছাড়া এ মাসে নফল নামায বা রোযা রাখতে কোনো বাধা নেই।

সংশোধনী

হাদীস শরীফে আকীকার বিষয়ে এসেছে–

تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى.

নবজাতকের পক্ষ থেকে সপ্তম দিনে জবেহ করা হবে, চুল মুণ্ডানো হবে এবং নাম রাখা হবে। –সুনানে আবূ দাউদ, হাদীস ২৮৩৮; সুনানে নাসায়ী, হাদীস ৪২২০; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২০০৮৩

এটিই সুন্নাহ যে, এ কাজগুলো সপ্তম দিনে করা হবে। কিন্তু প্রচলিত ভুল কিতাবে (২য় সংস্করণ, পৃ. ৫২) ভুলক্রমে 'সপ্তম দিনে'-এর স্থলে 'সাতদিন পর' কথাটা এসে গেছে। সেখানে এসেছে– 'সন্তান জন্মের সাতদিন পর আকীকা করা সুন্নত...' বাক্যটি হবে এরকম– 'সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে আকীকা করা সুন্নত...'। এ অনাকাঙ্ক্ষিত ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত। পাঠকবর্গকে নিজ নিজ কপি সংশোধন করে নেওয়ার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

যে ভাই ফোন করে আমাদেরকে এ বিষয়ে অবগত করেছেন তাঁকে–

جزاك الله خيرا.

সুন্নত তরিকায় বিবাহ

যৌতুকবিহীন বিবাহে আগ্রহী
পাত্র-পাত্রী/অভিভাবকগণ যোগাযোগ করুন

সাক্ষাতের সময়
বৃহস্পতিবার : সকাল ৭-১১ টা
মঙ্গল ও বুধবার : সকাল ৯-১১টা

যোগাযোগ
সুন্নত তরিকায় বিবাহ সমিতি
প্রিন্সিপ্যাল মীযান সাহেব
৪১ নবাব কাটরা, নিমতলী, ঢাকা
মোবাইল : ০১৬৭৮-০৮১৪৭৭
০১৯১৩-১৮৭০৪২
ই-মেইল : saiful62779@gmail.com
www. sunnottorikaybibahosomity.org

Scanned by CamScanner

دار الفكر والإرشاد ڈھاکا بنگلادیش

দারুল ফিক্‌রি ওয়াল ইরশাদ, ঢাকা

(গবেষণামূলক উচ্চতর দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান)

অস্থায়ী কার্যালয় : সি-৫৪, আরসিম গেইট, ফরিদাবাদ, ঢাকা-১২০৪

১৪৩৯-৪০ হিজরী শিক্ষাবর্ষের ভর্তিতথ্য

ইনশাআল্লাহ! আগামী শিক্ষাবর্ষে আত্‌তাখাস্‌সুস ফি উলূমিল হাদীস এবং আত্‌তাখাস্‌সুস ফিল ফিক্‌হি ওয়াল ইফতা-এর ২ বছর মেয়াদী কোর্সে যথানিয়মে সীমিত কোটায় দু'পর্বে ছাত্র ভর্তি করা হবে। উল্লেখ্য, কৃতিত্বের সাথে কোর্স সম্পন্নকারী ও গবেষণামূলক লেখাপড়ায় অধিক আগ্রহী তালিবুল ইল্‌মকে বিশেষ সুবিধাসহ অতিরিক্ত ২/৩ বছর অধ্যয়নের সুযোগ দেয়া হবে ইনশাআল্লাহ।

প্রথম পর্বের পরীক্ষার তারিখ : লিখিত পরীক্ষা : ১৬ই রমযান ১৪৩৯ হি. সকাল ১০টা। বাদ যোহর : নির্বাচিত প্রবন্ধ পরীক্ষা।
মৌখিক পরীক্ষা : ১৭ই রমযান ১৪৩৯ হি. সকালে। ফলাফল : ঐ দিন বিকালে।

দ্বিতীয় পর্বের পরীক্ষার তারিখ : লিখিত পরীক্ষা : ৮ই শাওয়াল ১৪৩৯ হি. সকাল ১০টা। বাদ যোহর : নির্বাচিত প্রবন্ধ পরীক্ষা।
মৌখিক পরীক্ষা : ৯ই শাওয়াল ১৪৩৯ হি. সকালে। ফলাফল : ঐ দিন বিকালে।

লিখিত পরীক্ষার বিষয় :

উলূমুল হাদীস: আল কুরআনুল কারীম (তরজমা ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর), সহীহুল বুখারী, শরহুন নুখ্‌বাহ।

উলূমুল ফিক্‌হ: আল কুরআনুল কারীম, সহীহুল বুখারী, আল হিদায়া।

মৌখিক পরীক্ষা : উন্মুক্ত।

উল্লেখ্য : তাখাস্‌সুস বিভাগের ভর্তি পরীক্ষা আরসিম গেইট কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে।

যোগাযোগ : ০২-৪৭৪৪৫৯১৭, ০১৮১৮-৩৯০৮৯৬, ০১৮১৮-৫৩০৬৩৮

বিশেষ দ্রষ্টব্য

ইনশাআল্লাহ! আগামী ১৪৩৯-৪০ হি. শিক্ষাবর্ষে দারুল ফিক্‌রি ওয়াল ইরশাদের নিজস্ব জায়গায় (রসূলবাগ, কদমতলী, ঢাকা ১২৩৬) শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হবে। প্রাথমিকভাবে সেখানে হিফ্‌জ, নাজেরা বিভাগ ও কিতাব বিভাগের জালালাইন জামাতে সীমিত কোটায় মেধাবী ও পরিশ্রমী ছাত্র ভর্তি করা হবে।

হিফ্‌জ, নাজেরা ও জালালাইন জামাতের ভর্তি শুরু হবে ৭ই শাওয়াল ১৪৩৯হি.।

যোগাযোগ : ০২-৪৭৪৪৫৯১৭, ০১৮১৮-৩৯০৮৯৬, ০১৮১৮-৫৩০৬৩৮, ০১৮৪৮-১৪২৮০০

যাতায়াত : শনির আখড়া/রায়েরবাগ/জুরাইন কমিশনার রোড/শ্যামপুর থেকে রিকশা/সি. এন. জি. যোগে রসূলবাগ (চব্বিশ ফুট)।

মুহতাজে দোয়া
(মুফতী) মুহাম্মদ আবূ সাঈদ
খাদেম, দারুল ফিক্‌রি ওয়াল ইরশাদ, ঢাকা

Scanned by CamScanner

الجامعة الإسلامية دار العلوم برورا كوملا بنغلاديش

আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া দারুল উলূম বরুড়া, কুমিল্লা

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

قسم التخصص في الفقه والإفتاء

শিক্ষাবর্ষ ১৪৩৯-৪০ হি. (মেয়াদ : ২ বৎসর)

আলহামদুলিল্লাহ মুরব্বিগণের পরামর্শে 'আততাখাসসুস ফিল ফিকহি ওয়াল ইফতা' উচ্চতর এ বিভাগটি গত বছর থেকে অত্র জামিয়ায় চালু হয়েছে। ১৪৩৯-৪০হি. শিক্ষাবর্ষে এ বিভাগে দাওরায়ে হাদীস সমাপনকারী তালিবে ইলমদেরকে সীমিত কোটায় ভর্তি করা হবে ইনশাআল্লাহ।

ভর্তির শর্তাবলী

* আবেদনকারী শিক্ষার্থীকে দাওরায়ে হাদীসের বার্ষিক পরীক্ষায় ন্যূনতম প্রথম বিভাগে (جيّد جدًّا) উত্তীর্ণ হতে হবে।
* ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
* মেহনতী, মনোযোগী ও সর্বপ্রকার ঝামেলামুক্ত হয়ে অধ্যয়নের ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং সার্বিক বিবেচনায় যোগ্য হতে হবে।

পরীক্ষার বিষয়

* লিখিত : ১. হিদায়া (كتاب البيوع–أدب القاضي) ২. নূরুল আনওয়ার (كتاب الله)
* মৌখিক : যে কোন বিষয়, যে কোন কিতাব।

ভর্তির নিয়মাবলী

ফরম বিতরণ : ১০১৩- শাওয়াল ১৪৩৯ হি.।
পরীক্ষা গ্রহণ : ১৫ ই শাওয়াল ১৪৩৯ হি.।
ভর্তি : ফলাফল প্রকাশের পর।

নিবেদক
মুহা. নোমান
মুহতামিম অত্র মাদরাসা

যোগাযোগ : ০১৮১৭-১২০৩৯৬, ০১৮১৮-৬৩৫৫৭০

Scanned by CamScanner

আপনি যা জানতে চেয়েছেন

ফতোয়া বিভাগ : মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা

তাহারাত-পবিত্রতা

সাদেকুল ইসলাম
সিলেট

৪৩৯৭ প্রশ্ন : আমার সর্দি লাগে। একসময় তা ঘন ও শক্ত হয়ে যায়। তাই ঘন সর্দির সাথে কখনো জমাটবাঁধা রক্ত বের হয়ে আসে। তাই জানতে চাচ্ছি, এভাবে সর্দির সাথে জমাটবাঁধা রক্ত বের হলে কি অযু নষ্ট হয়ে যাবে?

উত্তর : নাক দিয়ে জমাটবাঁধা রক্ত বের হলে অযু নষ্ট হয় না। তাই সর্দির সাথে জমাটবাঁধা রক্ত বের হলে অযু নষ্ট হবে না। –আলমুহীতুল বুরহানী ১/২০৩; হালবাতুল মুজাল্লী ১/৩৮৪; আসসেআয়া ১/২১২; রদ্দুল মুহতার ১/১৩৯

মামুন
নোয়াখালী

৪৩৯৮ প্রশ্ন : আমি আসরের নামাযের পর দাঁতের চিকিৎসা করাই। এতে মাড়ির রক্তক্ষরণ শুরু হয় এবং মাগরিবের পুরো ওয়াক্তেই তা অব্যাহত ছিল। উক্ত অবস্থায়ই আমি অযু করে নামায আদায় করি। এখন প্রশ্ন হল, রক্তক্ষরণের সময় নামায পড়া শুদ্ধ হয়েছে? নাকি উক্ত নামায পুনরায় পড়া আবশ্যক?

উত্তর : প্রশ্নের বর্ণনা অনুযায়ী আসরের পর থেকে রক্তক্ষরণ শুরু হয়ে মাগরিবের শেষ সময়েও যেহেতু অব্যাহত ছিল তাই ঐ ক্ষেত্রে আপনি মাজুর বলে গণ্য হবেন। অতএব ঐ রক্তক্ষরণের সময় আপনার আদায়কৃত নামাযগুলো সহীহ হয়েছে। পুনরায় পড়ার প্রয়োজন নেই। কেননা, মাজুর ব্যক্তির জন্য অযু করার পর উক্ত ওজর ব্যতীত অযু বিনষ্টকারী অন্য কারণ পাওয়া না গেলে ওয়াক্তের ভেতর সব ধরনের নামায পড়া বৈধ। –ফাতহুল কাদীর ১/১৮৫; আলবাহরুর রায়েক ১/২১৫; খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/৬১; আলমাবসূত, সারাখসী ১/৮৩; হালবাতুল মুজাল্লী ১/৩৮৪

সালাত-নামায

মামুন বিন শাফায়েত
চাটখিল, নোয়াখালী

৪৩৯৯ প্রশ্ন : আমাদের মহল্লায় দুটি মসজিদে জুমার নামায অনুষ্ঠিত হয়। মহল্লার সকল মুসল্লীর জন্য দুটি মসজিদই যথেষ্ট। কিন্তু জনৈক দাতা মহল্লার একটি জুমা মসজিদের ২০০ গজের মধ্যে তৃতীয় একটি পাঞ্জেগানা মসজিদকে –যা তাঁর অর্থায়নে নির্মিত– জুমা মসজিদে রূপান্তরিত করার উদ্যোগ নিয়েছেন। বাহ্যত বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে তিনি এ উদ্যোগ নিয়েছেন বলে মনে হয় না। কিন্তু এতে পার্শ্ববর্তী মসজিদের জুমার জামাতে মুসল্লী হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। প্রশ্ন হল, এমতাবস্থায় তাঁর জন্য উক্ত উদ্যোগ বাস্তবায়নের সুযোগ রয়েছে কি না?

উত্তর : প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে নতুন মসজিদকে জুমা মসজিদে রূপান্তর না করাই উত্তম। কেননা কোনো মহল্লায় একাধিক মসজিদ থাকলেও কোনো এক বা একাধিক বড় মসজিদে সকলে একত্রিত হয়ে বড় জামাতে জুমা নামায পড়া উত্তম। বড় জামাতে পড়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ছোট ছোট জামাতে জুমা আদায় করা অনুত্তম। যদিও একই মহল্লার একাধিক মসজিদে জুমার জামাত করা জায়েয আছে। –আলমাবসূত, সারাখসী ২/১২০; শরহুল মুনয়া পৃ. ৫৫১; ফাতহুল কাদীর ২/১৫; ইলাউস সুনান ৮/৯১

মাহবুবুর রহমান
ঢাকা

৪৪০০ প্রশ্ন : এক ইফতার মাহফিলে অংশগ্রহণের সময় সেখানেই সবাই জামাতসহ নামায আদায় করি। কারণ, মহল্লার মসজিদে তখন জামাত পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। উক্ত নামাযের পূর্বে আমাদের কেউ কেউ আযানের প্রস্তাব করলেও তা আমলে নেওয়া হয়নি। প্রশ্ন হল, এক্ষেত্রে কি আমাদের আযান দেওয়া জরুরি ছিল?

উত্তর : আপনাদের আযান না দেওয়া ভুল হয়নি। কেননা এক্ষেত্রে মসজিদের আযানই যথেষ্ট। হযরত আসওয়াদ ও আলকামা রাহ. থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন–

أَتَيْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ فِي دَارِهِ، فَقَالَ: أَصَلَّى هؤُلَاءِ خَلْفَكُمْ؟ فَقُلْنَا: لَا، قَالَ: فَقُومُوا فَصَلُّوا، فَلَمْ يَأْمُرْنَا بِأَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ.

আমরা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর ঘরে এলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের পেছনের লোকেরা কি নামায পড়েছে? আমরা বললাম, না। তিনি বললেন, (তাহলে) তোমরা দাঁড়াও, নামায পড়। তখন তিনি আমাদের আযান ও ইকামতের নির্দেশ দেননি। (সহীহ মুসলিম, হাদীস ৫৩৪)

প্রকাশ থাকে যে, যদি এমন স্থানে জামাত করা হয়, যেখানে আশপাশ থেকে আযানের শব্দ শোনা যায় না, তবে সেখানে আযান দেওয়াই নিয়ম। –আসসুনানুল কুবরা, বাইহাকী ১/৪০৬; খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/৪৮; তাবয়ীনুল হাকায়েক ১/২৫১; আলবাহরুর রায়েক ১/২৬৫; শরুহল মুনয়া পৃ. ৩৭২

মুহাম্মাদ রাফিক উদ্দীন
নোয়াখালী

৪৪০১ প্রশ্ন : সড়ক দুর্ঘটনায় আমাদের ইমাম সাহেবের একটি হাত ভেঙ্গে যায়। ফলে প্লাস্টার করা হয়। এখন তিনি প্লাস্টারের উপর মাসেহ করে নামায পড়ান। প্রশ্ন হল, এই ইমামের পেছনে আমাদের ইক্তিদা কি সহীহ হবে? জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : হাঁ, উক্ত ইমামের পেছনে আপনাদের নামায পড়া সহীহ হবে। কারণ, মাসেহকারীর পেছনে অন্যদের ইক্তিদা করা সহীহ। –বাদায়েউস সানায়ে ১/৩৫৫; খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/১৪৭; হালবাতুল মুজাল্লী ১/৩৪৬; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১/৪২২

ইফরাদ হোসেন
ঢাকা

৪৪০২ প্রশ্ন : কিছুদিন আগে আমাদের মসজিদে নতুন ইমাম সাহেব এসেছেন। আলহামদু লিল্লাহ তিনি সবদিক থেকে

Scanned by CamScanner

ভালো এবং এক মাদরাসার শিক্ষকও। তো এই বছর তাকবীরে তাশরীক শুরু হওয়ার দিন নামাযের পর পরই সবাই একবার তাকবীর বলে থেমে যান। কিন্তু ইমাম সাহেব তিনবার পড়লেন। পরে সবাই তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, তিনবার পড়াও সুন্নত। তো জানার বিষয় হল, তাকবীরে তাশরীক কতবার পড়া সুন্নত।

উত্তর : ফরয নামাযের পর তাকবীরে তাশরীক একবারই পড়া নিয়ম। তিনবার পড়া সুন্নত– এ কথা ঠিক নয়। তাই তিনবার তাকবীরে তাশরীক বলার প্রচলন করবে না। –রদ্দুল মুহতার ২/১৭৮; শরহুল মুনয়া পৃ. ৫৭৫; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৫২

মাহফুজুর রহমান
ভোলা

৪৪০৩ প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি শারীরিকভাবে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছেন। তাই তিনি বসে রুকু সিজদার সাথে নামায আদায় করেন। সুস্থ থাকা অবস্থায় তার কিছু নামায কাযা হয়ে যায়। এখন তিনি সে নামাযগুলো কাযা করতে চাচ্ছেন। জানার বিষয় হল, সুস্থ অবস্থায় ছুটে যাওয়া নামাযগুলো বর্তমানে তিনি কীভাবে কাযা করবেন?

উত্তর : এখন তিনি যেহেতু শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে গেছেন তাই সুস্থ অবস্থার কাযা নামাযও বসে বসে আদায় করলে তা আদায় হয়ে যাবে। এ নিয়ে সংশয়ের প্রয়োজন নেই। কেননা কাযা নামায যখন পড়া হবে তখনকার সামর্থ্য অনুযায়ী পড়লেই আদায় হয়ে যায়। –তাবয়ীনুল হাকায়েক ১/৫১৯; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ২/৬৭৭; আলবাহরুর রায়েক ২/১৩৭; হাশিয়াতুত তাহতাবী আলাল মারাকী পৃ. ২৩৩

নজরুল ইসলাম
কুড়িগ্রাম

৪৪০৪ প্রশ্ন : আমি একটি ইসলামী পত্রিকায় টাইপের কাজ করি। এক্ষেত্রে অনেক সময় সিজদার আয়াতও টাইপ করতে হয়। জানার বিষয় হল, সিজদার আয়াত টাইপ করার কারণে আমার উপর সিজদা ওয়াজিব হবে কি না?

উত্তর : সিজদা ওয়াজিব হয় মুখে আয়াত তিলাওয়াত করার দ্বারা। তাই মুখে উচ্চারণ না করে টাইপ করলে বা লিখলে তিলাওয়াতে সিজদা ওয়াজিব হবে না। –আলমুহীতুল বুরহানী ২/৩৬২; খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/১৮৪; ইমদাদুল ফাত্তাহ পৃ. ৫৩২; রদ্দুল মুহতার ২/১০৩

হুসাইন আহমাদ
সিলেট

৪৪০৫ প্রশ্ন : আমি ব্যবসায়িক কারণে প্রায়ই বিভিন্ন জায়গায় সফর করি। আমার জানার বিষয় হল, সুন্নত নামাযের কি কসর আছে? আর সফর অবস্থায় সুন্নত নামাযের হুকুম কী?

উত্তর : সফরে চার রাকাতবিশিষ্ট ফরয নামাযই কেবল কসর করতে হয়। সুন্নত বা অন্য কোনো নামাযে কসরের বিধান নেই। তবে সুন্নতে মুআক্কাদা নামায সফর অবস্থায় মুআক্কাদা থাকে না। তাছাড়া তাড়াহুড়া ও অধিক ক্লান্তির সময় সুন্নত না পড়ার সুযোগ আছে। বিশেষত সুন্নত আদায়ের কারণে গাড়ি ফেল করা বা অন্য কোনো সমস্যায় পড়ার আশংকা থাকলে অথবা অপেক্ষায় থাকা কোনো ব্যক্তি বা সফরসঙ্গীর কষ্ট হলে সুন্নত ছেড়ে দেওয়াই কর্তব্য। অবশ্য সফরে ঝামেলামুক্ত ও সুস্থ থাকলে সুন্নত পড়ে নেওয়া উত্তম। –আলমাবসূত, সারাখসী ১/২৪৮; শরহুল মুনয়া পৃ. ৫৪৫; হালবাতুল মুজাল্লী ১/৫২৩; রদ্দুল মুহতার ২/১৩১; ফাতাওয়া রহীমিয়া ৫/১৭৩

জানাযা-দাফন

মুহাম্মাদ ফাহিম
বরিশাল

৪৪০৬ প্রশ্ন : মুহতারাম মুফতী সাহেব! আমাদের গ্রামে জানাযা নামাযের পর খাটিয়া বহন করে গোরস্তানে যাওয়ার পথে তিনবার থামা হয় এবং এই থামাকে সুন্নতও বলা হয়। এর বিশুদ্ধতা কতটুকু? এক্ষেত্রে সুন্নাহসম্মত পদ্ধতি কী? দয়া করে জানালে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর : মায়্যিতের খাটিয়া বহন করার সুন্নাহসম্মত পদ্ধতি হল, চার ব্যক্তি খাটিয়ার চার পায়া ধরে উঠাবে। এবং সম্ভব হলে প্রত্যেকে সবগুলো পায়া কাঁধে নিবে। আর সবগুলো পায়া ধরার নিয়ম ফকীহগণ এভাবে বলেছেন যে, প্রথমে একজন সামনের ডান পায়া কাঁধে নিবে। এরপর পেছনের ডান পায়া ডান কাঁধে, তারপর সামনের বাম পায়া বাম কাঁধে, সর্বশেষ পেছনের বাম পায়া বাম কাঁধে নিবে। আর লাশ বহনের সময় তিনবার থামা সুন্নত বা মুস্তাহাব নয়। তবে প্রতিবার কাঁধ পরিবর্তন করার প্রয়োজনে যদি দাঁড়াতে হয় তাতে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু এটিকে সুন্নত বা সওয়াবের কাজ মনে করা যাবে না। –সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ১৪৭৮; মুসান্নাফে ইবনে আবীশাইবা, বর্ণনা ১১৩৯৯; আলজামেউস সগীর, ইমাম মুহাম্মাদ পৃ. ১১৭; আলমুহীতুল বুরহানী ৩/৬৯; হালবাতুল মুজাল্লী ২/৬০৫; শরহুল মুনয়া পৃ. ৫৯২; রদ্দুল মুহতার ২/২৩১

হাফেজ তাজুল ইসলাম
জামেয়া দারুল হুদা, সিলেট

৪৪০৭ প্রশ্ন : একদিন এক জানাযায় উপস্থিত হয়ে অন্যমনস্ক থাকায় মাইয়েত পুরুষ না মহিলা এর বিবরণ শুনতে পাইনি। এমতাবস্থায় কীভাবে নিয়ত করব তা বুঝতে না পেরে উক্ত জানাযায় আর শরীক হইনি। জানার বিষয় হল, জানাযার নামাযে মাইয়েত পুরুষ না মহিলা তা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করে নিয়ত করা কি জরুরি?

উত্তর : জানাযার নামাযে মাইয়েত পুরুষ না মহিলা তা নির্দিষ্টভাবে নিয়ত করা জরুরি নয়। বরং এই মাইয়েতের জানাযা পড়ছি এমন নিয়ত করাই যথেষ্ট। আর জানাযার প্রসিদ্ধ দুআটি নারী-পুরুষ সকলের ক্ষেত্রে একই রকম। তাই মাইয়েতের অবস্থা জানা না থাকলেও প্রসিদ্ধ দুআটি পড়লেই চলবে। অতএব মাইয়েতের অবস্থা জানা না থাকার কারণে জানাযায় শরীক না হওয়া ভুল হয়েছে। –আলবাহরুর রায়েক ১/২৮৩; শরহুল মুনইয়াহ ২৪৯; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৬৭, ১৬৪; রদ্দুল মুহতার ১/৪২৩

যাকাত-সদাকা

আরিফুল ইসলাম
বাঁশখালী, চট্টগ্রাম

৪৪০৮ প্রশ্ন : আমার বড় বোনের প্রথম স্বামী দীর্ঘদিন জেলে। তার সহায়-সম্পত্তিও তেমন নেই। তাই বাধ্য হয়ে আমরা তালাকের মাধ্যমে আমাদের বোনকে তার ছেলেসন্তানসহ নিয়ে আসি। পরে সচ্ছল স্বামীর সাথে তার বিবাহ হয়। বর্তমানে বোনের মালিকানাধীন স্বর্ণালঙ্কার ও নগদ টাকা মিলে ৭০/৮০ হাজার টাকা আছে। এদিকে প্রথম ঘরের ছেলেটি তখন থেকেই আমাদের তত্ত্বাবধানে থাকে। বর্তমানে তার বয়স ১৩; এখনও নাবালেগ। তার টিউশন ফি ও স্কুলের বেতন মাসে ৪/৫ হাজার টাকা– আমি পরিশোধ করে থাকি। এখন মুফতী সাহেবের নিকট আমার প্রশ্ন হল :

ক. আমার এ ভাগিনা যাকাত গ্রহণের

Scanned by CamScanner

উপযুক্ত কি না?
খ. তার টিউশন ফি ও স্কুলের বেতন যদি আমি যাকাতের নিয়তে পরিশোধ করি, যাকাতের বিষয়টি তাকে না জানিয়ে, তাহলে এতে আমার যাকাত আদায় হবে কি না?
উত্তর : ক. প্রশ্নের বর্ণনা অনুযায়ী আপনার ভাগিনার বাবা যেহেতু দরিদ্র তাই সে যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত। আপনিও তাকে যাকাত দিতে পারবেন। –আলবাহরুর রায়েক ২/২৪৬; মাজমাউল আনহুর ১/৩৩০
খ. প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে সে যেহেতু জানে যে আপনি তার পক্ষ থেকে টিউশন ফি ইত্যাদি আদায় করে থাকেন, সুতরাং যাকাতের অর্থ থেকে এগুলো দেওয়ার দ্বারা আপনার যাকাত আদায় হয়ে যাবে। –কিতাবুল আছল ২/১০৪; আলমুহীতুল বুরহানী ৩/২৬৮; ফাতহুল কাদীর ২/২০৮; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৯০

আবুল কাসেম
ওয়েব থেকে প্রাপ্ত
৪৪০৯ প্রশ্ন : দরিদ্র ও অসহায় হিন্দুদেরকে মান্নতের টাকা দিলে বৈধ হবে কি? জানালে উপকৃত হব।
উত্তর : যাকাত, মান্নত ও অন্যান্য ওয়াজিব সদকা একমাত্র মুসলিমদেরকেই দিতে হয়। তাই অমুসলিদেরকে মান্নতের টাকা দেওয়া জায়েয হবে না। কেউ দিলে তা দ্বারা মান্নত আদায় হবে না। তা নফল দান হিসেবে গণ্য হবে। অতএব, অমুসলিমদেরকে অর্থসহায়তা দিতে চাইলে তা নফল দান হিসাবে দিবে। –মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, বর্ণনা ১০৫১৫, ১০৫১২; বাদায়েউস সানায়ে ২/১৬১; রদ্দুল মুহতার ২/৩৫১, ৬৩৩

আবদুল গফফার
সিলেট
৪৪১০ প্রশ্ন : আমাদের গ্রামে একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি একটি বিপদে পড়ে তার জমি বন্ধক রেখে ঋণ নেয়। পরবর্তীতে তিনি ঐ ঋণ পরিশোধ করতে পারছিলেন না। এদিকে তার সংসারের খরচের জন্য জমিরও প্রয়োজন। কিন্তু বিষয়টি লজ্জায় তিনি কারো কাছে প্রকাশ করেননি। আমরা দুই-তিনজন বিষয়টি জানতে পেরে তার অগোচরে ঋণ পরিশোধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। পাওনাদারকে অনুরোধ করি, তিনি যদি আমাদের কথা কাউকে না বলেন তাহলে আমরা ঐ ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করে দিব। তিনি এতে রাজি হয়েছেন। এখন আমি যদি আমার যাকাতের অর্থ দিয়ে তার অগোচরে ঋণ পরিশোধ করে দেই তাহলে আমার যাকাত আদায় হবে কি? যদি আদায় না হয় তাহলে কি শুধু তাকে কোনভাবে জানিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট হবে না তার হাতেই টাকা দিতে হবে?
উত্তর : উক্ত ব্যক্তি যদি যাকাত গ্রহণের যোগ্য হয় তাহলে তার অনুমতিক্রমে যাকাতের অর্থ দ্বারা তার ঋণ আদায় করা যাবে। এক্ষেত্রে যাকাত আদায়ের জন্য তার অনুমতি নেওয়াই যথেষ্ট। অর্থাৎ একথা বলাই যথেষ্ট যে, আমরা আপনার ঋণ আদায় করে দিচ্ছি। যাকাতের অর্থ সরাসরি তার হাতে দেওয়া জরুরি নয়। কিন্তু অনুমতি ছাড়া কারো ঋণ পরিশোধ করলে যাকাত আদায় হবে না'। –খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/২৪৩; আলমুহীতুল বুরহানী ৩/২৬৮; ফাতাওয়া খানিয়া ১/২৬৮; ফাতহুল কাদীর ২/২০৮

নিকাহ-তালাক

উম্মে আফনান
পল্লবী, ঢাকা
৪৪১১ প্রশ্ন : আমি ছেলের মা হিসেবে নিয়ত করে রেখেছি তাকে আমার এক বান্ধবীর মেয়ের সাথে বিয়ে করাব। মেয়ের পরিবারও এতে সম্মত আছে। কিন্তু ওরা দুজনই এখনও লেখাপড়া করছে। তাই ২-৩ বছর আগে বিয়ে করানোর কোনো পক্ষেরই ইচ্ছা নেই। এমতাবস্থায় তারা কি এখন থেকে শুধু ফোনে কথা বলতে পারবে? দয়া করে জানাবেন?
উত্তর : কথাবার্তা চূড়ান্ত হলেও যে পর্যন্ত বিবাহের আক্দ সম্পন্ন না হবে সে পর্যন্ত তারা একে অপরের জন্য মাহরাম নয়। এ সময় তাদের পরস্পরের দেখা-সাক্ষাৎ, কথাবার্তা তথা অন্তরঙ্গতা কোনো কিছুই জায়েয নয়। –আহকামুল কুরআন, জাস্সাস ৩/৩১৯; উমদাতুল কারী ৭/২৭৯; রদ্দুল মুহতার ৬/৩৬৯, ১/৪০৬; আলবাহরুর রায়েক ১/২৬৩

উম্মে হাবীবা
পল্লবী, ঢাকা
৪৪১২ প্রশ্ন : হুজুর আমার একটি মেয়ে হয়েছে। আমি অসুস্থতার কারণে তাকে দুধপান করাতে পারছি না। আমাদের পাশের ফ্ল্যাটেই আমার বড় ভাই সপরিবারে থাকে। তাই আমার মেয়েকে তার মামির দুধ পান করাতে চাচ্ছি। এতে কোনো সমস্যা হবে কি? জানালে উপকৃত হব।
উত্তর : হাঁ, আপনার মেয়েকে তার মামির দুধ পান করাতে পারবেন। এতে অসুবিধা নেই। আর আপনার মেয়েকে তার মামির দুধ পান করালে সেই মামির সন্তানাদি তার দুধ ভাই-বোনের মত হয়ে যাবে।
প্রকাশ থাকে যে, যেহেতু দুধপানের কারণে বিবাহ ও পর্দা বিষয়ক অনেক মাসআলার সম্মুখীন হতে হয় তাই এ বিষয়গুলো বিজ্ঞ আলেম থেকে জেনে নেয়া উচিত। –কিতাবুল আছল ৪/৩৫৯; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৪/৩৬২; আলমাবসূত, সারাখসী ৫/১৩২; বাদায়েউস সানায়ে ৩/৩৯৬; রদ্দুল মুহতার ৩/২১৩

ওয়াকফ

মুহাম্মাদ নূর হোসেন আমীন
বাকেরগঞ্জ, বরিশাল
৪৪১৩ প্রশ্ন : মসজিদের বারান্দা কাকে বলে? মসজিদের অভ্যন্তরে মুসল্লিদের জায়গা সংকুলান না হওয়ায় কর্তৃপক্ষ যদি অভ্যন্তর সংলগ্ন আরো কিছু জায়গা নামাযের জন্য বাড়িয়ে নেয় তবে কি তা মূল মসজিদ ধরা হবে, না বারান্দা ধরা হবে?
উল্লেখ্য, বর্ধিত অংশগুলো মূল মসজিদের ছাদের সাথে এমনভাবে লাগানো যে, মূল ও বর্ধিত অংশ আলাদা করা যায় না এবং ঐ বর্ধিত অংশগুলোতে মূল মসজিদের কাতারের সাথে মিলে নামায আদায় করা হচ্ছে। আর মসজিদ কর্তৃপক্ষ কী উদ্দেশ্যে বর্ধিত অংশ তৈরি করেছিল, তা জানা যায় না।
যদি ঐ বর্ধিত অংশ মূল মসজিদ বলে গণ্য হয় তবে মসজিদের আদব-ইহতেরামের সমস্ত বিধানাবলী ঐ বর্ধিত অংশের উপর বর্তাবে কি না?
প্রয়োজনীয় দলীল ও ব্যাখ্যাসহকারে উত্তর প্রদান করে বাধিত করবেন।
ভাষাগত কোনো ত্রুটির ফলে বেয়াদবি হলে অনুগ্রহ করে ক্ষমা করে দিবেন।
উত্তর : মসজিদের সাথে যুক্ত বর্ধিতাংশকে বারান্দা বলা হলেও মূলত তা মসজিদের অংশবিশেষ এবং তাতে মসজিদের আদব-ইহতেরামের সকল হুকুমই প্রযোজ্য হবে। তাই ইতিকাফকারীগণও সেখানে যেতে পারবেন। তবে নির্মাণের সময়ই যদি কর্তৃপক্ষ তা মসজিদের অন্তর্ভুক্ত না করে তবে সেক্ষেত্রে ঐ বর্ধিতাংশ মসজিদের

Scanned by CamScanner

অন্তর্ভুক্ত হবে না এবং মসজিদের হুকুমও তাতে প্রযোজ্য হবে না।
উল্লেখ্য, আমাদের দেশের মসজিদগুলোতে যে বারান্দা থাকে তা সাধারণত মসজিদের অন্তর্ভুক্তই হয়ে থাকে। কারণ, নির্মাণকারীগণ তা মসজিদের বাহিরের জায়গা হিসাবে নির্মাণ করেন না। সুতরাং আপনাদের মসজিদটির বারান্দার ব্যাপারে যেহেতু ব্যতিক্রম কিছু জানা যায়নি তাই সেটিও মসজিদের অন্তর্ভুক্ত বলেই বিবেচিত হবে। –ফাতাওয়া খানিয়া ১/৬৮; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ২/৪৬২; আলবাহরুর রায়েক ১/৩৬৩; রদ্দুল মুহতার ১/৫৮৫

এলাকাবাসীর পক্ষে
হাফেজ মাওলানা আবু আহমাদ

৪৪১৪ প্রশ্ন : আমাদের এলাকার মসজিদের ছাদে একটি প্রসিদ্ধ কোম্পানী তাদের বিজ্ঞাপনের জন্য বিলবোর্ড লাগাতে চাচ্ছে। তারা বলেছে, যেহেতু মসজিদের ছাদ তাই এতে তারা কোনো ছবি ব্যবহার করবে না। আপাতত তারা পাঁচ বছরের জন্য চুক্তি করতে চাচ্ছে।
আমাদের এ মসজিদটি তিন তলা বিশিষ্ট। সাধারণত ছাদে নামায পড়ার প্রয়োজন হয় না। ঈদের সময় কখনো প্রয়োজন হয়। আর মসজিদ কর্তৃপক্ষ ও এলাকাবাসীর সিদ্ধান্ত হল, মসজিদটি তিন তলাই থাকবে, আর বাড়ানো হবে না।
আমরা এলাকাবাসী জানতে চাচ্ছি, মসজিদের ছাদে বিজ্ঞাপনের জন্য বিলবোর্ড লাগানো জায়েয হবে কি না?
মুফতী সাহেবের কাছে বিনীত নিবেদন, উপরের বিবরণকে সামনে রেখে এ বিষয়ে শরীয়তের ফায়সালা জানিয়ে বাধিত করবেন।
উত্তর : মসজিদের ছাদে বিজ্ঞাপনের জন্য বিলবোর্ড লাগানো জায়েয হবে না। কেননা, মসজিদের ছাদও মসজিদের অন্তর্ভুক্ত এবং মসজিদের মতই সম্মানিত ও মর্যাদাপূর্ণ। মসজিদের কোনো অংশ যেমনিভাবে উপার্জনের মাধ্যম বানানো যায় না তদ্রূপ ছাদের ক্ষেত্রেও একই হুকুম। –আলবাহরুর রায়েক ২/৩৪, ২৫১; আলমুহীতুল বুরহানী ৯/১২৭; ফাতাওয়া বায্যাযিয়া ৩/২৮৫; আদ্দুররুল মুখতার ৪/৩৫৮

আলী হায়দার
দক্ষিণখান, ঢাকা

৪৪১৫ প্রশ্ন : আমাদের মহল্লার মসজিদের জন্য প্রথম যে জায়গাটি ওয়াকফ করা হয়েছিল তা ছিল একদম ছোট। তাই চতুর্দিকে একেবারে আশপাশের জায়গাগুলো তখনও পর্যন্ত খালি ছিল তাই কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা ছিল পরবর্তীতে জায়গার ব্যবস্থা হলে মসজিদ সম্প্রসারণ করা হবে এবং মসজিদের জন্য অযুখানা ও টয়লেট নির্মাণ করা হবে। এখন মসজিদের দক্ষিণ পাশে রাস্তা। উত্তর ও পূর্ব পাশে যাদের জায়াগা তারা কিছুতেই জায়গা দিতে প্রস্তুত নয়। শুধু মসজিদ বরাবর পশ্চিম পাশে বর্তমান মসজিদের দ্বিগুণ একটি জায়গা একলোক ওয়াক্ফ করেছে। তাই কর্তৃপক্ষ চাচ্ছে পশ্চিমের পূর্ণ জায়গা জুড়ে মসজিদ নির্মাণ করে পূর্বদিকের যে জায়গায় বর্তমানে মসজিদ আছে তার একাংশে অযুখানা ও টয়লেট নির্মাণ করবে। জানার বিষয় হল, আগে যে জায়গা মসজিদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে সেখানে অযুখানা ও টয়লেট নির্মাণ করা জায়েয হবে কি না? অথবা পশ্চিম পাশে কিছু জায়গা খালি রেখে সেখানে অযুখানা ও টয়লেট নির্মাণ করা যাবে কি না? দয়া করে জানালে কৃতজ্ঞ হব।
উত্তর : বর্তমানে যে জায়গায় মসজিদ আছে সেখানে মসজিদ ব্যতীত অযুখানা, টয়লেট বা অন্য কিছু বানানো জায়েয হবে না। ঐ স্থানকে মসজিদ হিসেবেই রাখতে হবে। মসজিদের পশ্চিমে যে জায়গা আছে তার একাংশে অযুখানা ও টয়লেট নির্মাণ করা যাবে। চাইলে বাকি অংশে মসজিদও সম্প্রসারণ করা যাবে। এক্ষেত্রে অযুখানা ও টয়লেট এভাবে বানাতে হবে, যাতে পরিবেশ পূর্ণ পরিচ্ছন্ন থাকে এবং মুসল্লীদের কোনো কষ্ট না হয়। –ফাতাওয়া বায্যাযিয়া ৩/২৮৫; আলবাহরুর রায়েক ৫/২৫১; খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৪২৪; মাজামাউল আনহুর ২/৫৯৫; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩১৯; আদ্দুররুল মুখতার ৪/৩৫৮

মুআমালা-লেনদেন

মুহাম্মাদ মুজিবুল্লাহ
বারদোনা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম

৪৪১৬ প্রশ্ন : বাবা মারা যাওয়ার পর আমরা ওয়ারিশসূত্রে ১৮০০০/-টাকা ও ১৯ শতাংশ জমি পাই। সকল টাকা-পয়সা জায়গা-জমি ঠিক পেয়েছি। তবে একটি জমি নিয়ে আমাদের সমস্যায় পড়তে হয়, আব্বু আমাদেরকে এ ব্যাপারে কিছু বলে যাননি। তবে আমাদের এক চাচা থেকে এ ব্যাপারে জানতে পারি।
আব্বু জীবিত থাকতেই জমিটি একজনের কাছে বন্ধক দিয়ে কিছু ঋণ নিয়েছিলেন। পরে এক উপযুক্ত খরিদ্দার পেয়ে ঋণদাতার সাথে এভাবে কথা হয় যে, 'আমি অমুক তারিখের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করে দেব। আমাকে জমিটি এখনি বিক্রি করার জন্য দখলমুক্ত করে দেন।' সে এতে রাজি হয় এবং আব্বু জমিটি বিক্রি করে দেন। কিন্তু আব্বু মৃত্যুর পূর্বে ঐ ঋণ পরিশোধ করেননি। আব্বু এ ব্যাপারে কোনো অসিয়তও করে যাননি। এখন মুফতী সাহেবের কাছে আমাদের কয়েকটি বিষয় জানার আছে–
* আব্বুর এ ঋণ পরিশোধ করা আমাদের জন্য জরুরি কি না?
* ঋণ আদায় করলে আমরা জমিটির মালিক হব কি না?
* অন্যের কাছে বন্ধক রাখা অবস্থায় জমিটি বিক্রি করা আব্বুর জন্য ঠিক হয়েছে কি? এভাবে বিক্রি করা জায়েয আছে কি?
দয়া করে দ্রুত উত্তর জানাবেন। এ সমস্যার কারণে আমরা সম্পত্তি ভাগ করতে পারছি না।
উত্তর : কারো মৃত্যু হলে কাফন-দাফনের পর মিরাসি সম্পত্তি বণ্টনের পূর্বেই ওয়ারিসদের কর্তব্য হল, মৃতের ঋণ থাকলে তার রেখে যাওয়া সম্পত্তি থেকে আগে তা আদায় করা। এরপর বৈধ কোনো অসিয়ত থাকলে বাকি সম্পদের এক তৃতীয়াংশ থেকে তা পূরণ করা। ঋণ আদায় ও অসিয়ত পূরণের পরেই অবশিষ্ট সম্পদ ওয়ারিসদের মাঝে বণ্টন করতে হয়।
অতএব, প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে আপনাদের পিতা মৃত্যুর পূর্বে বন্ধকী জমি সংক্রান্ত উক্ত ঋণ আদায়ের জন্য কোনো অসিয়ত না করলেও এ ব্যাপারে অবগত হওয়ার পর সকল ওয়ারিসের কর্তব্য হয়ে গেছে এজমালী সম্পদ থেকে এ ঋণ আদায় করে দেওয়া। আর আপনাদের পিতা বন্ধকী জমিটি ঋণদাতার সম্মতিতেই যেহেতু অন্যের কাছে বিক্রি করেছেন তাই তার ঐ বিক্রি সহীহ হয়েছে এবং ক্রেতা ঐ জমির মালিক হয়ে গেছে। এই জমিতে আপনাদের কোনো মালিকানা ও অধিকার নেই। পিতার ঋণ আদায় করে দেওয়া আপনাদের কর্তব্য। তবে এ কারণে আপনারা এই জমির মালিক হবেন না। –মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা, মাদ্দা ৭৪৭, ৭৩৪; তাবয়ীনুল হাকায়েক ৭/১৮০; আদ্দুররুল মুখতার ৬/৫০৮, ৭৫৯; শরহুল মাজাল্লাহ, আতাসী ৩/১৮৯

Scanned by CamScanner

সা'দ বিন আবু বকর
ওয়েব থেকে প্রাপ্ত

৪৪১৭ প্রশ্ন : আমি আমার এক বন্ধুকে এক লক্ষ টাকা নিম্নোক্ত শর্তাবলীতে ব্যবসা করার জন্য দিয়েছি।

১. লোকসান হলে আমার।

২. যদি লাভ হয় তবে মূল টাকার ১৮%-২৩% লাভ দিতে হবে।

পরবর্তীতে জানতে পেরেছি, এরূপ ব্যবসায়িক চুক্তি বৈধ নয়। তাই হযরতের কাছে জিজ্ঞাসা, এ ব্যবসা থেকে অন্য কোনো পদ্ধতিতে লাভ নেওয়া যাবে কি না? কারণ, এক বছর ইতিমধ্যেই শেষ। আর বন্ধু জোর করছে টাকা নেওয়ার জন্য। যদি সে সন্তুষ্ট হয়ে কিছু লাভ দেয় তা গ্রহণ করা হারাম হবে কি না? জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে 'মূল টাকার ১৮%-২৩% লাভ দিতে হবে' এই শর্ত নাজায়েয হয়েছে। এর কারণে আপনাদের পুরো চুক্তিই ফাসেদ হয়ে গেছে। কেননা, মূল এক লক্ষ টাকার শতকরা ১৮%-২৩% হল ১৮০০-২৩০০ টাকা। আর এভাবে নির্দিষ্ট অংক লাভ হিসেবে নির্ধারণ করা সুদের অন্তর্ভুক্ত, যা সম্পূর্ণ হারাম। এখন যেহেতু আপনাদের চুক্তিটি ফাসেদ হয়েছে তাই আপনার বিনিয়োগকৃত এক লক্ষ টাকার উপর অর্জিত পূর্ণ মুনাফা আপনি পাবেন। আর আপনার বন্ধুকে এক বছর ব্যবসা পরিচালনার জন্য ন্যায্য পারিশ্রমিক দিবেন। আর ভবিষ্যতে তার সাথে কারবার করতে চাইলে চুক্তিটি এভাবে সংশোধন করে নিতে পারেন যে, সে আপনার টাকা দিয়ে ব্যবসা করবে। এরপর যদি ব্যবসায় লাভ হয় তবে লাভের এত ভাগ আপনি পাবেন এবং এত ভাগ সে পাবে (যেমন ৫০%-৫০% অথবা ৬০%-৪০%)

এছাড়া দু'জনের সমঝোতায় শতকরা হিসেবে লাভের যে কোনো হার নির্ধারণ করতে পারেন। –কিতাবুল আছল ৪/১২৯; আলমাবসূত, সারাখসী ২২/২৭; আলমুহীতুল বুরহানী ১৮/১২৬; মাজমাউল আনহুর ৩/৪৪৬; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৪/২৮৮; রদ্দুল মুহতার ৫/৬৪৮

মুহাম্মাদ হেফাযুদ্দীন
মগনামা, পেকুয়া, কক্সবাজার

৪৪১৮ প্রশ্ন : একটি পুকুরে কয়েকজন অংশীদার। সবাই অংশ হিসেবে এতে খরচ দিয়ে মাছ চাষ করে আসছিলো। কিন্তু বর্তমান পরস্পর সম্পর্কের অবনতির কারণে কিছু অংশীদার এতে মাছ চাষ করতে সম্মত নয়। আর কয়েকজন এতে মাছ চাষ করে। আর যারা মাছ চাষ করতে সম্মত নয় তাদেরকে মাছের অংশ দিয়ে থাকে। কিন্তু তারা উক্ত মাছ গ্রহণ করে না। ফিরিয়ে দেয়। তারা ফেরৎ দেওয়া মাছ এলাকার গরীব-মিসকীনকে দিয়ে দেয়।

জানার বিষয় হল, শরীকি পুকুরে এভাবে মাছ চাষ করা এবং ফেরৎ দেওয়া মাছ গরীব-মিসকীনকে দেওয়া জায়েয আছে কি না? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : শরীকি পুকুরে মাছ চাষ করতে হলে সকল অংশীদারের সম্মতি প্রয়োজন। যদি অংশীদারদের কেউ মাছ চাষে অসম্মতি জানায় এবং অন্য অংশীদারগণ মাছ চাষ করতে আগ্রহী হয় তাহলে নিম্নের কোনো একটি পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে।

১. যে শরীকগণ মাছ চাষে আগ্রহী তারা মাছ চাষে অনিচ্ছুক অংশীদারদের থেকে তাদের অংশ একটি নির্ধারিত মেয়াদের জন্য ভাড়া নিবে এবং উভয় পক্ষের আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারিত ভাড়া তাদেরকে প্রদান করবে। এক্ষেত্রে মাছ চাষকারীগণ উৎপাদিত সকল মাছের মালিক হবে। আর মাছ চাষে অনিচ্ছুকগণ তাদের অংশের নির্ধারিত ভাড়া পাবে।

২. উভয় পক্ষ আলোচনা করে একটি সমঝোতা চুক্তি করতে পারে, যার মাধ্যমে একপক্ষ একটি মেয়াদের জন্য (যেমন, এক বছর/ দুই বছর/ পাঁচ বছর) ব্যবহার করবে। অপরপক্ষ পরবর্তী মেয়াদের জন্য তা ব্যবহার করবে। এভাবে মাছ চাষে ইচ্ছুক অংশীদারগণ তাদের মেয়াদের মধ্যে মাছ চাষ করতে পারবে।

উল্লেখ্য যে, প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে কিছু অংশীদার কর্তৃক ফেরৎ দেওয়া মাছ দান করে দেওয়া দূষণীয় হয়নি। –খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৩/১০৯; মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা, মাদ্দা ৪২৯, ১১৭৮; শরহুল মাজাল্লাহ, আতাসী ২/৪৯৩, ৪/১২২

মুহাম্মাদ মোস্তফা কামাল
মোহাম্মাদপুর, ঢাকা

৪৪১৯ প্রশ্ন : মোহাম্মাদপুর টাউন হলে আমার একটি দোকান আছে। আমার এক বন্ধু দোকানটি এভাবে ভাড়া নিতে চাচ্ছে যে, সে এখানে ব্যবসা করবে। যা লাভ হবে তার ২০% আমাকে দিবে। কোনো সিকিউরিটি মানি বা অ্যাডভান্স দিবে না। জানতে চাই, এভাবে দোকান বাবদ লাভ নেওয়া সহীহ আছে কি না?

উত্তর : প্রশ্নোক্ত চুক্তিতে দোকান ভাড়া দেওয়া জায়েয হবে না। লাভের একটি অংশ ভাড়া হিসেবে দেওয়ার শর্তে চুক্তি করা সহীহ নয়। এক্ষেত্রে সঠিক পদ্ধতি হল, দোকানের ভাড়ার পরিমাণ নির্ধারিত করে নেওয়া। যেন ভাড়াগ্রহীতার লাভ কম হোক বা বেশি দোকানের ভাড়া নির্ধারিতই থাকে। –আলবাহরুর রায়েক ৫/১৮১; আদ্দুররুল মুখতার ৬/৫; আলমুহীতুল বুরহানী ১১/৩৩৪; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৪/৪৪৫

খালেদ সাইফুল্লাহ
পাবনা

৪৪২০ প্রশ্ন : আমি একজন ব্যবসায়ী। আমার নীতি হল, সবসময় ব্যবসার লাভের ২% মসজিদ-মাদরাসায় এবং ৩% গরিব-মিসকীনদের দান করে থাকি। বিভিন্ন সময় আমি অন্যদের থেকেও নির্দিষ্ট হারে লাভ প্রদানের চুক্তিতে বিনিয়োগ গ্রহণ করে থাকি। তাদেরকেও বিষয়টি জানিয়ে দেই যে, মোট লাভ থেকে উক্ত অংশ বাদ দিয়েই লাভ বণ্টন হবে। মুফতী সাহেবের কাছে নিবেদন, এভাবে চুক্তি করতে কোনো সমস্যা আছে কি?

উত্তর : নিজের লভ্যাংশ থেকে সদকা দেওয়া বড় সৌভাগ্য ও সওয়াবের কাজ। কিন্তু বিনিয়োগকারীদের লভ্যাংশ থেকে মসজিদ-মাদরাসা ও গরীব-মিসকীনদেরকে দেওয়ার শর্ত করা সহীহ নয়। যদি এমন শর্ত করাও হয় তবে তা ফাসেদ হবে। তাই বিনিয়োগকারীদের উপর এ শর্ত চাপানো যাবে না। আর এ শর্তে চুক্তি হলেও বিনিয়োগকারীগণ উক্ত অংশ সদকা করতে বাধ্য নন। বরং তারা পরবর্তীতে তাদের লভ্যাংশের পুরোটাই দাবি করতে পারেন। –ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৪/২৮৯; আদ্দুররুল মুখতার ৫/৬৫৪; দুররুল হুক্কাম ৩/৪৩৫

সাইফ সিরাজ
ময়মনসিংহ

৪৪২১ প্রশ্ন : আমার বাবার টিনের ব্যবসা আছে। অনেকদিন থেকেই তিনি ব্যবসা করেন। ব্যবসার সম্পূর্ণ পুঁজি তার একারই। আমরা দু'ভাই বড় হওয়ার পর তিনি আমাদেরকেও ব্যবসায় লাগিয়েছেন। এখন আমরা সবাই মিলে ব্যবসা দেখাশোনা করি। আমরা দুজনই বিবাহিত। বাবা-মায়ের সাথে আমাদের সবার যৌথ সংসার। ইদানিং কোনো কারণে বড় ভাইয়ের সাথে আমার মিল হচ্ছে না। তাই চাচ্ছি, পৃথক হয়ে অন্য কোনো ব্যবসা করব। আমি গত সাত বছর দোকানে খেটেছি। এ সময়ে যখন যে প্রয়োজন দেখা দিয়েছে বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়ে তা পূরণ করেছি। জানার বিষয়

Scanned by CamScanner

হল, উক্ত দীর্ঘ সময়ের খাটনি বাবদ আমি কি কোনো প্রাপ্য বা ব্যবসার কোনো অংশের মালিকানা দাবি করতে পারব? দয়া করে জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে বাবার ব্যবসায় সম্পৃক্ততার সময় যেহেতু আপনাদের শ্রমের বিনিময়ে মাসিক বা বাৎসরিক কোনো বেতন বা ব্যবসায় আপনাদের অংশীদার হওয়ার কোনো চুক্তি হয়নি তাই আপনি এ ব্যবসা থেকে কোনো পারিশ্রমিক বা অংশ দাবি করতে পারবেন না। ব্যবসাটির সম্পূর্ণ মালিক আপনার বাবা। আপনারা দু'ভাই তার পরিবারভুক্ত ও তার সহযোগী মাত্র।

উল্লেখ্য, সন্তানেরা যদিও ব্যবসা থেকে কোনো অংশ বা পারিশ্রমিক দাবি করতে পারবে না তবুও বাবার উচিত, তারা যেহেতু দীর্ঘ সময় ব্যবসায় শ্রম দিয়েছে তাই তাদেরকে একেবারে বঞ্চিত না করা। বরং তাদেরকে এমন কিছু দেওয়া যেন তারা খুশি হয়। –মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা, মাদ্দা ১৩৯৮; রদ্দুল মুহতার ৪/৩২৫; তানকীহুল ফাতাওয়াল হামিদিয়্যা ২/১৭; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ২/৩২৯

নাসীরুদ্দীন
নরসিংদী

৪৪২২ প্রশ্ন : আমার একটি স'মিল আছে। এটাতে আমি বিভিন্ন লোকের অর্ডার নিয়ে তাদের গাছ চিড়ে দেই। সাধারণত মালিক নিজে গাছ নিয়ে আসে না। বরং কর্মচারির মাধ্যমে গাছ আনা-নেওয়া করে। তাই সবাইকে চিনে রাখা সম্ভব হয় না। গত কয়েক মাস থেকে কার যেন দুটি গাছ মিলে পড়ে আছে। এগুলোকে চিড়া হয়েছে। কেউ এগুলো নিতেও আসছে না এবং এগুলোর খোঁজও নিচ্ছে না। গাছগুলো দোকানে সংরক্ষণ করতে অসুবিধা হচ্ছে। তাই জানতে চাই, এক্ষেত্রে আমার কী করণীয়? দয়া করে জানালে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর : প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে আপনার কর্তব্য হল, গাছ দুটির মালিকের যথাসাধ্য খোঁজ লাগানো এবং যারা সাধারণত আপনার মিলে গাছ চিড়তে আসে তাদেরকে জিজ্ঞেস করা। যদি কেউ উপযুক্ত প্রমাণসহ গাছগুলো দাবি করে তাহলে তাকে সেগুলো দিয়ে দিবেন। আর যদি যথাযথ খোঁজ করার পরও মালিকের সন্ধান পাওয়া না যায় এবং সামনেও পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকে তাহলে কাঠগুলো বিক্রি করে আপনার গাছ চিড়ার মজুরি রেখে বাকি টাকা মালিকের পক্ষ থেকে কোনো দরিদ্রকে সদকা করে দিবেন। আর ভবিষ্যতে এ সমস্যা থেকে বাঁচার জন্য যারা গাছ রেখে যায় তাদের নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর লিখে রাখবেন। –আলমাবসূত, সারাখসী ১১/৩; বাদায়েউস সানায়ে ৫/২৯৮; আলবাহরুর রায়েক ৫/১৫২; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ২/২৮৯

হেবা-মীরাস

মামুনুর রহমান
কালীস্থান বাজার, লালমনিরহাট

৪৪২৩ প্রশ্ন : আমার বড় ভাই তার স্ত্রীর জীবদ্দশায় আপন শ্যালিকাকে বিয়ে করে ঢাকায় চলে যায়। গত পাঁচ মাস পূর্বে ঐ ভাই সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। এরপর পারিবারিকভাবে 'সমঝোতার মাধ্যমে তাদেরকে গ্রামের বাড়িতে আনা হয়।

ভাইয়ের আগের সংসারে দুই ছেলে এবং এক মেয়ে সন্তান রয়েছে। আমাদের আব্বা-আম্মা অনেক আগেই ইন্তেকাল করেছেন। এখন আমরা চাচ্ছি, তাদের মাঝে বড় ভাইয়ের সম্পত্তি বণ্টন করে দিতে। আমাদের একজন হুযূর আত্মীয় বললেন, দ্বিতীয় স্ত্রী সম্পত্তি থেকে কোনো অংশ পাবে না।

মুহতারামের নিকট বিষয়টির সঠিক সমাধান কামনা করছি। সাথে সাথে তাদের সম্পত্তির বণ্টন-হিসাবও জানতে চাচ্ছি।

উত্তর : প্রশ্নোক্ত অবস্থায় মৃতের কথিত দ্বিতীয় স্ত্রী মীরাস পাবে না। শরীয়তের দৃষ্টিতে সে তো মৃতের স্ত্রীই নয়। কেননা স্ত্রী বিবাহ বন্ধনে থাকাবস্থায় তার সহোদরা বোনকে বিবাহ করা হারাম। কুরআনুল কারীমে সুস্পষ্টভাবে তা নিষেধ করা হয়েছে। তবে দ্বিতীয় জনের সাথে বিবাহ হারাম হলেও যেহেতু বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে তাদের মাঝে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে তাই সে মহরের অধিকারী হবে। অতএব মহর আদায় না হয়ে থাকলে মীরাস থেকে প্রথমে মহর আদায় করে দিতে হবে। তবে সে ধার্যকৃত মহর ও মহরে মিছিলের মধ্যে যেটা কম সেটা পাবে।

আপনার ভাইয়ের সম্পত্তি বণ্টনের আগে তার কোনো ঋণ থাকলে তার মালিকানাধীন সমুদয় সম্পত্তি থেকে প্রথমে তা আদায় করতে হবে। অতপর তার কোনো বৈধ অসিয়ত থাকলে অবশিষ্ট সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ দ্বারা তা আদায় করতে হবে। অতপর তার রেখে যাওয়া স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি জীবিত ওয়ারিশদের মাঝে নিম্নে বর্ণিত শতকরা হারে বণ্টিত হবে।

ক. স্ত্রী ১২.৫%
খ. দুই ছেলে প্রত্যেকে ৩৫% করে।
গ. মেয়ে ১৭.৫%। –সূরা নিসা (৪) : ২৩; আহকামুল কুরআন, জাস্‌সাস ২/১৩০; কিতাবুল আছল ১০/১৮২; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৭৭; বাদায়েউস সানায়ে ২/৬১৫, ৫৪০; আলবাহরুর রায়েক ৩/১৬৯

বিবিধ

মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ
রূপনগর, মিরপুর, ঢাকা

৪৪২৪ প্রশ্ন : আমাদের মাদরাসায় ক'দিন আগে এক লোক অনেকগুলো ব্রয়লার মুরগী দিয়েছে। সে এগুলো বাজার থেকে ড্রেসিং করে এনেছে। মাদরাসা কর্তৃপক্ষ এ নিয়ে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। কেউ বলছে, এগুলো খাওয়া যাবে। কিন্তু আবার অনেকে বলছে ড্রেসিং করা জায়েয নেই। এগুলো খাওয়া মাকরূহে তাহরীমী। এ নিয়ে বেশ মতভেদ চলছে। আপাতত এগুলো ফ্রিজে রেখে দেয়া হয়েছে।

এখন আপনার কাছে জানতে চাই, বর্তমানে আমাদের দেশে প্রচলিত মুরগী ড্রেসিং করার পদ্ধতিটি কি শরীয়তসম্মত? ড্রেসিং করা মুরগী খাওয়া যাবে কি? দ্রুত উত্তর জানালে উপকৃত হব। আল্লাহ তাআলা আপনাদের উত্তম বিনিময় দান করুন– আমীন।

উত্তর : দোকানগুলোতে সাধারণত যে পদ্ধতিতে মুরগী ড্রেসিং করা হয় তাতে ঐ মুরগীর গোশত খাওয়া নাজায়েয বা মাকরূহ হয়ে যায় না। কারণ, এক্ষেত্রে মুরগী গরম পানিতে যতটুকু সময় চুবিয়ে রাখা হয় এতে মুরগীর ভেতরের নাপাকীর প্রভাব গোশতে পৌঁছে না। বরং এর দ্বারা শুধু লোমকূপগুলো ঢিলা ও নরম হয়ে যায়। অবশ্য যদি এত বেশি সময় তপ্ত গরম পানিতে মুরগী চুবিয়ে রাখা হয়, যার ফলে নাপাকীর প্রভাব ও গন্ধ গোশতের ভেতর চলে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে ঐ মুরগীর গোশত খাওয়া নাজায়েয হয়ে যাবে। আর যেসব মুরগী সাধারণ নিয়মে ড্রেসিং করা হয় (অর্থাৎ অধিক সময় ফুটন্ত পানিতে চুবিয়ে রাখা হয় না) সেগুলোও রান্না করার পূর্বে ভালোভাবে ধুয়ে পাক

Scanned by CamScanner

করে নেওয়া জরুরি।
উল্লেখ্য, ড্রেসিংয়ের প্রচলিত পদ্ধতি কিছুটা সংশোধনযোগ্য। এতে আপত্তিকর বিষয় রয়েছে। –ফাতহুল কাদীর ১/১৮৬; আলবাহরুর রায়েক ১/২৩৯; মাজমাউল আনহুর ১/৯১; রদ্দুল মুহতার ১/৩৩৪

কুরআন-উলূমুল কুরআন

মসজিদ কর্তৃপক্ষের পক্ষে
মাওলানা আবু আহমাদ

৪৪২৫ প্রশ্ন : আমাদের মহল্লার মসজিদে কুরআন মাজীদের অনেক পুরনো কপি জমা হয়ে গেছে, যেগুলো পড়া যায় না। এখন সেগুলোর ব্যাপারে কী করণীয় তা নিয়ে মসজিদ কর্তৃপক্ষের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিয়েছে। অনেকে মৌখিকভাবে বিভিন্ন আলেম থেকে বিভিন্ন ধরনের মাসআলাও নিয়ে এসেছে। তাই মসজিদ কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে আমরা এ ব্যাপারে সঠিক সমাধান জানতে চাচ্ছি।
মুফতী সাহেবের কাছে বিনীত নিবেদন, এ বিষয়ে দলীল-প্রমাণসহ লিখিত ফতোয়া প্রদান করে আমাদেরকে উপকৃত করবেন। আল্লাহ আপনাদেরকে উত্তম বিনিময় দান করুন– আমীন।
উত্তর : কুরআন মাজীদের পুরনো কপি যদি পড়ার অনুপযুক্ত হয়ে যায় তাহলে সম্ভব হলে পবিত্র কোনো কিছুতে রেখে কোনো স্থানে তা হেফাযত করে রাখবে। আর এভাবে হেফাযত করা কষ্টকর হলে তা পরিষ্কার ও পবিত্র কাপড়ে পেঁচিয়ে এমন স্থানে দাফন করে দিবে, যেখানে সাধারণত মানুষ চলাচল করে না।
অথবা প্রবহমান পরিষ্কার পানিতে ভারী কোনো বস্তুর সাথে বেঁধে ডুবিয়ে দিবে। এর মাঝে যে কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে। –আলমুহীতুল বুরহানী ৮/১০; আলবেনায়া ১৪/৫৮০; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১৮/৬৮; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩২৩; আদ্দুররুল মুখতার ৬/৪২২

আবু বকর ছিদ্দীক
আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ

৪৪২৬ প্রশ্ন : কখনো কুরআন শরীফের সাথে অসম্মানের আচরণ হয়ে গেলে অথবা তিলাওয়াতের আগে-পরে স্বাভাবিকভাবে আমরা কুরআনে চুমু দেই, চোখে লাগাই। জানতে চাই, এটি শরীয়তসম্মত কি না? কেউ কেউ এটি করতে দেখলে নিষেধ করে। মেহেরবানী করে জানালে উপকৃত হব।
উত্তর : কুরআনে কারীম চুমু দেওয়া জায়েয আছে। ইকরিমা রা. থেকে কুরআনে কারীম চেহারায় লাগানো ও চুমু দেওয়া প্রমাণিত আছে। –সুনানে দারিমী, হাদীস ৩৩৫৩
তাই কেউ কুরআনে কারীমে চুমু দিলে তাকে বারণ করার প্রয়োজন নেই।
উল্লেখ্য, অসতর্কতাবশত কুরআন মাজীদের সাথে অসম্মানজনক কিছু হয়ে গেলে সেক্ষেত্রেও চুমু দিতে নিষেধ নেই। তবে তখন মূল করণীয় হল অসতর্কতার কারণে লজ্জিত হওয়া এবং তওবা-ইস্তিগফার করা। –মাজমাউয যাওয়াইদ, হাদীস ১৬০৪৯; আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩৮৪; হাশিয়াতুত তাহতাবী আলাল মারাকী পৃ. ১৭৫; ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪/৬০ ●

খোদার সাথে ...

(০৮ পৃষ্ঠার পর)

পরীক্ষা-নিরীক্ষার দায়িত্ব অর্পিত। এমনকি ভার্সিটির ভিসি মহোদয়গণ পর্যন্ত 'তারকা-রাজ্যে অভিযান পরিচালনায়' পারঙ্গম।

স্টিফেন হকিং ভাগ্যের শাসনে বিশ্বাসীদের বিদ্রূপ করেছেন। তার মতে, যারা বিশ্বাস করেন যে, যা হওয়ার তা হবেই তারাও সড়ক পাড়ি দেয়ার সময় প্রথমে ডানে বামে দেখে নেন।

স্টিফেন হকিংয়ের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়নি। দু'জনের ব্যস্ততাই এর কারণ। কখনো সাক্ষাৎ হলে যে প্রশ্নটি তাকে করতাম তা হচ্ছে, চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত অনুসারে তো আপনার মাত্র কয়েক বছর বেঁচে থাকার কথা।[২] কিন্তু এই নিয়মের ব্যত্যয় কে ঘটিয়ে দিলেন, যার ফলে আপনি বেঁচে রইলেন ৭৬ বছর।

স্টিফেন হকিং সম্ভবত এই প্রশ্নের উত্তর ইতিমধ্যে পেয়ে গেছেন।

(Jang.com.pk থেকে গৃহীত
অনুবাদে : ইবনে নসীব)

[২] মাত্র বাইশ বছর বয়সে বিরল রোগ মোটর নিউরনে আক্রান্ত হন। তিনি বড় জোর কয়েক বছর বাঁচবেন বলে সে সময় চিকিৎসকেরা জানিয়ে দিয়েছিলেন।

দৃষ্টি আকর্ষণ

সম্মানিত গ্রাহক-এজেন্ট!

* রমযানে কোনো কোনো গ্রাহক-এজেন্টের ঠিকানা বদল হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে শাবান মাসের মধ্যেই বিতরণ বিভাগকে জানানোর অনুরোধ রইল।

* অনেক সময় ব্যস্ততার কারণে ফোন ধরা সম্ভব হয় না। তখন এসএমএস করুন।

ভূমি জরিপ
ফারায়েজ, ইসলামিক ভূগোল ও মানচিত্র কোর্স
স্থানঃ সিদলা ফয়জুল উলুম মাদ্‌রাসা বলাখাল, হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর।
মোবাইল: ০১৮৭২-৫১৬১৭৭
কোর্সের সময় ১৫শাবান থেকে ২৯ শে শাবান
কোর্স ফি ঃ ২০০/-
ঃ প্রশিক্ষক ঃ
মুফতী আহমাদুল্লাহ
বিঃ দ্রঃ-সরকারী সার্টিফিকেট গ্রহনের সুযোগ থাকবে

জামি'আ ইসলামিয়া দারুল উলূম ঢাকা
মসজিদুল আকবার কমপ্লেক্স, মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬।
নিম্নোক্ত বিভাগ সমূহে সীমিত সংখ্যক তালিবুল ইলমকে ভর্তি করা হবে ঃ
➪ইবতেদায়ী-দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত।
➪আত্‌তাখাস্‌সুস ফী উলূমিল হাদীস। [২ বছর]
➪কিসমুল আদাবিল আরাবী। [১ বছর]
➪আদর্শ নূরানী বিভাগ
➪নৈশকালীন বয়স্ক দ্বীনী শিক্ষা বিভাগ
➪আত্‌তাখাস্‌সুস ফিল ফিকহি ওয়াল ইফতা। [২ বছর]
➪আত্‌তাখাস্‌সুস ফী উলূমিল কুরআন। [২ বছর]
➪আত্‌তাখাস্‌সুস ফিস্ সীরাতি ওয়াত্ তারীখ। [২ বছর]
➪তাহফীযুল কুরআন বিভাগ
ভর্তি বিজ্ঞপ্তি
তাখাস্‌সুসাতে ভর্তির নিয়মাবলী
সকল তাখাস্‌সুসাতে ভর্তি পরীক্ষার তারিখঃ ৫ শাওয়াল (লিখিত), ৬ শাওয়াল (মৌখিক)
ভর্তি পরীক্ষা (লিখিত) ইফতা বিভাগের হিদায়া ৩য় খন্ড ও নূরুল আনওয়ার কিতাবুল্লাহ, তাফসীর বিভাগে আল ফাওযুল কাবীর ও বায়যাবী শরীফ- সূরা বাক্বারা, উলূমুল হাদীস বিভাগে শরহু নুখবাতিল ফিকার ও বুখারী শরীফ ১ম খন্ড, আদব বিভাগে আল মাক্বামাতুল হারিরিয়্যাহ ও বুখারী শরীফ ২য় খন্ড, সীরাত ও তারীখ বিভাগে খিলাফতে রাশেদা ও শামায়েলে তিরমিযী থেকে নেয়া হবে।
তাখাস্‌সুসাতে ভর্তি ইচ্ছুককে দাওরায়ে হাদীসে অবশ্যই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হতে হবে।
সবক উদ্বোধন ও দরস শুরু ঃ ১৪ শাওয়াল ১৪৩৯ হিজরী
মোবাইল নম্বর ঃ
০১৭১১-১৫৩০২৯, ০১৬৮৮-৩৯৯৭২৬
কর্তৃপক্ষ
জামি'আ ইসলামিয়া দারুল উলূম ঢাকা
যাতায়াত ঃ মিরপুর ১নং বাসস্ট্যান্ড থেকে সামান্য উত্তর দিকে ই-ব্লক পানির ট্যাংকি সংলগ্ন

Scanned by CamScanner

সেই দিনকে ভয় কর, যেদিন...

(০৭ পৃষ্ঠার পর)

দ্বিতীয় পর্বে যখন আল্লাহ তাআলা আমার অন্তরে ঈমান দান করলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলাম এবং আরজ করলাম–

ابْسُطْ يَمِينَكَ فَلْأُبَايِعْكَ.

আপনার হাত আগান, আমি আপনার হাতে বাইয়াত হব। তিনি হাত বাড়ালেন। কিন্তু তিনি যখন হাত বাড়ালেন আমি হাত গুটিয়ে নিলাম। তিনি প্রশ্ন করলেন–

مَا لَكَ يَا عَمْرُو

কী হল আমর!

আমি বললাম– أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ

আমি একটি শর্ত করতে চাই।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন– تَشْتَرِطُ بِمَاذَا؟

কী শর্ত?

আমি বললাম– أَنْ يُغْفَرَ لِي

আমাকে যেন মার্জনা করা হয়।[৩]

তিনি বললেন–

أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا؟ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟

তুমি কি জানো না, ইসলাম অতীতের সবকিছু নিশ্চিহ্ন করে দেয়? তেমনি হিজরতও অতীত বিষয়াদি নিশ্চিহ্ন করে? হজ্বও পূর্বের যা কিছু তা নিশ্চিহ্ন করে?

এরপর অবস্থা এই হল যে, আমার কাছে আল্লাহর রাসূলের চেয়ে বেশি প্রিয় ও আমার চোখে তাঁর চেয়ে বেশি মর্যাদার আর কেউ ছিল না। তাঁর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার কারণে আমি দুচোখ ভরে তাঁর দিকে তাকাতেও পারতাম না। আমার কাছে তাঁর চেহারা-সূরতের বৃত্তান্ত চাওয়া হলে আমি তা দিতে পারব না। কারণ, তাঁকে আমি দুচোখ ভরে কখনো দেখিনি। (হায়!) এই অবস্থায় যদি আমার মৃত্যু হত আমার প্রত্যাশা আমি জান্নাতী হতাম।

তৃতীয় পর্ব হচ্ছে যখন আমরা নানা দায়িত্বভার গ্রহণ করেছি। জানি না সেসবে আমার অবস্থা কী![৪] (তাহলে কীভাবে আমি নির্ভয় হই?)

শোনো! আমি যখন মারা যাব তখন যেন কোনো বিলাপকারিণী বা অগ্নি আমার সহচর না হয়। এরপর যখন আমাকে কবরে শোয়াবে তখন ধীরে ধীরে আমার উপর মাটি দিও। এরপর আমার কবরের পাশে এইটুকু সময় অপেক্ষা করো, যে সময় একটি উট-জবাই করে তার গোশ্ত বণ্টন করতে লাগে। যেন তোমাদের উপস্থিতিতে আমার একাকিত্ব দূর হয় আর আমি আমার রবের দূতের প্রশ্নের জবাব গুছিয়ে নিতে পারি। –সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, হাদীস ১২১

৩. এই শর্তারোপ থেকে বোঝা যায়, বিগত জীবন সম্পর্কে তাঁর মনে কীরূপ খোদাভীতি ও অনুতাপ সৃষ্টি হয়েছিল। আমর ইবনুল আস ও তাঁর মতো কঠিন মানুষগুলোর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে এভাবে মোমের মত বিগলিত হয়ে যাওয়া চিন্তা-ভাবনার অনেক বড় অনুষঙ্গ। ইসলাম ও ইসলামের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যতাই আল্লাহর ইচ্ছায় এদেরকে তাঁর প্রতি সমর্পিত হতে বাধ্য করেছিল।

৪. এই হচ্ছে প্রকৃত মুমিনের অবস্থা। ভয় ও প্রত্যাশার মাঝে তার অবস্থান।

এখানে আরো আছে জীবন ও কর্মের মূল্যায়নের এক জীবন্ত নমুনা। ঈমানদারের কর্তব্য, নিজের কর্ম ও জীবনের মূল্যায়ন ও মুহাসাবা জারি রাখা। মাঝে মাঝে এই চিন্তা করা যে, আমি যে অবস্থায় আছি এই অবস্থায় আমার মৃত্যু হলে আমার গন্তব্য কী হবে? ঠিকানা কোথায় হবে?

বিশেষত আপন ঈমান-আকীদার হালপুরসী করা প্রয়োজন– কী অবস্থায় সে আছে। তেমনি আমল ও কৃতকর্ম সম্পর্কেও চিন্তা-ভাবনা করা প্রয়োজন। কারণ–

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی
یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے

কর্মের দ্বারাই জীবন গঠিত হয়। জান্নাত বা জাহান্নামের উপযুক্ততা নির্ধারিত হয়। এই মাটির মানুষ তো সত্তাগতভাবে আলোরও নয়, আগুনেরও নয়।

সাহাবী হযরত আমর ইবনুল আস রা.-এর বাক্যটি এ সত্যেরও ঘোষক যে, দায়িত্বভার গ্রহণ শুধু আনন্দের ব্যাপার নয়, ভয়েরও ব্যাপার। যার দায়িত্ব কম তার জবাবদিহিতা কম, যার দায়িত্ব বেশি তার জবাবদিহিতাও বেশি। সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীলদের কর্তব্য, এই কঠিন সত্যকে উপলব্ধি করা। ঈমান-আকীদার দুরস্তির পর একজন সাধারণ মুসলিমের জন্য যতটুকু ইবাদত-আমল যথেষ্ট হয় সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্ববহুল পদে অধিষ্ঠিতদের জন্য কখনো ঐটুকু যথেষ্ট নয়। তাদেরকে স্ব স্ব পদের দায়িত্ব-কর্তব্যও পালন করতে হবে। তারা একান্তে ভেবে দেখতে পারেন, যে গুরুভার তাদের উপর অর্পিত হয়েছে সে সম্পর্কে তারা কতটুকু সচেতন এবং এর জবাবদিহিতার জন্য কী প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন।

জামিআ ইসলামিয়া ঢাকা

ইফতা বিভাগ
শিক্ষাকাল : ২ বছর
শিক্ষাকাল : ১ বছর

ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য

আবেদনকারীকে অবশ্যই দাওরায়ে হাদীসে উত্তীর্ণ ও যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হবে।

মৌখিক পরীক্ষা : হিদায়া ৩য় খণ্ড ও নূরুল আনওয়ার কিতাবুল্লাহ।

লিখিত পরীক্ষা : হিদায়া ৩য় খণ্ড ও নূরুল আনওয়ার কিতাবুল্লাহ।

ফরম বিতরণ : ১ রমযান থেকে শুরু।

ভর্তি পরীক্ষা : ৫ শাওয়াল থেকে।

কিতাব বিভাগের প্রতিটি শ্রেণিতে জেনারেল সাবজেক্ট আছে।

ভর্তি চলছে

চলমান বিভাগসমূহ

- নূরানী ও মকতব বিভাগ।
- নাযিরা বিভাগ।
- হিফজুল কুরআন বিভাগ।
- কিতাব বিভাগ : জালালাইন পর্যন্ত।
- ইফতা বিভাগ : এক ও দুই বছর মেয়াদী।

মজুমদার কমপ্লেক্স, ডেমরা রোড (কাজলা ব্রীজ মসজিদ সংলগ্ন), যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।
০১৭৭৬-২৭ ২৫ ২৭, ০১৯৩৩- ৩১ ২৬ ২৯, ০১৯১৯- ৮১ ৮১ ১৭
যাতায়াত : যাত্রাবাড়ী মোড় থেকে ডেমরা রোডে বেফাকের আগে কাজলা ব্রীজ মসজিদ সংলগ্ন।

আরজগুজার
মুফতী মুঈনুল ইসলাম
প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল ও রেক্টর, জামিআ

Scanned by CamScanner

مـــدرســـة التســنيــم

মাদরাসাতুত তাসনীম

মাদরাসাতুত তাসনীম থেকে আরবী-পত্রিকা 'আল মাফায' নিয়মিত বের হচ্ছে

আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে

ভর্তির নিয়মাবলি

১ ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের অবশ্যই দাওরা হাদীসে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হতে হবে।

২ লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হবে ৫ই শাওয়াল ১৪৩৯ হিঃ। (বুখারী শরীফ- ১ম খণ্ড ও আল কেরাতুর রাশেদা- ২য় খণ্ড।)

৩ মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হবে ৬ই শাওয়াল।

আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে
খণ্ডকালিন দরস প্রদান করবেন বিশিষ্ট আরবী সাহিত্যিক

মুফতী হিফজুর রহমান খাঁন

المتخصص باللغة العربية والدراسات الإسلامية العليا من كلية الدعوة الإسلامية بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية

নিবেদক

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রব কাসেমী নদভী
সাবেক প্রধান: আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম (মসজিদুল আকবর) মিরপুর-১, ঢাকা।
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, মাদরাসাতুত তাসনীম
সেকশন-১, ব্লক-বি, এভিনিউ(রোড)-১, বাড়ী-৩০, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।

০১৯৪০৮৩৫৫০১/০১৭৩২৪৬৩৩৪৫

মিরপুর-১ থেকে চিড়িয়াখানা রোড, রাইনখোলা বাজার, আনসারক্যাম্পের বিপরীতে

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

বিভাগসমূহ
১-নূরানী বিভাগ। ২-হিফজ বিভাগ।
৩-আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ-১ বছর।
৪-জেনারেল শিক্ষিতদের জন্য কুরআন হাদীসের ভাষা আরবী শিক্ষাদান বিভাগ।
৫-আরবী ভাষানুরাগীদের জন্য বছর ব্যাপি (প্রতি শুক্রবার সকাল ৯ টা থেকে ১১ টা পর্যন্ত) আরবী সাহিত্যের উপর বিশেষ দরস প্রদান।

আরবী ভাষা ও নাহু-সরফের বিশেষ কোর্স

রমাযান উপলক্ষে "মাদরাসাতুত তাসনীম" এ আরবী ভাষা ও সাহিত্য এবং নাহু-সরফের সমন্বয়ে ১লা রমাযান থেকে ২০ এ রমাযান পর্যন্ত বিশেষ কোর্স অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এ কোর্সে নাহুবমীর হতে দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত সকল ছাত্র অংশ গ্রহণ করতে পারবে।

ভর্তি ফি ও থাকা খাওয়া ঃ ১৫০০/=

কোর্সের স্থান ঃ জামিয়া নূরিয়া কাসেমুল উলূম স্বপননগর আবাসিক এলাকা, রোড-১৪, কেন্দ্রিয় মসজিদ রজনীগন্ধা সংলগ্ন।

যাতায়াত ঃ মিরপুর-২ নাম্বার স্টেডিয়াম থেকে "বিহঙ্গ বা আশির্বাদ" বাসযোগে রজনীগন্ধার সামনে

এসআইটিসিবি ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজী
ধীতপুর, মুকসুদপুর, দোহার, ঢাকা।

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

ইংরেজি ভাষার ২ মাস মেয়াদী সংক্ষিপ্ত কোর্স

(আরবি নাহু-সরফের সাথে ইংরেজি গ্রামারের সমন্বয়ে পাঠদান)
আসন সীমিত। দ্রুত যোগাযোগ করুন।

* ভর্তির যোগ্যতা : মেশকাত/দাওরায়ে হাদীস পাশ।
* কোর্সের মেয়াদ : ১৪ শাবান–১৪ শাওয়াল (ঈদে ১ সপ্তাহের বন্ধ) (১ মে-৩০জুন, ২০১৮ ঈ.)
* ক্লাসের দিন ও সময় : শুক্রবার ছাড়া প্রতিদিন দেড় ঘন্টা করে ২টি
* কোর্স পরিচালনায় : ড. মাওলানা মাহমুদুল হাসান ইউসুফ ও অন্যান্য।
* ভর্তি ফি: ৫০০০/- টাকা (থাকা-খাওয়া সহ)
বিছানা-পত্র সাথে আনতে হবে

বি: দ্র: অস্বচ্ছল ছাত্রদের জন্য শিক্ষা-ভাতার ব্যবস্থা আছে।

যোগাযোগ : গুলিস্তান থেকে দোহারের বাসে ফুলতলা বাসস্ট্যান্ড নেমে রিক্সায় ধীতপুর।
মোবাইল : ০১৭২৭২১৭৫৪৪ (মোঃ রিয়াজ উদ্দিন) ০১৭৪৮৯১৪৮৪৯

মারকাযুল ফুরকান লি-তালিমিল কুরআন বাংলাদেশ কর্তৃক

মুআল্লিম প্রশিক্ষণ কোর্স

(আমরা কায়দা পড়ানোর কলা-কৌশল শিক্ষা দেই)
দুই বছরে নাযেরা ও তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত

আল-কুরআনের খিদমতে আগ্রহী মুআল্লিমগণ আমাদের এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারেন।
অংশগ্রহণের যোগ্যতা : বিশুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারা

প্রশিক্ষণের স্থান ও তারিখ :

১. খতমে নবুওয়াত মারকায, ঢাকা। বাড়ি নং ৬, রোড নং ৩, ব্লক এইচ, বনশ্রী, রামপুরা থানাসংলগ্ন
মোবাইল : ০১৭৩৯-২৪২৩৮০, ০১৯৭৯-২৪২৩৮০
সময় : ২৫ শাবান থেকে ২০ রমযান পর্যন্ত।

২. বড়াটিয়া শিশুপল্লী (সুতিপাড়া), কালামপুর, ধামরাই, ঢাকা
মোবাইল : ০১৭২৭-২৪৪৯০৪, ০১৭২৪-৭৩০৭৬৮
সময় : ২৬ শাবান থেকে ২৩ রমযান পর্যন্ত।

৩. জামিয়া ইসলামিয়া ইব্রাহীমিয়া কাউতলী, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া (মহিলা/পুরুষ)
সময় : ১ রমযান থেকে ২৫ রমযান পর্যন্ত। মোবাইল : ০১৭১১-৯৮৫৭৭৪

প্রদেয় : ৩০০০/=

Scanned by CamScanner

জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চাও যেভাবে নেক আমল হয়

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক

[বিগত ১৫ জুমাদাল আখিরাহ ১৪৩৯ হিজরী/৪ মার্চ ২০১৮ ঈসায়ী তারিখে মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকার মিরপুরের ভবনে অনুষ্ঠিত হয় এসএসসি পরীক্ষা সমাপনকারী ছাত্রদের নিয়ে দিনব্যাপী একটি দ্বীনী শিক্ষা মজলিস। এতে বিভিন্ন কার্যক্রম ছিল। এই মজলিসে গুরুত্বপূর্ণ অনেক আলোচনা হয়েছে। তন্মধ্য থেকে মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা-এর আমীনুত তালীম হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক ছাহেব দামাত বারাকাতুহুমের মূল্যবান বয়ানটি এখানে উপস্থাপিত হল। এতে মাদরাসার তালিবুল ইলম ও জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চাকারী উভয় শ্রেণির জন্য রয়েছে অতি প্রয়োজনীয় পথনির্দেশনা। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এর পূর্ণ কদরদানী করার তাওফীক দান করুন– আমীন।]

হামদ ও ছানার পর

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

اَلرَّحْمٰنُ، عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ، خَلَقَ الْاِنْسَانَ، عَلَّمَهُ الْبَيَانَ، اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ، وَّالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدٰنِ.

–সূরা আররহমান (৫৫) : ১-৬

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শোকর আদায় করছি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সকাল থেকে আল্লাহর যিকির এবং ফিকির নিয়ে বসার, আলোচনা করার, আলোচনা শোনার তাওফিক নসীব করেছেন, আলহামদু লিল্লাহ।

জরুরি অনেক কথা হয়েছে। সামনে আরো জরুরি আলোচনা হবে; উলামায়ে কেরাম আছেন। কিছু আমলি মশক হবে ইনশাআল্লাহ। আমি সংক্ষেপে দুটি কথা পেশ করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। প্রথম কথা হল, আমরা ছাত্র। জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান অন্বেষণকারী ছাত্র। ছাত্র হিসেবে কিছু আদব, নিয়ম-কানুন পালন করা জরুরি। এ বিষয়ে দু-একটি কথা আরজ করব ইনশাআল্লাহ। আর একটি হাদীস বলার চেষ্টা করব। হাদীসটি এখনই বলে রাখি।

أَرْبَعٌ إِذَا كُنَّ فِيكَ فَلَا عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنَ الدُّنْيَا: حِفْظُ أَمَانَةٍ، وَصِدْقُ حَدِيثٍ، وَحُسْنُ خَلِيقَةٍ، وَعِفَّةٌ فِي طُعْمَةٍ.

–মুসনাদে আহমাদ, হাদীস : ৬৬৫২; শুআবুল ঈমান, বায়হাকী, হাদীস ৪৪৬৩; মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস ৭৮৭৬

সংক্ষিপ্ত একটি হাদীস। হাদীসটির আলোকে কিছু কথা শেষে বলব ইনশাআল্লাহ। শুরুতে যে বিষয়টি বলতে চাচ্ছি তা হল, আমরা ছাত্র। দ্বীনী মাদরাসায় যারা পড়াশুনা করি আমাদের নাম তালিবে ইল্‌ম। তালিবে ইল্‌ম মানে ইল্‌ম অন্বেষণকারী। ইসলামের পরিভাষায় ইল্‌ম বলা হয় ইল্‌মে ওহীকে। ওহীর ইল্‌ম, ওহীর জ্ঞান– ওহীর মাধ্যমে যে জ্ঞান মানুষ পেয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে। কুরআন ও সুন্নাহ্‌র ইল্‌মকে বলা হয় ইল্‌ম। তালিবে ইল্‌ম সে, যে ঐ ইল্‌ম অন্বেষণ করে; ঐ ইল্‌ম নিয়ে মেহনত করে। আর একটা হল জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান। এই জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে যারা মেহনত করে, এটা শিখতে চায়, শেখে তারাও তালিবে ইল্‌ম। এক প্রকারের তালিবে ইল্‌ম। কিন্তু পরিভাষার বিষয় আছে। যেহেতু আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট আসল ইল্‌ম হল ওহীর ইল্‌ম, কুরআন সুন্নাহ্‌র ইল্‌ম তাই ইল্‌ম বললে ওটাকেই বুঝায় এবং তালিবে ইল্‌ম বললে– যারা কুরআন-সুন্নাহ্‌র ইল্‌ম শেখে থাকে তাদেরকে বুঝায়। কিন্তু এর অর্থ এই নয়, যারা জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জন করে তাদের এই কাজটা কোনো কাজ নয়। শরীয়তের দৃষ্টিতে, ইসলামের দৃষ্টিতে এমন ধারণা করা একেবারেই অন্যায় ও ভুল। বরং জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান যারা চর্চা করে, তাদেরও যদি নিয়ত সহীহ থাকে এবং পদ্ধতি সঠিক হয় তাহলে তাদের এ চর্চাও আমলে সালেহ তথা নেক আমল।

জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্বেষণ এবং এ নিয়ে চর্চা করা, মেহনত করা এটাও নেক আমল– আমলে সালেহ। শর্ত কী? নিয়ত হতে হবে সহীহ এবং পদ্ধতি হতে হবে সঠিক। সহীহ নিয়ত এবং সঠিক পদ্ধতি যদি হয় তাহলে ওটাও নেক আমল। আর যদি নিয়ত সহীহ না হয়, তাহলে যে নিয়তে জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান আপনি অর্জন করেছেন তাই পাবেন।

আমলে সালেহ হতে হলে নিয়ত সহীহ হতে হবে– এ কথা শুধু জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্য না। আমাদের এই ইল্‌মে নবুওত, ইল্‌মে ওহী হাসিল করার জন্য যারা মাদরাসায় পড়ে তাদের জন্যও একই কথা। পড়ছে কুরআন-সুন্নাহ্‌র ইল্‌ম, দ্বীনী ইল্‌ম, কিন্তু আল্লাহর দরবারে তার এই মেহনত কবুল হওয়ার জন্য নিয়ত শর্ত। সহীহ নিয়ত হতে হবে। এখানে যদি সহীহ নিয়ত জরুরি হয়, জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জরুরি হবে না?

কী নিয়ত? আমরা যারা স্কুল, কলেজ, ভার্সিটিতে পড়াশুনা করছি, কেন করছি? আমাদের নিয়তটা কী? কী নিয়ত হলে সহীহ নিয়ত হবে, কী নিয়ত হলে স্থূল নিয়ত হবে, কী নিয়ত হলে একবারেই গলত এবং নাজায়েয নিয়ত হবে– এটা জানতে হবে। নিয়ত তিন ধরনের হতে পারে:

১. সহীহ নিয়ত ২. স্থূল নিয়ত আর ৩. একেবারেই গলত নিয়ত।

স্থূল নিয়ত কী?

আগে ওটাই বলি। স্থূল নিয়তই মনে হয় মানুষের মাঝে বেশি; আমি জানি না। স্থূল নিয়ত হল, পড়াশুনা না করলে ভবিষ্যতে করবে কী? ভবিষ্যতের একটা ব্যবস্থার জন্য, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়ানোর জন্য, সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য পড়াশোনা করতে হবে। ছেলে যদি পড়াশুনা করতে না চায় তাকে উদ্বুদ্ধ করা হয় এই কথা বলে– করবি কী? কী করে খাবি? কী করে খাবে তুমি ভবিষ্যতে?

ঠিক এই ভাষায় হয়ত বলে না, কিন্তু এ ভাষাও ব্যবহৃত হয়। বাকি বিষয়টা মাথায় থাকে। নিজের পায়ে নিজেকে দাঁড়াতে হবে। ভবিষ্যতে কিছু একটা করতে হবে। তাহলে তোমাকে শিখতে হবে। এটা হল একবারেই স্থূল নিয়ত। এই নিয়তটার মধ্যে ভদ্রতা নেই। ভালো রুচির পরিচয় নেই। এই নিয়তের মধ্যে কোনো গভীরতা নেই। একেবারে স্থূল একটা চিন্তা।

Scanned by CamScanner

কেন এই নিয়ত স্থূল, এটা বেশি ব্যাখ্যা করতে হবে না। সংক্ষেপে বলি, এই যে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়ানোর কথা বলছি, প্রথম কথা হচ্ছে, আপনি কীভাবে বললেন, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াবেন? কে দান করেছেন এই পা? আল্লাহ দান করেছেন। এই পায়ের নিআমত কত বড় নিআমত। কখন বুঝা যায়? এক্সিডেন্ট হয়ে যদি পা ভাঙে তখন বুঝা যায়, এটা কতবড় নিআমত আল্লাহ্‌র। পায়ের নিআমত তো আল্লাহ দান করেছেন। চলা-ফেরার তাওফীক আল্লাহ দিচ্ছেন। কিন্তু এখন আপনি পায়েব বিষয়টা একেবারেই ফয়সালা করে ফেলেছেন। এটা আমার পা। নিজের পা। দাঁড়ানোটা? দাঁড়াতেই হবে, দাঁড়ানোর জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। নিজের পায়ে নিজে দাঁড়ানো এত সহজ! যিনি পা দিয়েছেন তাঁকে ভুলে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়িয়ে যাব আমি!! নিজের পায়ে নিজে দাঁড়ানো এটা তো সুন্দর কথা হল না। আশাটাও তো সুন্দর না– নিজের পায়ে নিজে দাঁড়ানো।

তেমনিভাবে– 'ভবিষ্যত'। ভবিষ্যতে কী করব, ভবিষ্যতের চিন্তায় পড়াশুনা করতে হবে আমাকে। কোনো না কোনো বিষয়ে আমাকে পণ্ডিত হতে হবে। কাকে বলে ভবিষ্যত? ভবিষ্যত কী জিনিস? একজন আল্লাহ্‌র বান্দার ভবিষ্যত এত সীমিত কেন? ভবিষ্যত কার? আমার, আমার সংসারের! কত দিন পর্যন্ত? কবরে যাওয়া পর্যন্ত! ব্যস, সীমিত ভবিষ্যত! মুমিনের দৃষ্টি এত সীমিত হয়? আমি তো আল্লাহ্‌র মুমিন বান্দা, আমার দৃষ্টি এত সীমিত কেন? আমার ভবিষ্যত মৃত্যু পর্যন্ত? আমার ভবিষ্যত মানে আমি আর আমার পরিবার? একজন মুমিনের ভবিষ্যত হবে পুরো উম্মতের ভবিষ্যত। পুরো উম্মতের ভবিষ্যত তার নিজের ভবিষ্যত। আর তার ভবিষ্যত মউত পর্যন্ত নয়; তার ভবিষ্যত তো শুরু হয় মউতের পর থেকে। মউতের আগ পর্যন্ত তো আজ। যখন থেকে কাল শুরু হবে (মউতের পর) সেটা আগামীকাল। কুরআন মাজীদে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন–

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

–সূরা হাশর (৫৯) : ১৭

অর্থাৎ, আল্লাহকে ভয় কর। তোমাদের প্রত্যেকে যেন ভাবে– আগামীকালের জন্য কী পাঠিয়েছে। আগামীকালের জন্য কী প্রস্তুতি নিয়েছে।

আগামীকাল আমরা কোথায় থাকব? আখেরাতে। তো আখেরাতের জন্য কোনো সঞ্চয় কি আছে আমাদের? ওখানে পাঠিয়েছি কিছু? আল্লাহ বলছেন, প্রত্যেককেই এটা ভাবতে হবে, আগামীকালের জন্য আমি কী প্রস্তুতি নিয়েছি, কী পাঠিয়েছি। আগামীকাল– মৃত্যুর পর থেকেই আগামীকাল। এর আগ পর্যন্ত পুরোটা আজ।

তো মুমিনের ভবিষ্যত তো মৃত্যুর পর থেকে। আমি কীভাবে ভবিষ্যত-চিন্তা করছি; মৃত্যুর পরের জীবনকে বাদ দিয়ে ভবিষ্যত চিন্তা করছি? এটা তো একেবারেই সংকীর্ণতা হয়ে গেল। এজন্য ওটা স্থূল নিয়ত। ঐ নিয়তে কোনো গভীরতা নেই।

গলত নিয়ত কী?

গলত নিয়ত হল– আরে জ্ঞান তো এটাই; আর কোনো জ্ঞান আছে নাকি! জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান যে শিখবে সেই তো জ্ঞানী। এর বাহিরে তো কোনো জ্ঞান নেই!! যারা অন্য কিছু শিখে তারা তো জ্ঞানী না। দেখেন না পত্র-পত্রিকায়? আমার অবশ্য প্রায় ১০ বছরের মত হয়ে গেছে পত্রিকা পড়ার সুযোগ হয় না; পড়ি না– ঠিক এ ভাষায় বললাম না। পড়ার সুযোগ হয় না। আগে যে সময় পড়তাম, ঐ সময় দেখতাম আলেমদের মধ্যে দুই ভাগ করা হয়; বুদ্ধিজীবিরা দুই ভাগ করে– শিক্ষিত আলেম আর অশিক্ষিত আলেম। জ্ঞানী আলেম আর মূর্খ আলেম। এর মানে কী? এর মানে এই যে, মাদরাসার যে ইল্‌ম এটা ইল্‌মই না!! এটা কোনো জ্ঞানের হিসেবেই আসে না। জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিখলেই সে জ্ঞানী হবে, নচেৎ জ্ঞানী হবে না। সেজন্য মূর্খতা থেকে বাঁচতে হলে কী করতে হবে? এই পড়া-শুনা করতে হবে। এই নিয়তে যদি কেউ জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাস্তা অবলম্বন করে, এটা হবে গলত নিয়ত। 'গলত নিয়ত' হালকা ভাষায় বললাম; এটা আসলে বেঈমানী নিয়ত। কুফরি নিয়ত। সহীহ নিয়ত নয়।

সহীহ নিয়ত কী?

সহীহ নিয়ত হল, আমরা আল্লাহ্‌র বান্দা, আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আখেরাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু থাকতে দিয়েছেন দুনিয়াতে। এই জগতে। এই জগতে কেন থাকতে দিলেন?

এই জগতে থেকে আমরা আখেরাতের প্রস্তুতি নিব। এই জগৎটা তো কোনো অর্থহীন বিষয় নয়। এই জগতে থাকতে দিয়েছেন কেন? 'তাযাওয়াদু লিল আখিরাহ'–আখেরাতের পাথেয় গ্রহণ কর। অনেক আয়াত ও হাদীসে এই মর্মটা এসেছে যে, আখেরাতের প্রস্তুতি তোমরা এই দুনিয়া থেকেই গ্রহণ করো। এই জগতে থাকতে হলে মানুষের দুই ধরনের জ্ঞানের দরকার।

১. ওহীর মাধ্যমে যে হেদায়েত আল্লাহ তাআলা দান করেছেন; হালাল, হারাম, জায়েয, নাজায়েয, ঈমান, আমল যাবতীয়। একজন মুমিন একজন মুসলিম তার ঈমানী জিন্দেগী, তার ইসলামী জিন্দেগী কীভাবে গড়বে, গড়ে তুলতে হবে– সেই ইল্‌ম।

২. মানুষের দুনিয়াবি যত জরুরত আছে তার জ্ঞান। এই দু'ধরনের জ্ঞানের সমন্বয়ে একজন মানুষ জগতে বাস করতে পারে।

ধরুন, নামায–সালাত আল্লাহ তাআলা আমাদের উপর ফরয করেছেন। সালাতের জন্য কী কী শর্ত আছে আপনারাও জানবেন। কিছু না কিছু পড়েছেন। আমল তো করেনই। অনেক কিছু জানাও আছে। কিছু জিনিস আছে জানা থাকে না, কিন্তু আমল ঠিকই করা হচ্ছে। বলতে গেলে হয়ত বলতে পারছে না। যেমন– সতর ঢাকা সালাতের একটি শর্ত। সতর ঢাকবে কী দিয়ে? পোশাক দিয়ে। জায়গা পাক হতে হবে নামায পড়তে হলে। এটা একটা শর্ত তাই না?– জায়গা পাক। জায়গা পাক যে হবে, জায়গাটা কোন্ জায়গা। নামাযের মূল জায়গা, আসল জায়গা কোন্‌টা? মসজিদ। মসজিদেই তো নামায পড়ব। মসজিদ তো একটা স্থাপনা, একটা ঘর। তো আপাতত এই দুই শর্তের কথাই বলি। এখন সালাতের জন্য যে পোশাক পরতে হবে, পোশাক আসবে কোত্থেকে? পোশাক কে তৈরি করবে?

জী, পোশাক তৈরি করতে হবে না? তাহলে পোশাকের শিল্প এটা জরুরি কি জরুরি না? জরুরি। এই পোশাকশিল্পের জ্ঞান কে অর্জন করবে? মসজিদ যে বানাবে এটার জন্য কয়েক প্রকার জ্ঞানের দরকার। ইঞ্জিনিয়ার দরকার, আবার মিস্ত্রী দরকার। আরো কত পর্ব আছে। ওটার ছামানাগুলো তৈরি করবে কারা? একটা ঘর তৈরি হওয়ার জন্য কতটা শিল্পের জরুরত। তো শরীয়ত আমাদেরকে পোশাক পরতে বলে– বিবস্ত্র থাকা যাবে না। নামায ছাড়াই তো পোশাক পরা জরুরি। সতর ঢাকা ফরয না?! নামায ছাড়াই তো সতর ঢাকা ফরয। তো শরীয়ত পোশাক পরা ফরয করেছে তাহলে পোশাকশিল্প কি শরীয়তে নিষিদ্ধ হবে?

Scanned by CamScanner

মসজিদ নির্মাণ করার ফজিলতও আছে–

مَنْ بَنَى لِلّٰهِ مَسْجِدًا بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.

যে আল্লাহ্‌র জন্য একটি মসজিদ বানাল আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে বাড়ি নির্মাণ করবেন। –সহীহ বুখারী, হাদীস ১২৯১

মসজিদ নির্মাণের ফযিলতের কথাও আছে, সওয়াবের কথাও আছে। উদ্বুদ্ধও করা হয়েছে। কিন্তু এই শিল্প নিষেধ! এই বিজ্ঞান নিষেধ! এটা হয়?! কখনো হয় না।

জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানকে শরীয়ত কখনো নিষেধ করে না। চিকিৎসার কথা বলা হয়েছে। হাদীস শরীফে আছে, আল্লাহ তাআলা রোগ দেন আবার রোগ দূর করেনও। তো আল্লাহ কোন্ জিনিসে শিফা রেখেছেন– এটার নিশ্চিত বাস্তবিক ইল্‌ম আল্লাহ ছাড়া কারোরই নেই। শুধু সাধারণ একটা জ্ঞান ডাক্তারদেরকে আল্লাহ তাআলা দান করেছেন। সে হয়ত ঠিক ঠিক ঔষধ প্রয়োগ করতে পারে। শেফা হয় আল্লাহ্‌র হুকুমে । এই যে ডাক্তারী বিষয়টা– রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসেও রয়েছে। হাদীসের কিতাবে একটা অধ্যায়ের শিরোনাম 'আতিব'। শিরোনাম কী? আতিব। তিব মানে চিকিৎসা বিজ্ঞান। একজন তালিবে ইল্‌ম, একজন ছাত্র যখন জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের লাইনে যাবে এবং সেই বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করবে তার নিয়ত কী হবে? নিয়ত হবে, আমি এর মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মাখলুকের সেবা করব।

দ্বীন-ঈমান এবং শরীয়তের অনেক বিধি-বিধান আছে, যেগুলোর সাথে জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্পর্ক। উম্মাতে মুসলিমার সফলতা দুইটা মিলে। মূল সফলতা ঈমানের মধ্যে। সফলতা কিন্তু মুমিন হিসেবে। সে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে তার জাগতিক অনেক কিছুরই প্রয়োজন হয়ে যাচ্ছে। আমি ঐ অংশটা পুরা করব। আমি ঐ দিকের তাকাযাটা পুরা করব। মুফতী সাহেব বলবেন, নামাযের জন্য তোমাকে পোশাক পরতে হবে, তোমার পোশাক পবিত্র হতে হবে আর আমি বলব এই নাও পোশাক। হুযুর বলবেন, মসজিদের এই ফযিলত এবং বাসস্থান এটা আল্লাহর নিআমত। আমার স্ত্রীকে, আমার সন্তানকে সুন্দর নিরাপদ বাসস্থানে রাখা আমার অবশ্যকর্তব্য। এই মাসআলা হুযুর বলবেন। এখন ঘরটা নির্মাণ হবে কীভাবে? এই বিষয়ে আমি সহযোগিতা করব।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো সাহাবী অসুস্থ হলে ডাক্তারের কাছে পাঠাতেন। হারেছ ইবনে কালাদা আছছাকাফির কাছে পাঠাতেন। নিজেও চিকিৎসা দিতেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিকিৎসারও অনেক জ্ঞান ছিল। অনেক কিছুর ক্ষেত্রে তিনিও ব্যবস্থাপত্র বলে দিতেন। ব্যবস্থাপত্র লিখে তো দিতেন না, কিন্তু বলে দিতেন অনেককে। আল্লাহর রাসূল তো রাসূল ছিলেন। প্রাসঙ্গিক বিষয় হিসেবে চিকিৎসারও অনেক জ্ঞান ছিল আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের।

কিন্তু যে বিষয় জানা নাই সে বিষয়ের বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠাতেন। ডাক্তারের কাছে পাঠাতেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিকিৎসার জন্য হারেছ ইবনে কালাদা'র কাছে পাঠাতেন । হারেছ ইবনে কালাদা মুসলিম ছিল না। তখন যদি মদীনায় কোনো মুসলিম ডাক্তার থাকতেন, তার কাছে পাঠাতেন না? তো আপনি বলবেন যে আমার মুসলিম ভাইয়ের যাতে জরুরতের জন্য কোনো খ্রিস্টানের কাছে যেতে না হয় আমি সেই ঘাটতিটা পুরা করব। আমি এমন ফার্মাসিস্ট হব যে, ঔষধের ক্ষেত্রে অমুসলিম ফার্মাসিস্টদের মুখাপেক্ষী হতে না হয় মুসলিমদের। এই ঘাটতি আমরা পুরা করব। এটা হল নিয়ত। আল্লাহর মাখলুকের সেবার জন্য এবং জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান দিয়ে আল্লাহর দ্বীনের যে যে খেদমত করা যায় সেই খেদমতের জন্য আমি এই লাইনে পড়া-শোনা করব। তাহলে মাদরাসার ছাত্রের মনযিল আর আমার মনযিল এক। সেও আল্লাহর রেজামন্দির জন্য আল্লাহকে খুশি করার জন্য করছে আমিও আল্লাহকে খুশি করার জন্য করছি। সে মূল বিষয়ে মানুষকে হেদায়েত দিবে। কিন্তু সে হেদায়েতের উপর আমল করার জন্য মানুষের যেসমস্ত জাগতিক জরুরত হবে সেই জরুরতটা আমি পুরা করব– ইনশাআল্লাহ। এটা নিয়ত। এই নিয়তে যদি কেউ স্কুলে পড়ে, কলেজে পড়ে, ভার্সিটিতে পড়ে তাহলে তার এটা আমলে সালেহ হবে না? অবশ্যই হবে আমলে সালেহ। কোনো সন্দেহ নেই– এটা আমলে সালেহ।

আরেকটা বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ, একটি হীনম্মন্যতা আমাদের মধ্যে কাজ করে যে, আমি যে শাস্ত্রে পড়াশুনা করছি এই শাস্ত্রে আমি পণ্ডিত্য অর্জন করব, সবার আগে যাব, আমি সবাইকে পিছে ফেলব; শুধু মেহনত করে। শুধু মেহনত। মাদরাসার ছাত্রদের কিন্তু এভাবে বলা হয় না এবং বললে অবাস্তব কথা হবে। কী বলা হয়, তুমি সর্বোচ্চ মেহনত কর। সময়ের অপচয় করো না। মেহনত পুরা কর। কিন্তু আল্লাহ্‌র সাথে তোমার সম্পর্ক ভালো থাকতে হবে। জ্ঞান দান করবেন কে? আল্লাহ। যে কথা মাদরাসার ছাত্রের জন্য সেই কথাটাই জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ছাত্রদের জন্যও প্রযোজ্য কি প্রযোজ্য না? –জিজ্ঞাসা করি আপনাদেরকে– অবশ্যই প্রযোজ্য। তার কারণ, মনে করুন, একজন মাদরাসার ছাত্র হাদীসের ওপর উচ্চতর পড়াশুনা করছে। এই বিষয়ে তাকে পাণ্ডিত্য দান করবেন কে? আল্লাহ। সে মেহনত করতে পারে কিন্তু দান করবেন কে? আল্লাহ তাআলা। আপনি ডাক্তার হতে চাচ্ছেন, কতজনই তো ডাক্তারি পড়ে, কিন্তু সব ডাক্তারের দক্ষতা ও পাণ্ডিত্য কি সমান? এই যে মেধার ও প্রতিভার বিকাশ যে ঘটছে, একরকম ঘটছে না, তারতম্য হচ্ছে, কোত্থেকে হয়? কেন হয়? সমান সমান মেহনত করছে, দু'জনের মেধা একরকম, তারপরও পার্থক্য হয় কি হয় না? হয়। কেন? দান করছেন আল্লাহ। একজনকে বেশি দান করেছেন আরেকজনকে কম। জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে যারা অগ্রসর হচ্ছে তারা বিশ্বাস করুক আর না করুক দান করছেন কে? দান করছেন আল্লাহ তাআলা।

কিন্তু বুদ্ধিমান ছাত্র সে, যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে সম্পর্ক রাখে। ভালো সম্পর্ক রাখে। সে এ বিশ্বাস করে– আমাকে দান করবেন আল্লাহ। এজন্য আমরা যে যেই বিষয়েই পড়ি– একজন অংক নিয়ে পড়ছি, একজন কোনো এক ভাষার উপর পড়াশুনা করছি আর বিজ্ঞানের তো বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা আছেই; একেকজন একেক দিক নিয়ে পড়ছি; যে যেই দিক নিয়েই পড়ি আমাকে বিশ্বাস রাখতে হবে, আমি যে বিষয়ে আছি এ বিষয়ে আমাকে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে হলে, সবাইকে ছাড়িয়ে যেতে হলে একমাত্র আল্লাহ্‌ই আমাকে সাহায্য করতে পারেন। আল্লাহ্‌ই দান করতে পারেন। এজন্য আমি আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক রাখব।

কী সম্পর্ক রাখব আল্লাহ্‌র সাথে? আমাকে সবসময় মনে রাখতে হবে, আমি আল্লাহ্‌র বান্দা। আল্লাহ্‌র বন্দেগী করা ভুলব না। ফরয ভুলব না। আল্লাহ যে সমস্ত ইবাদত ফরয করেছেন এটার জন্য আমাকে সময় বের করতেই হবে। ঘুমের জন্য আমি সময় বের করি না? ঘুমের জন্য সময় বের করি। তো ঘুম কি ফরয? খাওয়া-দাওয়ার জন্য সময় বের করি না? এটা কি ফরয? দৈনিক গোসল করি, গোসলের জন্য সময় বের করি না? এটা কি ফরয? এটা কে তো আমি জরুরি মনে করি। আমার দেহের জন্য জরুরি। আমার

Scanned by CamScanner

শারীরিক চাহিদা এগুলো। শারীরিক চাহিদাগুলো আমি জরুরি মনে করছি। এগুলোর জন্য সময় বের করেই ফেলছি। শত ব্যস্ততার মধ্যেও সময় বের করছি।

শারীরিক চাহিদার জন্য আমি সময় বের করছি। এরকম আমার দিলেরও তো কিছু চাহিদা আছে। দিল ও কলব এবং রূহ ও আত্মার কিছু চাহিদা আছে। আমার রূহ যাতে সুস্থ থাকে, আমার রূহ যাতে শক্তিশালী হয়, আমার কলব যাতে পাক-পবিত্র থাকে, শক্তিশালী থাকে– এজন্য এগুলোর কিছু চাহিদা আছে। কলব আলোকিত হওয়ার জন্য কিছু চাহিদা আছে। সেটা কী? ঈমান, নেক আমল, গুনাহ থেকে বাঁচা, ইবাদত-বন্দেগী করা।

কলব ও রূহের চাহিদা; এই চাহিদাগুলোর জন্য যদি আমি সময় বের করি, এগুলো যদি যথাযথভাবে আদায় করি তো আল্লাহ্‌র সাথে আমার সম্পর্ক ভালো থাকবে। আমি আল্লাহ্‌র দরবারে দুআ করব, যিকির করব, কুরআন তিলাওয়াত শিখব, তিলাওয়াত করব। লম্বা সময়ের দরকার নেই। আমরা মাদরাসার ছাত্রদেরকে বলি, তোমরা কমপক্ষে তিন পারা করে তিলাওয়াত কর। আপনাদেরকে বলব, আপনি দৈনিক এক পারার চার ভাগের এক ভাগ তিলাওয়াত করবেন। এক পৃষ্ঠা করে তিলাওয়াত করবেন।

ইনসাফের সাথে কি বলবেন– আপনাদের পড়াশুনার জন্য বেশি গভীরতা দরকার, না আমাদের পড়াশুনার জন্য? ধারণা নেই আপনাদের– বলবেন কীভাবে। আমাদের যে পড়াশুনা– ইলমে ওহী, এটা অনেক বিস্তৃত, অনেক গভীর। এটার জন্য একাগ্রতা বেশি দরকার। এটা আপনাদের ধারণা থাকবে না। এজন্য আমি বলে দিলাম; আশা করি বিশ্বাস করবেন। আমরা মনে করি, আমরা যতই মেহনত করি, যতই সময় ও শ্রম ব্যয় করি, যদি আমি কুরআন তিলাওয়াত ঠিকমত না করি, যিকির-দুআ না করি, ফরয-সুন্নতের পাশাপাশি দুই-চার রাকাত নফল নামায না পড়ি, একটু আল্লাহ্‌র দরবারে মুনাজাত না করি, দু-চার ফোঁটা চোখের পানি না ফেলি তাহলে আমরা যতই মেহনত করব ইলমের লাইনে অগ্রসর হতে পারব না। আপনি বলবেন, ব্যস্ততার কারণে পারি না। ব্যস্ততা তো আমাদের বেশি। কারণ আমাদের এই বিভাগটা সময়ের দাবি রাখে। একাগ্রতার বেশি দাবি করে। কিন্তু ওটাতে বরকত আসবে কোত্থেকে? এই দুআর মাধ্যমে, যিকিরের মাধ্যমে। এজন্য যারা স্কুল, কলেজ বা ভার্সিটির ছাত্র তারাও নিজের লাইনে অগ্রসর হওয়ার জন্য, ভালো ডাক্তার বনার জন্য, ভালো ইঞ্জিনিয়ার বনার জন্য ভালো নামাযী হতে হবে। তিলাওয়াত শিখে, তিলাওয়াত করতে হবে দৈনিক; কম করেন আর বেশি করেন। যিকির, দুআ, দুই-চার রাকাত নফল নামায পড়া। সালাতুল হাজত একটা নামায আছে, হাজতের নামায। মানে আমার যা প্রয়োজন, নামায পড়ে আল্লাহর কাছে তা চাওয়া। পরীক্ষার জন্য যাচ্ছি, ভালো ফলাফলের জন্য দুই রাকাত নামায পড়ে হলে যাব। একটু মুনাজাত করে হলে ঢুকব।

যখন আমার মধ্যে এই অনুভূতি আসবে, আমি যে লাইনে আছি এই লাইন গলত লাইন নাকি সহীহ্ লাইন। তখন আমার হিম্মত বাড়বে কি বাড়বে না? হিম্মত বাড়বে। যখন আমি আমার লাইনে থেকে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক মজবুত করব, আমার হিম্মত বাড়বে। একজন মাদরাসার ছাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি চাচ্ছে, আমিও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি চাচ্ছি। তাহলে আমার হিম্মত বাড়বে কি বাড়বে না? বাড়বে। আমি কখনো হীনম্মন্যতার শিকার হব না। এজন্য এই নিয়ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ। সাথে সাথে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক রাখা। সম্পর্কের মাধ্যম বললাম– ইবাদত-বন্দেগী, যিকির, দুআ এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা।

কিসের থেকে বাঁচা? গুনাহ থেকে বাঁচা। গুনাহ সবকিছু বরবাদ করে দেয়। মাদরাসার তালিবে ইল্‌ম হোক আর স্কুলের ছাত্র, যে গুনাহতে লিপ্ত হবে সে আর বরকত পাবে না। জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা বলেন, মাদরাসার পড়াশুনার কথা বলেন, গুনাহ সব ধরনের পড়াশুনার বরকত নষ্ট করে দেয়। নূর নষ্ট করে দেয়। দেখেন না লেখা থাকে– আলোকিত মানুষ চাই। আলোকিত মানুষ চাইতে হলে, আলোর সৃষ্টিকর্তাকে চিনতে হবে। আলো সৃষ্টি করেছেন কে? আল্লাহ। وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَ النُّوْرَ (তিনি সৃষ্টি করেছেন অন্ধকার ও আলো)। আলোকিত মানুষ হয়ে যাবে– আলোর স্রষ্টাকে না চিনে! আলোদানকারীর উপর ঈমান না এনে! তাঁর আনুগত্য স্বীকার না করে? অসম্ভব!

যাই হোক, আমি বলতে চাচ্ছি যে, আমাদের আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। বস্তুত যে চায় যে, নিজের খালিক ও মালিক, নিজের রব ও মা'বুদ, যিনি তাকে হাজারো নিআমত দিয়ে ভরিয়ে রেখেছেন, দয়া ও করুণায় ঘিরে রেখেছেন, যে চায় তাঁর শোকর গুজার বান্দা হবে, তাঁর অবাধ্য বান্দা হবে না, তাঁর বিদ্রোহী হবে না, তার জন্য আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করা এবং সেই সম্পর্কের উপর অটল-অবিচল থাকা ছাড়া কোনো উপায়ই নেই। সে মাদরাসার তালিবে ইল্‌ম হোক বা স্কুলের ছাত্র; সর্বাবস্থায় আল্লাহর সাথে সম্পর্ক জরুরি।

আল্লাহর সাথে সম্পর্ক, তাআল্লুক মাআল্লাহ যেটা, সেটার জন্য সবচেয়ে জরুরি হল ঈমান শেখা। আজ ঈমান শেখার বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি নেই। ঈমান শেখার অর্থ কী? ঈমান শেখার অর্থ হল–

১. আমাদেরকে ইসলামী আকায়েদ শিখতে হবে এবং মনেপ্রাণে সেগুলোর বিশ্বাস ধারণ করতে হবে।

২. কী কী চিন্তা ও মতবাদ এবং কী কী কথা ও কর্ম ইসলামী আকায়েদের সাথে সাংঘর্ষিক, সেগুলো জানতে হবে। অর্থাৎ যেসব কারণে ঈমান বিলুপ্ত হয়ে যায় সেগুলোর ইল্‌ম হাসিল করতে হবে এবং সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে সেগুলো থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

৩. শুআবুল ঈমান, ঈমানের শাখা-প্রশাখা কী কী সেগুলো জানতে হবে।

৪. ইসলাম যেসকল মৌলিক বিধিবিধান শিক্ষা দিয়েছে এবং যে সকল ফরয ও হুকুক (আল্লাহ ও সৃষ্টির হকসমূহ) শিক্ষা দিয়েছে সেগুলো জানতে হবে এবং সেগুলো পালনের চেষ্টা করতে হবে।

৫. হালাল-হারামের জ্ঞান অর্জন করতে হবে। হারাম থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

৬. যেসব কারণে ঈমান দুর্বল হয়ে যায় সেগুলো জানতে হবে এবং সেগুলো থেকে বেঁচে থাকতে হবে। এজন্য জানতে হবে, কোন্ কোন্ কাজ গুনাহ ও অন্যায়; আল্লাহ তাআলার নাফরমানী এবং আখেরাতে আযাবের কারণ।

৭. কুরআনে উল্লেখিত মুমিনদের চরিত্র ও গুণাবলি জানতে হবে এবং সেই গুণে গুণান্বিত হওয়ার ও সেই চরিত্রে চরিত্রবান হওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

৮. কাফির, ফাসিক ও মুনাফিকদের মন্দ কাজ ও মন্দ অভ্যাস, যেগুলোর বিষয়ে কুরআন মাজীদে সতর্ক করা হয়েছে সেগুলো জানতে হবে এবং সেগুলো থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

৯. যেসব আমলের কারণে ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং ঈমান তাজা হয় ও মজবুত হয় সেগুলোর বিষয়ে গুরুত্ববান থাকতে হবে।

১০. ঈমান রক্ষা ও ঈমান নবায়নের দ্বীনী পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে জেনে সেগুলো নিজের জীবনে গ্রহণ করার চেষ্টা করতে হবে।

এমনিতে তো ঈমান শেখা, ঈমান রক্ষা করার বিষয়ে সচেতন থাকা সবার উপরই ফরয। কিন্তু যারা এমন পরিবেশে থাকে, যেখানে ঈমানের কদর নেই, যেখানে পাঠ্যক্রম থেকে শুরু করে পাঠ্যব্যবস্থা

Scanned by CamScanner

সবকিছুতেই ঈমানের প্রতিকূল পরিবেশের যেন আধিপত্য, সেরকম পরিবেশে যারা থাকে তাদের তো নিজের ঈমানের বিষয়ে যত্নবান থাকা আরো বেশি জরুরি।

জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ভালো জিনিস এবং প্রয়োজনীয়ও বটে, কিন্তু সেগুলোর পাঠ্যক্রম রচনা, পাঠ্যব্যবস্থা নির্ধারণ এবং সেসব প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় বিশ্বব্যাপী এমন লোকদের আধিপত্য, যারা জগতের জ্ঞান ও বিদ্যাকে জগতের স্রষ্টা থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য তৎপর। তাদের সর্বনিম্ন অপরাধ হল–

يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ

তারা পার্থিব জীবনের প্রকাশ্য দিকটাই জানে, আর আখেরাত সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ গাফেল। –সূরা রূম (৩০) : ৭

يَعْرِفُوْنَ نِعْمَتَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُوْنَهَا وَاَكْثَرُهُمُ الْكٰفِرُوْنَ

তারা আল্লাহর নিআমতসমূহ চেনে তবুও তা অস্বীকার করে এবং তাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ। –সূরা নাহল (১৬) : ৮৩

আমাদের পাঠ্যপুস্তকগুলোতে বিষয়বস্তু যেটাই হোক উপস্থাপনার এমন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে যে, অবচেতনেই ছাত্রের মন-মস্তিষ্ক থেকে ইসলাম ও শাআয়েরে ইসলামের গুরুত্ব ও মর্যাদা কমে যায়। এছাড়া সুস্পষ্ট বাতিল এবং বেঈমানী কথাবার্তাও জায়গায় জায়গায় লিখে দিয়েছে। এজন্য কোনো ছাত্র যদি দ্বীন ও শরীয়ত এবং ঈমান ও আমল শেখার বিষয়ে যত্নবান না হয় এবং সময়ে সময়ে নেককারদের ছোহবত অবলম্বন করে ঈমানী মানস গঠন না করে তাহলে এমন পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যব্যবস্থায় পড়াশোনা করে, এমন পরিবেশে অবস্থান করে নিজের ঈমান কীভাবে রক্ষা করবে?

তো আপনারা একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা মনে রাখুন। দ্বীনী দৃষ্টিকোণ থেকে বাতিল ও আপত্তিকর বিষয়বস্তু যেসব বইয়ে আছে এবং যেসব বই ঈমান বিরোধী চিন্তা-চেতনা থেকে রচিত, সেগুলো হাতে নেওয়ার আগে আপনারা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। বলবেন, আয় আল্লাহ! আমরা তোমার মুমিন বান্দা। সব ধরনের কুফুর, নিফাক এবং সব রকম বাতিল ও আপত্তিকর বিষয় থেকে আমরা তোমার দরবারে নিজেদের নিঃসম্পর্ক ঘোষণা করছি। আপনাদের অভিভাবক এবং আপনাদের শিক্ষক সবারই এই কাজ করা উচিত। বরং স্কুল-কলেজের ছাত্র, তাদের অভিভাবক এবং তাদের প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীলগণের কর্তব্য হল, হিম্মত করে সরকারের কাছ থেকে এই দাবি আদায় করে নেওয়া যে, তারা যেন পাঠ্যপুস্তকগুলো মুহাক্কিক ও আহলে হক উলামায়ে কেরামের মাধ্যমে দ্বীনী দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পাদনা করিয়ে নেন এবং ফরযে আইন ইলমকে পাঠ্যক্রমের বাধ্যতামূলক অংশ সাব্যস্ত করেন।

আমাদের জানা উচিত যে, ঈমান সবার আগে, সবকিছুর আগে। সেটাই তো মুমিনের জীবন, সেটাই নূর এবং হেদায়েত। এইজন্য আমাদের জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শেখা এমনভাবে যেন না হয় যে, আমাদের ঈমানের দৌলত আমাদের হাতছাড়া হয়ে যায়, আমাদের স্রষ্টা থেকে আমাদের সম্পর্ক ও বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। যদি আমরা এমন করি তাহলে এর চেয়ে বড় ক্ষতিগ্রস্ততা আর কিছু হতে পারে না।

আমি এখন হাদীসটা বলি, এরপর কথা শেষ করে দিব।

কী বলেছিলাম, হাদীসের প্রথম শব্দটা কী?

'আরবাউন' তাই না? হাদীসটি–

أَرْبَعٌ إِذَا كُنَّ فِيكَ فَلَا عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنَ الدنيا: حِفْظُ أَمَانَةٍ، وَصِدْقُ حَدِيثٍ، وَحُسْنُ خَلِيقَةٍ، وَعِفَّةٌ فِي طُعْمَةٍ.

আপনি বাংলায় লিখে ফেলতে পারেন এই হাদীস। আরবীর উচ্চারণ বাংলায় হয় না; এজন্য কেউ কুরআনকে কখনো বাংলা উচ্চারণে লিখবেন না। বাংলা উচ্চারণ বা ইংরেজী উচ্চারণে লিখবেন না এবং বাংলা উচ্চারণ বা ইংরেজী উচ্চারণে পড়বেনও না কখনো। শিখবেন। ب ت ث । থেকে শেখেন। কারণ, অনেক অক্ষর আছে, বাংলায় তার কোনো প্রতিউচ্চারণ নেই। আছে? ع বাংলায় নাই। ق বাংলায় নাই। ض বাংলায় নাই। অনেক অক্ষর বাংলায় বিলকুল নাই। কিছু অক্ষর আছে এমন বাংলায় যার কাছাকাছি অক্ষর আছে। আর কিছু আছে হুবহু। যাইহোক, বলছিলাম, কুরআন অন্য ভাষায় লিখবেনও না। পড়বেনও না। কিন্তু অন্যান্য বিষয় ছোটখাটো জিনিস বাংলা উচ্চারণে লিখে রাখলে আশা করি গুনাহ হবে না।

আরবাউন ইয়া কুন্না ফী-কা...

أَرْبَعٌ إِذَا كُنَّ فِيكَ فَلَا عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنَ الدُّنْيَا: حِفْظُ أَمَانَةٍ، وَصِدْقُ حَدِيثٍ، وَحُسْنُ خَلِيقَةٍ، وَعِفَّةٌ فِي طُعْمَةٍ.

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, চারটা সিফাত, চারটা গুণ যদি তোমার মধ্যে থাকে, তাহলে কী আছে, কী নেই এটা নিয়ে আর পেরেশান হওয়ার দরকার নেই।

দুনিয়ার কী পেলে আর কী পেলে না– পেরেশান হওয়ার দরকার নেই। চার গুণ পেয়ে গেছ; দুনিয়ার আর কিছু না পেলেও সবই আছে তোমার। চারটা জিনিস–

১. ছিদ্‌কু হাদীসিন– সত্য বলা; সত্য কথা বলব, মিথ্যা বলব না।

২. হিফ্‌যু আমানাতিন– আমানত রক্ষা করা। খিয়ানত না করা। কোনো ধরনের ভেজাল, কোনো ধরনের দুর্নীতিতে না জড়ানো। অন্যের হক নষ্ট না করা। নিজের দায়িত্বে, নিজের ডিউটিতে কোনো ফাঁকি না দেওয়া। বিষয়টা কিন্তু অনেক ব্যাপক। আজকে এতটুকুই বললাম। হিফ্‌যু আমানাতিন–আমানত রক্ষা করা। কোনো প্রকার খিয়ানত না করা।

৩. হুসনু খালীকাতিন– আখলাক-চরিত্র সুন্দর এবং ব্যবহার সুন্দর হওয়া। চরিত্র পবিত্র হওয়া, ভালো হওয়া। মানুষের সাথে ব্যবহার সুন্দর হওয়া। এটাকে বলে হুসনু খালীকাতিন। এটা তৃতীয় বিষয়।

৪. ইফ্‌ফাতুন ফী তুমাতিন– খাবার হালাল হওয়া। রিযিকটা হালাল হতে হবে।

চারটা বিষয় হল : সত্য বলা, আমানত রক্ষা করা, স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার ভালো হওয়া, আর রিযিক হালাল হওয়া।

এই চার গুণ থাকলেই চলবে। এটা কি শুধু মাদরাসার ছাত্রদের জন্য? না। সবার জন্য এই চার গুণ। একজন মুমিন বান্দার মধ্যে এই চার গুণ থাকতেই হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই সিফাতগুলো হাসিল করার তাওফীক নসিব করেন– আমীন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

[বয়ানটি মুসাজ্জিলা থেকে পত্রস্থ করেছেন অলী আমীন মুহাম্মাদ খায়রুল বাশার, সম্পাদনার সময় হুজুর এতে কিছু জরুরি বিষয় সংযোজনও করে দিয়েছেন। –বিভাগীয় সম্পাদক]

পিতলগঞ্জ জামিউল উলূম ও তাহফীযুল কুরআন মাদরাসা

নাহু-ছরফ, আরবীভাষা ও ইলমুল ফারায়েযে মেহনতের সুবর্ণ সুযোগ
প্রশিক্ষণকাল : ২৫ শাবান থেকে ১৮ রমাযান

বিভাগসমূহ

১. এক বছর মেয়াদী আরবীভাষা বিভাগ
২. মাদানী নেসাবে কিতাব বিভাগ
৩. হিফ্‌য বিভাগ ৪. নূরানী মক্তব বিভাগ

ভর্তি : ৮, ৯, ১০ শাওয়াল

তত্ত্বাবধানে : (মাওলানা) মুহাম্মাদ যাকারিয়া সিরাজী (নাযেমে তালীমাত)

প্রয়োজনে : ০১৭৩৯৫৯৮১৩৫, ০১৯১৭২৮৬৩১৯

Scanned by CamScanner

দুআর ভুবন

মুহিউদ্দিন ফারুকী

আমরা আল্লাহ্‌র বান্দা, আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তাই সবসময় আমরা আল্লাহ্‌কে স্মরণ রাখব।

মানুষ দুর্বল। মানুষ প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহ্‌র মুখাপেক্ষী; আল্লাহ্‌র সাহায্য ছাড়া সে চলতে পারে না। তাই আমরা সর্বদা সকল কাজে আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করব।

আল্লাহ আমাদের অনেক অনেক নিআমত দিয়েছেন; আমাদের সুন্দর চেহারা, হাত-পা, চলার শক্তি, কথা বলার শক্তি সবই আল্লাহ আমাদের দান করেছেন। তেমনি আমাদের দিয়েছেন নানা রকম ফলমূল– আম-জাম-কাঠাল-কলা-আঙুর-আপেল আরো কত শত ফলমূল! দিয়েছেন সবুজ-শ্যামল সুন্দর পৃথিবী। এ সকল নিআমতের জন্য আমরা সবসময় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করব।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কাজের শুরুতে, মাঝে আবার কখনো শেষে দুআ পড়তেন। এসকল দুআর মাধ্যমে তিনি আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করতেন, তাঁর কাছে সাহায্য চাইতেন এবং তাঁর নিআমতের শুকরিয়া আদায় করতেন। নবীজীর শেখানো সেসকল দুআর মাধ্যমে তুমিও উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে আল্লাহকে স্মরণ করতে পার, তাঁর সাহায্য চাইতে পার এবং নিআমতের শুকরিয়া আদায় করতে পার।

তুমিও যদি নবীজীর মত আল্লাহকে স্মরণ করতে চাও; আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করতে চাও তোমাকে নবীজীর শেখানো দুআ ও জিকিরগুলো শিখতে হবে, মুখস্থ করতে হবে এবং আমল করতে হবে।

আমি-তুমি-আমরা সবাই মুসলিম। মুসলিম প্রতিটি কাজে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নত মেনে চলে, তাঁর দেখানো পথে চলে, তাঁর শেখানো পদ্ধতি অনুযায়ী আমল করে। তাই আমরা আল্লাহকে স্মরণ করব ও তাঁর শুকরিয়া আদায় করব নবীজীর শেখানো দুআর মাধ্যমে। নবীজীর শেখানো দুআকে বলে– মাসনূন দুআ।

তুমি যেন সহজে ও সুন্দরভাবে মাসনূন দুআ ও জিকিরগুলো শিখতে পার সেজন্যই আমাদের এ আয়োজন। মাসনূন দুআর ভুবনে তোমাকে স্বাগতম!

তুমি এখন পড়বে, শিখবে আর আমল করবে।

প্রতি মাসে বা সপ্তাহে যদি তুমি দু-একটি করে দুআ শিখতে থাক এবং আমল করতে থাক তাহলে কিছুদিন পর দেখবে– তুমি অনেক দুআ শিখে গেছ এবং অনেক দুআ তোমার আমলে এসে গেছে। তুমি আল্লাহ্‌র প্রিয় হয়ে গেছ। প্রিয় নবীর 'প্রিয় উম্মত' হয়ে গেছ।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে তাওফীক দান করুন– আমীন।

ঘুম থেকে জাগার পর দুআ

বন্ধুরা! ঘুম হচ্ছে ছোট মৃত্যু। দেখ না, ঘুমিয়ে গেলে মানুষ দুনিয়ার আর কিছু টের পায় না! যেন সে দুনিয়াতে নেই। তাই ঘুমকে বলে ছোট মৃত্যু। এই ছোট মৃত্যুর পর আল্লাহ তাআলা মানুষকে নতুন জীবন দান করেন। তাই ঘুম থেকে জাগার পর আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা আদায় করতে হয়। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ঘুম থেকে জেগে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করতেন। হামদ-ছানা পাঠ করতেন। ঘুম থেকে জাগার পর দুআ পড়তেন। তাই চল আমরাও রাসূলের অনুসরণে ঘুম থেকে জাগার হওয়ার দুআ পড়ি।

ঘুম থেকে উঠে আমরা এই দুআ পড়ব–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ.

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি আমাদেরকে (ঘুম নামক) মৃত্যুর পর আবার (জাগিয়ে) জীবিত করলেন, আর আমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। –সহীহ বুখারী, হাদীস ৬৩১২; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৭১১

হাম্মামে (বাথরুমে) প্রবেশের দুআ

স্বভাবতই তুমি ঘুম থেকে উঠে হাম্মামে বা 'বাথরুমে' যাবে। হাম্মামে প্রবেশের সময় বাম পা আগে দিবে। কারণ বাম পা দিয়ে হাম্মামে ঢোকা নবীজীর সুন্নত। আর ঢোকার পূর্বে নবীজীর শেখানো এই দুআ পড়বে–

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُم إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.

অর্থ : বিসমিল্লাহ, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট দুষ্ট পুরুষ জিন ও নারী জিনের (অনিষ্ট) থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। [সহীহ বুখারী, হাদীস ১৪২; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৩৭৫ (বিসমিল্লাহ– মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদীস ৫; আদদুআ, তবারানী, হাদীস ৩৫৭; আলমুজামুল আওসাত, তবারানী, হাদীস ২৮০৩)]

হাম্মাম থেকে বের হওয়ার দুআ

প্রয়োজন শেষে হাম্মাম থেকে দ্রুত বের হয়ে যাওয়াই ভালো। বের হওয়ার সময় ডান পা আগে বের করবে। কারণ ডান পা আগে বের করা সুন্নত। আর বের হয়ে এই দুআ পড়বে–

غُفْرَانَكَ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করছি। –জামে তিরমিযী, হাদীস ৭; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩০

আজ এতটুকুই। আগামীতে আবার দেখা হবে– ইনশাআল্লাহ। ●

Scanned by CamScanner

পাথর সালাম দেয় । মুহাম্মাদ ফজলুল বারী ।

তুমি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছ, হঠাৎ সালামের আওয়াজ– কে যেন তোমাকে সালাম দিচ্ছে। আশেপাশে তাকালে। নাহ্, কাউকে তো দেখা যাচ্ছে না। কে সালাম দিল? আমি তো নিজ কানে শুনলাম। নিজ কানকে কি আর অবিশ্বাস করা যায়। কোনো জিন সালাম দিল নাকি! নাহ্, কোনো জিন সালাম দেয়নি; সালাম দিয়েছে একটি পাথর। তুমি কি কখনো এমন কাহিনী শুনেছ– পাথর সালাম দেয়?

তুমি বলতে পার পাথর আবার সালাম দেয় কীভাবে? ওর কি যবান আছে? ও কি কিছু বলতে পারে? হাঁ, ওরও যবান আছে। ওর কথা আমরা শুনতে পাই না, বুঝতে পারি না। পৃথিবীর সবকিছু –প্রাণী হোক আর প্রাণহীন জড়বস্তু– আল্লাহ্র তাসবীহ পাঠ করে, কিন্তু আমরা শুনতেও পাই না, বুঝতেও পারি না।

ওরা আল্লাহ্র তাসবীহ পড়ে, কিন্তু আমাদের মত কথা বলতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ্ যখন ওদের যবান খুলে দেন তখন ওরাও মানুষের মত কথা বলতে পারে, মানুষ ওদের কথা শুনতে পারে, বুঝতে পারে।

আমরাও কথা বলতে পারতাম না, যদি আল্লাহ আমাদের কথা বলার শক্তি না দিতেন। আল্লাহ আমাদের কথা বলার শক্তি দিয়েছেন তাই আমরা কথা বলতে পারি। কথা বলার শক্তি আল্লাহ্র নিআমত। তাই আমাদের উচিত, ভালো কথা বলা, খারাপ কথা থেকে বেঁচে থাকা। সত্য কথা বলা, মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকা।

যাইহোক, এবার আমরা পাথর সালাম দেওয়ার কাহিনী শুনব–

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিযরতের পূর্বের কাহিনী। নবীজী তখন মক্কায়। এখনো নবুওতপ্রাপ্ত হননি। কিন্তু তিনি যে নবী হবেন এটা তো নির্ধারিত ছিল। মক্কার এক পাথর নবীজীকে চিনত। নবীজী যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতেন সে নবীজীকে সালাম দিত। নবীজী তার সালাম শুনতে পেতেন।

জাবির ইবনে সামুরা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إِنِّي لَأَعْرِفُ حَجَرًا بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُبْعَثَ إِنِّي لَأَعْرِفُهُ الْآنَ.

আমি মক্কার একটি পাথর চিনি, যা নবুওতের পূর্বে আমাকে সালাম দিত। এখনও আমি পাথরটিকে চিনতে পারি। –সহীহ মুসলিম, হাদীস ২২৭৭

সকল কাজ আল্লাহ্র জন্য, আল্লাহকে খুশি করার জন্য

ইবনে আবদুল খালেক

আমাকে তোমাকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ। আমাকে তোমাকে বিভিন্ন নিআমত দিয়েছেন আল্লাহ। পৃথিবীতে আমরা ছিলাম না; কিছুদিন পর থাকব না। আমরা আল্লাহ্র কাছ থেকে এসেছি আবার আল্লাহ্র কাছেই ফিরে যাব। আল্লাহ আমাদের এ জীবন দিয়েছেন পরীক্ষা করার জন্য– কে কত ভালো কাজ করতে পারে। কে কত ভালো মানুষ হতে পারে? কে কত আল্লাহ্র প্রিয় হতে পারে।

তো আমাদের এ জীবন পরীক্ষার জন্য। আল্লাহ্ দেখছেন, কে ভালো কাজ করে, কে মন্দ কাজ করে। সাথে সাথে আল্লাহ এটাও দেখছেন, আমরা যে ভালো কাজ করি, তা কি আল্লাহকে খুশি করার জন্য করি নাকি মানুষকে দেখানোর জন্য করি। আমি যেমন নিয়ত করব তেমন পুরস্কার পাব। আল্লাহকে খুশি করার নিয়তে করলে আল্লাহ পুরস্কার দিবেন, চির সুখের জান্নাত দিবেন।

হযরত ওমর রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি–

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.

আমলের প্রতিদান দেয়া হবে নিয়ত অনুযায়ী। প্রত্যেকে তা-ই পাবে, যা সে নিয়ত করেছে। –সহীহ বুখারী, হাদীস ১

মুমিন বুদ্ধিমান। সে আল্লাহকে খুশি করার জন্য ভালো কাজ করে; আল্লাহ্কে খুশি করার জন্য মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকে। কারণ, আমাদের ভালো কাজের ও মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার পুরস্কার তো দিবেন আল্লাহ। সুতরাং আমার সব কাজ হবে আল্লাহ্র জন্য, আল্লাহকে খুশি করার জন্য।

আল্লাহ্র জন্য এবং আল্লাহকে খুশি করার জন্য কোনো কাজ করাকে বলে ইখলাস। যে কোনো আমল কবুল হওয়ার জন্য ইখলাস জরুরি।

সুতরাং আমি সব কাজ করব আল্লাহ্র জন্য, আল্লাহকে খুশি করার জন্য। কারণ, আল্লাহই আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আমাকে সকল নিআমত দান করেছেন। মৃত্যুর পর আমি তাঁর কাছেই ফিরে যাব। তিনিই আমাকে আমার আমলের পুরস্কার দিবেন। ●

নবীজীর দস্তরখানে

আবু আহমাদ

৩৪. যে পান করাবে সে সবার শেষে পান করবে

মুহাম্মাদের আব্বু আজ হজ্ব থেকে ফিরেছেন। সাথে এনেছেন যমযমের পানি। প্রতিবেশীরা তাঁর সাথে দেখা করতে এসেছেন। আব্বু মুহাম্মাদকে বললেন, বাবা সবাইকে যমযমের পানি পান করাও। যমযমের পানির বোতল এখনো খোলা হয়নি। মুহাম্মাদও এখনও যমযমের পানি পান করেনি। মেহমানদের জন্যই প্রথম খোলা হল। সে সবাইকে পান করানো শুরু করল। সে সবাইকে পান করাচ্ছে ঠিকই কিন্তু তার আর তর সইছে না। তার মনে চাইছে সবার আগে নিজে পান করি। কিন্তু সে তা করছে না। কারণ, সে এই হাদীস পড়েছে– নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا.

যে পান করাবে সে সকলের শেষে পান করবে। –জামে তিরমিযী, হাদীস ১৮৯৪; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৭২৫; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ৩৪৩৪

৩৫. পাত্রের ভাঙা স্থানে মুখ লাগিয়ে পান করব না

সালমান ও সাফওয়ান একসাথে দুপুরের খাবার খেতে বসেছে। সাফওয়ান পানি খাওয়ার জন্য গ্লাস হাতে নিল। রাখার সময় বেখেয়ালে গ্লাসটা কাত হয়ে পড়ে মুখের কাছে সামান্য একটু ভেঙে গেল। একটু পরে সালমান পানি খাওয়ার জন্য গ্লাসটা হাতে নিল। সে ভাঙা স্থানে মুখ লাগিয়ে পান করতে গিয়ে ঠোঁট কেটে গেল। এমনটি হত না, যদি সে ভাঙা স্থান খেয়াল করে পান করত।

যে পাত্রটি একেবারে ভেঙে যায়নি সে পাত্র আমরা ব্যবহার করতে পারি, কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে, ভাঙা স্থানে মুখ লাগিয়ে পান করা যাবে না।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাত্রের ভাঙা স্থানে মুখ লাগিয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন। –সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৭২২; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১১৭৬০; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৫৩১৫

Scanned by CamScanner

পর্দানশীন

কাউকে কষ্ট দিব না

বিনতে ইসমাঈল

কখনো কারো মনে কষ্ট দিব না। তা অনেক বড় গুনাহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার সাহাবীদেরকে বললেন, তোমরা কি জানো, নিঃস্ব কে? তাঁরা বললেন, আমরা তো নিঃস্ব বলতে তাকেই বুঝি, যার কোনো ধন-সম্পদ নেই। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, নিঃস্ব সে নয়, প্রকৃতপক্ষে নিঃস্ব হচ্ছে সে, যে কিয়ামতের দিন অনেক নামায- রোযা-যাকাতের নেকী নিয়ে আসবে, কিন্তু দুনিয়াতে সে একে গালি দিয়েছে, তাকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, এর মাল জোর করে দখল করেছে, ওর রক্ত প্রবাহিত করেছে অর্থাৎ তাকে হত্যা করেছে অথবা আহত করেছে, তাই সকল মাযলুম তার সেসব জুলুমের বদলা নিতে আসবে। আল্লাহ তাআলা তখন জুলুমের বদলা হিসেবে তার নেকীগুলো মাজলুমদের দিয়ে দিবেন। একপর্যায়ে তার সকল নেকী শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু জুলুমের বদলা নেওয়া এখনো শেষ হবে না। তখন মাজলুমের গোনাহগুলো চাপিয়ে দিয়ে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। –সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৫৮১

নাউযুবিল্লাহ! আল্লাহ্ আমাদের রক্ষা করুন। কত ভয়ানক শাস্তি জালেমের জন্য। এবার একটু চিন্তা করে দেখি। আমি কারো প্রতি জুলুম করছি না তো! আমার কারণে কেউ মনে কষ্ট পাচ্ছে না তো! আমি হয়ত কারো চেয়ে একটু বেশি সুন্দর, কিংবা আল্লাহ তাআলা হয়ত অনুগ্রহ করে আমার মাঝে কারো চেয়ে একটু বেশি মেধা দিয়েছেন, আমি কি শোকর করছি আল্লাহর এই নিআমাতগুলোর, নাকি আত্মগর্বে লিপ্ত থেকে অন্যের উপর অহংকার করছি? তাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করছি? আল্লাহ হয়ত আমাকে অন্যের চেয়ে বেশি সচ্ছলতা দান করেছেন। আমি হয়ত অন্য অনেকের চেয়ে স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাপন করছি। দামি দামি আসবাব-পত্র দিয়ে ঘর সাজাচ্ছি। কিন্তু এগুলোর বড়াই করে কারো মনে কষ্ট দিচ্ছি না তো! আমার অহংকারী কণ্ঠ কারো মনকে চুরমার করে দিচ্ছে না তো! আল্লাহ হয়ত আমাকে একটু সুযোগ দিয়েছেন কারো উপকার করার। আমার দ্বারা তার কোনো বান্দার উপকৃত হওয়ার। এই উপকারের খোঁটা দিয়ে আমি তার মনে কষ্ট দিচ্ছি না তো! তার হৃদয়টা দুঃখে ভরিয়ে দিচ্ছি না তো! না। আমার দ্বারা কারো উপকারের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আল্লাহর শোকর আদায় করতে হবে এবং তাঁর কাছে বিনীত হতে হবে। খোঁটা দিয়ে এই উপকারের সওয়াব নষ্ট হওয়া থেকে আমাকে সতর্ক থাকতে হবে।

আমার মাঝে হয়ত অনেক প্রতিভা আছে। আমি হয়ত কারো থেকে একটু বেশি শিক্ষিত, অনেক গুণের অধিকারী। বিভিন্ন কাজে অভিজ্ঞ, সে হয়ত আমার চেয়ে কম, তাই বলে আমি তাকে কটাক্ষ করছি না তো!

একটি পরিবারে অনেকজন নারী থাকে। আমি হয়ত সেই পরিবারের গৃহকর্ত্রী। এখন আমি কী আচরণ করছি তাদের সাথে! নিজেকে সবার উপরে কর্তৃত্ববান মনে করে তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করছি না তো! যে একটু কর্মে অপটু, বুঝবুদ্ধি কম তাকে সর্বদা তাচ্ছিল্যের চোখে দেখছি না তো! সবার সামনে তার বিভিন্ন অপটুতা এবং বুঝবুদ্ধির কমতির কথা বলে তাকে লজ্জিত করছি না তো!

আমাদের ঘরে যখন নতুন কোনো মেয়ে আসে, যেমন, আমার পুত্রবধূ– তার সাথে আমি কেমন আচরণ করি! নতুন মানুষ হিসেবে আমার ঘরে তার অনেক ভুলত্রুটি হতে পারে। সে হয়ত শুরুতেই এই ঘরের অনেক বিষয় ঠিক মতো বুঝে উঠতে পারবে না বা বুঝতে সময় লাগবে। আমাকে তখন তার সহযোগিতা করতে হবে। তাকে সাহস দিতে হবে। কিন্তু তা না করে আমার ঘরে পা দেওয়ার সাথে সাথেই আমি তার দোষত্রুটি ধরতে ব্যস্ত হয়ে পড়ছি না তো! তার পরিবার পরিজন নিয়ে নানান নেতিবাচক কথা বলে তার মনে আঘাত করছি না তো! বিভিন্নভাবে তার মনে আমার সম্পর্কে ভীতিকর ধারণা সৃষ্টি করছি না তো! তার মা-বাবা, ভাই-বোনের সাথে খারাপ ব্যবহার করছি না তো!

আমি যদি ভাবি আমি ছেলের মা। সমাজে মেয়ের মায়ের চেয়ে ছেলের মায়ের কদর বেশি। মেয়ের মায়ের উপর ছেলের মায়ের প্রভাবও থাকে বেশি। তাই আমার মনোরঞ্জনের জন্য, আমার সন্তুষ্টির জন্য মেয়ের সাথে সাথে মেয়ের মাকে ও পরিবারকেও দিনরাত সচেষ্ট থাকতে হবে। আমার চাহিদা মতো আচরণ তাদের থেকে না পেলে মেয়েকে এবং তার পরিবারকে যা খুশি আমি করতে পারব, বলতে পারব। আর তারা মেয়ের পরিবার হিসেবে বিনাবাক্যে তা মেনে নিবে– এটি জুলুম। আমি সেই জুলুম তাদের সাথে করছি না তো!

তেমনিভাবে আমার ভ্রাতৃবধূর সাথে, তার পরিবারের সাথে এমন আচরণ করছি না তো! পিতৃগৃহে যখন বেড়াতে আসি, তার কাছে অযথা অন্যায় আবদার করছি না তো! তার কোনো আচরণ আমার মনমতো না হলে তার উপর মানসিক কোনো চাপ সৃষ্টি করছি না তো! তাকে নিয়ে নানান কু-কথা বলে তার প্রতি সবার মন বিষিয়ে তুলছি না তো!

আবার আমি যদি বধূ হয়ে থাকি তাহলে আমি কি আমার স্বামীর পরিবারের সাথে সুন্দর আচরণ করছি? তাদের শ্রদ্ধার নজরে দেখছি? তাদের উপর অন্যায় অসঙ্গত কোন কর্তৃত্ব চালাচ্ছি না তো! স্বামীর অন্তরে তার মা-বাবা, ভাই-বোন সম্পর্কে কোনো খারাপ ধারণা সৃষ্টি করছি না তো! তাদের প্রতি কুধারণা সৃষ্টি করে তার মাঝে এবং পরিবারের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করছি না তো! তার পরিবার যদি ভেবে থাকে,

Scanned by CamScanner

আমার সাথে যেমন খুশি তেমন ব্যবহারের সুযোগ তাদের রয়েছে, তা যেমন ভুল হবে, তেমনি আমি যদি ভেবে থাকি, তার সাথে আমার বিবাহের কারণে তার উপর একমাত্র আমার অধিকার থাকবে– তাও তেমন ভুল হবে। তাই তার উপর সেই অধিকারের দোহাই দিয়ে চাপ প্রয়োগ করে তাকে যদি তার মা-বাবা, ভাই-বোন থেকে আলাদা করে দেই, তাহলে তা হবে সম্পূর্ণ জুলুম। আমি সেই জুলুমে লিপ্ত নই তো!

আমার ঘরে হয়ত কাজের মানুষ আছে। তার সাথে আচরণের ব্যাপারে আমি কতটুকু সতর্ক! তার সাথে জুলুম না করার ব্যাপারে তো আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুশয্যায়ও তাকীদ দিয়ে গেছেন। তার ঘাম শুকানোর পূর্বেই তাকে তার ন্যায্য পাওনা দিয়ে দিতে বলেছেন। তার ভুলত্রুটিগুলো সত্তর বার মাফ করার কথা বলেছেন। তো আমি কি পালন করছি আমার প্রিয় নবীজীর অসিয়তগুলো। নাকি তার বিপরীত করছি? আমাকে ভাবতে হবে, সেও আমার মতোই রক্তমাংসে গড়া মানুষ। তার শরীরও আমার শরীরের মতো। হৃদয়টাও আমার হৃদয়ের মতো। সুতরাং আমার শরীর এবং হৃদয়ের সাথে আমি যেমন আচরণ করি, সেগুলোর ব্যাপারে আমি যতটুকু সতর্কতা অবলম্বন করি, তেমন আচরণ ও সতর্কতা তার ক্ষেত্রেও জরুরি। তার মাঝে আর আমার মাঝে পার্থক্য তো এতটুকুই, আমাকে আল্লাহ সচ্ছল পরিবারে জন্ম দিয়েছেন আর তাকে দিয়েছেন অসচ্ছল পরিবারে। সেই সুবাদে আমি পরিবারের মাঝে থাকতে পারছি। আমার চাহিদামতো সব পাচ্ছি। পড়ালেখা করে শিক্ষিত হতে পারছি। কিন্তু দরিদ্রতার কারণে তাকে আমার বাসায় কাজ করতে হচ্ছে। পড়ালেখার ইচ্ছে থাকলেও পারছে না। কিন্তু সে আমার বাসার খাদেমা হলেও তাকে আমার মুসলিম বোন মনে করতে হবে। তার সাথে কোমল ও ইনসাফের আচরণ করতে হবে। তা না করে তার সাথে আমি পাশবিক আচরণ করছি না তো! সাধ্যের বাইরে কাজ দিয়ে তার উপর চাপ সৃষ্টি করছি না তো! ঠিকঠাকভাবে কাজ না করতে পারলে তাকে বকাঝকা, গালমন্দ, শারীরিক নির্যাতন করছি না তো! আমি উৎকৃষ্ট মানের খাবার খেয়ে তাকে বাসি পচা খাবার খেতে দিচ্ছি না তো! জামা কাপড় কেনার সময় আমার জন্য সুন্দর দামী পোশাক কিনছি আর তার জন্য যাচ্ছেতাই নিম্নমানের পোশাক কিনছি না তো! আমি খাটে শুয়ে তাকে মেঝেতে অথবা রান্না ঘরে গরমের মাঝে শুতে দিচ্ছি না তো! দিনরাত তাকে একের পর এক কাজে ব্যস্ত রেখে তার বিশ্রাম, ঘুম, বিনোদনে বিঘ্ন ঘটাচ্ছি না তো! সে পড়তে চাইলে বা পড়ার মেধা থাকলে তাকে পড়তে বাধা দিচ্ছি না তো!

সবার সাথে মুআমালার ক্ষেত্রে আমাকে এভাবে একেক করে মুহাসাবা করতে হবে। আমাকে প্রতিটি মুহূর্ত সতর্ক থাকতে হবে। আমার কারণে কেউ জুলুমের শিকার হচ্ছে না তো! আমার জীবনের পণ হোক– আমি কাউকে কখনো কষ্ট দিব না। কারো উপর জুলুম করব না। কারণ, জুলুম এমন এক বিষয়, যার পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব কিয়ামতের দিন আমাকে দিতে হবে। জুলুমের কারণে আমার নেকীগুলো সেদিন মাজলুমদেরকে দিয়ে তাদের পাপগুলো আমার উপর চাপিয়ে আমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। কতটুকু নেক আমলই বা আমি করতে পারছি, তাও যদি এভাবে বরবাদ হয়ে যায়, তাহলে আমার কী হবে? আমি তো তখন সত্যিই নিঃস্ব, চিরনিঃস্ব। কারো জুলুম বা পাওনা নিয়ে যেন আমাকে কিয়ামতের মাঠে হাজির হতে না হয়; আল্লাহ আমাকে হেফাজত করুন– আমীন। ●

হযরত মাওলানা আবদুল হাই পাহাড়পুরী রহঃ প্রবর্তিত

নূরিয়া পদ্ধতিতে মুআল্লিম প্রশিক্ষণ

(১লা রমযান থেকে ২০শে রমযান)

কেন্দ্র ১ : মাদ্রাসা দারুল কুরআন
নূর নগর (ফোর্ডনগর), খালপাড়া, ধল্লা, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ।
যাতায়াত : ফুলবাড়িয়া বাসস্ট্যান্ড থেকে রিক্সাযোগে ফুলবাড়িয়া বাজার নদীর ঘাট, নদী পার হয়ে মাদ্রাসা।
অথবা হেমায়েতপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে রিক্সাযোগে মাদ্রাসা।
০১৯৮১০১৫৩৫৭, ০১৭১০৭৬৮৮৭

কেন্দ্র ২ : মাদ্রাসা আরাবিয়া মিফতাহুল উলুম
৯২ লুৎফর রহমান লেন, সুবেদারঘাট, আলুবাজার, ঢাকা।
যাতায়াত : গুলিস্তান থেকে সদরঘাটের দিকে রিক্সায় অথবা পায়ে হেঁটে সুরিটোলা স্কুলের বিপরীতে সুবেদারঘাট জামে মসজিদ।
০১৭৩৯১৯৭৪৪৮

★ প্রশিক্ষণ ও থাকা খাওয়া খরচ ২০০০ টাকা।
★ প্রশিক্ষণ শেষে উত্তীর্ণদেরকে সনদ প্রদান করা হবে।
★ প্রশিক্ষণ শেষে যোগ্যতা বিবেচনা করে খিদমতে নিয়োগের ফিকির করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

নিবেদক :
মাওলানা আশরাফুজ্জামান পাহাড়পুরী
পরিচালক, আল-মারকাযুল ইলমী বাংলাদেশ।
মোবা: ০১৮১৬৬২৬৬১৮, ০১৯৭৬৬২৬৬১৮

ব্যবস্থাপনায় : আল-মারকাযুল ইলমী বাংলাদেশ
(পবিত্র কুরআনের শিক্ষা সম্প্রসারণে নিবেদিত একটি প্রতিষ্ঠান)

সুখবর ! সুখবর !! সুখবর !!!

বিশ্ববিখ্যাত দা'য়ী হযরত মাওলানা কালিম সিদ্দিকী দা.বা. এর রচিত বইসমূহ সহ হিলফুল ফুযুল প্রকাশনীর ২২২০ টাকা মূল্যের মোট ৩০টি।
বই পাওয়া যাচ্ছে মাত্র ৮৯০

বইসমূহ

১. হিন্দু থেকে মুসলমান (আলোর পথে সিরিজ ১-৩)। ২. হিন্দু থেকে মুসলমান (আলোর পথে সিরিজ-৪)। ৩. মুক্তি কোন পথে। ৪. নবীজীর আদর্শ ও আমাদের জীবন বাস্তবতা। ৫. বড় দিনের উপহার। ৬. হিন্দু ভাইদের দাওয়াত দেয়ার পথ ও পদ্ধতি। ৭. সহযোগী হও প্রতিপক্ষ হয়ো না। ৮. নাজাতদাতা কে যীশু না ঈশ্বর। ৯. হাদিয়ায়ে দাওয়া ১০. খ্রিস্টানদের প্রশ্ন মুসলমানদের উত্তর। ১১. খ্রিস্টান ভাইদের প্রতি জিজ্ঞাসা। ১২. মাওলানা কালিম সিদ্দিকী দা.বা. এর আত্মজীবনী মূলক সাক্ষাতকার। ১৩. বাংলা নববর্ষ অজানা বৈশাখ। ১৪. সত্যের দাওয়াত। ১৫. খ্রিস্টবাদ সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন কিছু কথা। ১৬. খ্রিস্টান মুসলিম সংলাপ। ১৭. তুহফায়ে দাওয়াত। ১৮. দাওয়াত সম্পর্কিত চল্লিশ হাদিস। ১৯. ত্রিশ হাজার খ্রিস্টানের গুরু যেভাবে দ্বীনের মুবাল্লিগ। ২০. বাইবেলের অজানা কাহিনী। ২১. বলবীর সিং (মাস্টার আমের) এর সাক্ষাৎকার। ২২. আল কুরআনে যীশু ও খ্রিস্টধর্ম। ২৩. হিন্দু মুসলিম সংলাপ। ২৪. আল্লাহ কে? ২৫. বাইবেলে যীশু - ঈশ্বর ও শেষ নবীর পরিচয়। ২৬. দাওয়াতের ফিকির এবং আমলের ময়দান। ২৭. ইসলাম কাদের ধর্ম। ২৮. আল্লাহর শাস্তি। ২৯. দাওয়াত তাবলিগ শাহাদাত ও এসলাহ। ৩০. দাওয়াতের কর্ম পদ্ধতি।

যোগাযোগ:
ইসলামী দাওয়াহ ইনস্টিটিউট
মান্ডা শেষ মাথা, মুগদা, ঢাকা-১২১৪। ফোন: ০১৯১৭-৫৯৭৫৫১, ০১৭৯৮-৪১৮১০০
যাতায়াত : সায়েদাবাদ/মতিঝিল হয়ে মুগদা হয়ে মান্ডা শেষ মাথা।
বি. দ্র. : পার্সেলে বই পাঠানো হয়।

Scanned by CamScanner

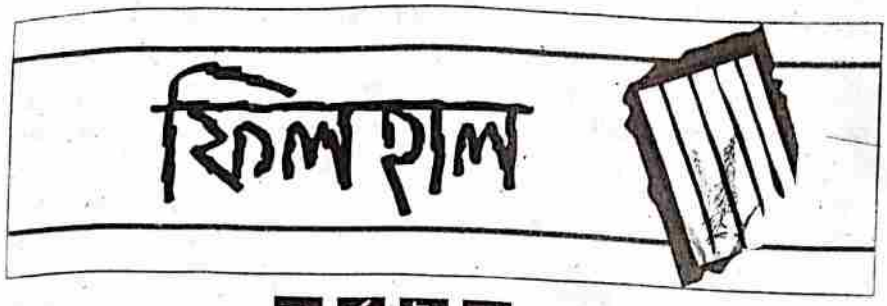

দু র্ঘ ট না

উড়োজাহাজ দুর্ঘটনা

সহমর্মিতা মানুষের এক মানবিক বৈশিষ্ট্য, অন্যের দুঃখ কষ্ট তাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়ে যায়। বিশেষত সেখানে যদি থাকে আপনত্বের কোনো দিক। এই চেতনা ও সংবেদন মানুষকে দেয়া আল্লাহ তাআলার এক বড় দান, মানবতার এক বড় বৈশিষ্ট্য। গত ১২ মার্চ সোমবার দুপুরে নেপালের ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বাংলাদেশের উড়োজাহাজ বিধ্বস্ত হওয়ার পর গোটা দেশেই নেমে এসেছিল শোকের ছায়া। ইউএস বাংলার ঐ বিমানটিতে ৪ জন ক্রু ও ৬৭ জন যাত্রী ছিলেন। ৩২ বাংলাদেশী, ৩৩ নেপালী ছাড়াও ছিলেন মালদ্বীপের ১ জন ও চীনের ১ জন নাগরিক। সর্বমোট ৭১ জনের মধ্যে ৫১ জনই ঐ দুর্ঘটনায় নিহত হন। আহতদের মধ্যে ১০ জন বাংলাদেশী, ৯ জন নেপালি ও ১ মালদ্বীপের নাগরিক। দুর্ঘটনায় বিমানটির পাইলট ও কো-পাইলট দুজনই নিহত হন। বলা হচ্ছে, ১৯৮৪ সালের পর থেকে এটিই কোনো বাংলাদেশী যাত্রীবাহী উড়োজাহাজের বড় দুর্ঘটনা।

সঙ্গত কারণেই এই দুর্ঘটনার পর নানাবিধ আলোচনা পর্যালোচনা হচ্ছে। নেপালের ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ব্যবস্থাপনাগত নানা সীমাবদ্ধতা সেই আলোচনায় উঠে এসেছে। একে তো বিমানবন্দরটি পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ার কারণে ঝুঁকিপূর্ণ। দ্বিতীয়ত প্রযুক্তিগত ও ব্যবস্থাপনাগত দিক থেকেও তা দুর্বল। বাংলাদেশী উড়োজাহাজটির বিধ্বস্ত হওয়ার পেছনে এই বিষয়টিও আলোচনায় আসছে।

দুর্ঘটনা কখনো কাম্য নয় এবং তা অবহেলা করার মতো বিষয়ও নয়। এর সঠিক কারণ নির্ণয় করে ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। এক্ষেত্রে আত্মসমালোচনাও অতি প্রয়োজন।

বিমান দুর্ঘটনার সূত্রে অন্যান্য যানবাহনের দুর্ঘটনাও আলোচিত হয়েছে। দৈনিক প্রথম আলোতে আনিসুল হক লিখেছেন... সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর শঙ্কা সবচেয়ে বেশি। সারা পৃথিবীতে বিমান দুর্ঘটনায় ২০১৭ সালে মৃত্যুর সংখ্যা ৫৯, ২০১৬ সালে ২৫৮ আর ২০১৫ সালে ১৮৬, ২০১৪ সালে ৬৯১। সূত্র : স্টাটিস্টা ডটকম। এটা সারা দুনিয়ার হিসাব। আর ২০১৭ সালের প্রথম ছয় মাসে শুধু বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছে ২২৯৭ জন। এটা সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে বের করা হিসাব। ২০১৬ সালে দেশে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছে ৬ হাজার ৫৫ জন। ২০১২ পর্যন্ত ১৪ বছরে মারা গেছে প্রায় ৪৫ হাজার মানুষ। এটা রীতিমতো গণহত্যা কিংবা মহামারির পর্যায়ে গেছে। ... (দৈনিক প্রথম আলো, ১৬-০৩-১৮)

এরপর তিনি নৌপথে দুর্ঘটনা ও ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যুরও একটি পরিসংখ্যান দিয়েছেন। তার শেষ প্যারাটি এরকম– 'জয় গোস্বামীর একটা কবিতা আছে– 'এই মালঞ্চ নিয়তিময়, ফুল ধরেছে মৃত্যুগাছে, বাইরে যাওয়ার রাস্তা কোথায় শুধাও না ঝাউ পাতার কাছে।' ঝাউগাছের পাতার কাছে শুধোলে সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে না। সমাধান তাদেরই বের করতে হবে, যাদের উপর ভার দেওয়া হয়েছে। তোমার পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শক্তি ... (প্রাগুক্ত)

দায়িত্ব পালনে অবহেলা একটি পাপ আর অদক্ষ ও অযোগ্য লোকের উপর দায়িত্ব অর্পণ আমানতে খিয়ানত। অথচ সর্বত্র যেন এরই চর্চা। এই পাপাচারের কুফল ভুগতে হচ্ছে গোটা জাতিকে।

এখন প্রত্যেকে নিজেকে প্রশ্ন করা দরকার, অরাজকতা ও অব্যবস্থাপনার এই সর্বগ্রাসী বিস্তার কেন আমাদের উপর চেপে বসেছে, যা হরণ করেছে আমাদের সুখ-শান্তি-নিরাপত্তা। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

অর্থাৎ মানুষকে দেয়া সুখ-শান্তি ও অন্যান্য নিআমত ঐ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত মানুষ নিজে তার বিশ্বাস ও কর্মকে পরিবর্তন না করে। এটা আল্লাহ তাআলার এক সাধারণ নীতি। মানুষ যখন ঈমানের বদলে কুফর, আমানতের পরিবর্তে খিয়ানত এবং ইতাআত-আনুগত্যের বদলে ফিস্‌ক ও নাফরমানী অবলম্বন করে তখন তার জীবনে শান্তি ও নিরাপত্তার বদলে শঙ্কা ও অশান্তি নেমে আসে। এ নিয়ম ব্যক্তি জীবনে যেমন সত্য তেমনি সত্য সমষ্টিগত জীবনেও। আমাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের অশান্তি-অবক্ষয় সম্পর্কে কমবেশি সকলেই উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত। জীবনের সর্বক্ষেত্রে এক সর্বগ্রাসী অবক্ষয়-অব্যবস্থাপনার বিস্তার এখন অতি আত্মকেন্দ্রিক মানুষকেও শঙ্কিত করে তুলছে।

এই অবস্থায় আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য, নিজের দিকে তাকানো, এরপর সমাজের দিকে তাকানো। আমাদের কর্মে ও বিশ্বাসে কী কী পরিবর্তন আমরা এনেছি তা একটু চিন্তা-ভাবনা করা দরকার। তাহলেই বোঝা যাবে, মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও এই সর্বগ্রাসী অরাজকতা আর সেই অরাজকতার ফলশ্রুতিতে 'গণহত্যা' বা 'মহামারি'র পর্যায়ের প্রাণহানী আর দাবানলের মতো অশান্তি কেন আমাদের ঘিরে রেখেছে।

এই জীবন ও জগৎ যাঁর সৃষ্টি, যাঁর ইচ্ছায় তা পরিচালিত, তাঁরই আনুগত্যের দিকে আবার আমাদের ফিরতে হবে। তাহলে আবারো আমাদের জীবনে ফিরে আসতে পারে তাঁর দানসমূহ।

মূল প্রসঙ্গে আসি। ইউএস বাংলার উড়োজাহাজটির পাইলট ক্যাপ্টেন আবিদ সুলতান ছিলেন একজন দক্ষ পাইলট। ১৯৮৪ সালে তিনি বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে যোগ দেন। ২০ বছর চাকরি করার পর ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্সে যোগ দেন ২০১৫ সালের ৬মে। তিনি এই বিমান সংস্থার ড্যাশ এইট

"মানুষের কখনো নিজ বিদ্যা-বুদ্ধি ও যোগ্যতার উপর পূর্ণ আস্থাশীল হওয়া উচিত নয়। যোগ্যতার পাশাপাশি সতর্কতা ও নিয়মকানুন মেনে চলাও কাম্য। সর্বোপরি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখা এবং তাঁর দয়া ও করুণার প্রত্যাশী থাকা অতি প্রয়োজন। একমুহূর্তের জন্যও তিনি যদি বুদ্ধি ও চেতনায় পর্দা ফেলে দেন তাহলেই মানুষ শেষ হয়ে যেতে পারে।"

লিখেছেন– গোলাম এলাহী

Scanned by CamScanner

কিউ ৪০০ উড়োজাহাজের পাইলট দলের প্রধান ছিলেন। পাশাপাশি এ উড়োজাহাজের পাইলটদের প্রশিক্ষকের দায়িত্বেও ছিলেন। নেপালের ত্রিভুবন বিমানবন্দরে তিনি শতাধিক বারেরও বেশি বিমান নিয়ে ওঠানামা করেছেন। অথচ এখানেই তিনি দুর্ঘটনায় আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারালেন।

মানুষের কখনো নিজ বিদ্যা-বুদ্ধি ও যোগ্যতার উপর পূর্ণ আস্থাশীল হওয়া উচিত নয়। যোগ্যতার পাশাপাশি সতর্কতা ও নিয়মকানুন মেনে চলাও কাম্য। সর্বোপরি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখা এবং তাঁর দয়া ও করুণার প্রত্যাশী থাকা অতি প্রয়োজন। একমুহূর্তের জন্যও তিনি যদি বুদ্ধি ও চেতনায় পর্দা ফেলে দেন তাহলেই মানুষ শেষ হয়ে যেতে পারে।

বাংলাদেশের এই মর্মান্তিক উড়োজাহাজ দুর্ঘটনায় যারা আহত-নিহত হয়েছেন তাদের সবার শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা। যে মুসলিম ভাই-বোন এই দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন তাদের জন্য আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে মাগফিরাত প্রার্থনা করছি। আল্লাহ তাদের মাফ করে দিন এবং তাদের আখিরাতের জীবনকে শান্তিময় করুন।

এই দুর্ঘটনার পর বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানেরা সমবেদনা জানিয়ে বার্তা দিয়েছেন। পত্রিকায় দেখলাম, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনও বাংলাদেশের নিহতদের জন্য শোক প্রকাশ করেছেন। তাদের শোক ও সমবেদনা প্রকাশের প্রতি মর্যাদা রেখেই বলতে ইচ্ছে হয়, এই একান্ত মানবিক বিষয়গুলোও কি কারো জীবনে একটা নিয়মসর্বস্ব অভিনয়ে পরিণত হতে পারে? বাংলাদেশের উড়োজাহাজ দুর্ঘটনায় আগুনে পুড়ে মারা যাওয়া মানুষগুলোর প্রতি সমবেদনা জানানোর সময় পুতিনের কি মনে পড়েছে সিরিয়ার শত শত অগ্নিদগ্ধ নারী-শিশুর কথা, যারা রাশিয়ান আর্মির বিমান থেকে ছোড়া বোমার আঘাতে মর্মান্তিকভাবে অগ্নিদগ্ধ হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন? শত শত আহত শিশুর অশ্রু ও রক্তমাখা নিষ্পাপ মুখগুলো কি তার দেখার সুযোগ হয়েছে? সুযোগ হয়েছে বাশার আলআসাদের, যিনি নিজেকে মনে করেন ঐ জাতির, ঐ ভূখণ্ডের 'নেতা' ও রাষ্ট্রনায়ক?

কথা শুধু দীর্ঘই হয়ে যায়! আমাদের উড়োজাহাজ দুর্ঘটনায় নিহতদের প্রসঙ্গে আনিসুল হক লিখেছেন, '৫১ তো সংখ্যা নয়। ৫১ জন মানুষ। তাদের প্রত্যেকের আছে জন্মের ইতিহাস, প্রথম হাসা, প্রথম কাঁদা, প্রথম কথা বলা, প্রথম হাঁটা। স্কুলে যাওয়া, আছেন বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন, দূরের বন্ধু, কাছের বন্ধু, আমরা সইতে পারি না। তাদের জন্য বুকটা ভেঙ্গে আসে, হৃদয় বিদীর্ণ হয়। যাঁরা বেঁচে আছেন তাদেরও কত কষ্ট করতে হচ্ছে, কেউবা স্বজন হারিয়েছেন, কেউবা অগ্নিদগ্ধ হয়ে যন্ত্রণা সইছেন। আরও একটা ভাবনা চলে আসে। ওই ফ্লাইটে আমিও থাকতে পারতাম।

লেখককে ধন্যবাদ, এইটুকু মমতা ও মানবিকতা তো একজন মানুষের থাকতেই হবে। শুধু এইটুকু নিবেদন যে, এই মানবিকতা যেন মিয়ানমার, কাশ্মীর, ফিলিস্তিন, সিরিয়ায় ও অন্যান্য ভূখণ্ডের মানুষগুলোর ক্ষেত্রেও আমাদের মনে জাগে। তারাও তো মানুষ। তাদেরও প্রত্যেকের আছে জন্মের ইতিহাস...।

কেন যেন মনে হয়, আমাদের অনেকেরই মমতা ও মানবিকতায় কিংবা তার প্রকাশে সংকীর্ণতার ছায়াপাত ঘটছে। যাইহোক, আহত-নিহত সকলের জন্য আবারো গভীর সমবেদনা জানিয়ে এখানেই শেষ করছি। ●

সাম্প্রদায়িকতা

'শ্রীলংকার সংবিধানে ২৯ (২) ধারা ও উপধারায় সংখ্যালঘু অধিকার ও ধর্মীয় নিরাপত্তার কথা আছে। বৌদ্ধ-মহানায়কেরা সেই সংবিধানেরও সংশোধন দাবি করছেন। মহানায়কেরা আরো বলছেন, 'এ দেশে কুরআন নিষিদ্ধ করা উচিত। যদি আপনারা না করেন আমরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচারণা চালাব।' বিশ্লেষকগণ বলছেন, শ্রীলংকায় এর আগেও এধরনের মুসলিমবিরোধী দাঙ্গা হয়েছে। মিয়ানমারের 'মাবাথা'র মতো শ্রীলঙ্কাতেও আছে বুদুবালা সেনা (বিবিএস) নামে উগ্রবাদী বৌদ্ধ সংগঠন, যাদের বিরুদ্ধে মুসলিম-বিদ্বেষ ছড়ানো ও মুসলিমবিরোধী প্রচারণার অভিযোগ রয়েছে।'

বৌদ্ধ-তাণ্ডব

লিখেছেন- আব্দুল্লাহ নসীব

মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকে শ্রীলংকার মুসলিমেরা চরম আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন। মুসলমানদের মসজিদ, বাড়িঘর ও ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে একের পর এক হামলা চালিয়ে গেছে উগ্রপন্থী বৌদ্ধরা। সপ্তাহব্যাপী মুসলিমবিরোধী দাঙ্গায় আগুন দেয়া হয়েছে প্রায় অর্ধশত ঘরবাড়িতে, ভাংচুর করা হয়েছে দুই শ'রও বেশি দোকান ও প্রতিষ্ঠান। হামলা হয়েছে বিভিন্ন জায়গার চারটি মসজিদে।

শ্রীলংকার সংবিধানে ২৯ (২) ধারা ও উপধারায় সংখ্যালঘু অধিকার ও ধর্মীয় নিরাপত্তার কথা আছে। বৌদ্ধ-মহানায়কেরা সেই সংবিধানেরও সংশোধন দাবি করছেন। মহানায়কেরা আরো বলছেন, 'এ দেশে কুরআন নিষিদ্ধ করা উচিত। যদি আপনারা না করেন আমরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচারণা চালাব।' বিশ্লেষকগণ বলছেন, শ্রীলংকায় এর আগেও এধরনের মুসলিমবিরোধী দাঙ্গা হয়েছে। মিয়ানমারের 'মাবাথা'র মতো শ্রীলঙ্কাতেও আছে বুদুবালা সেনা (বিবিএস) নামে উগ্রবাদী বৌদ্ধ সংগঠন, যাদের বিরুদ্ধে মুসলিম-বিদ্বেষ ছড়ানো ও মুসলিমবিরোধী প্রচারণার অভিযোগ রয়েছে।

২০১২ সালে এই সঙ্ঘের নেতারা তথাকথিত 'ধর্মান্তরকরণ' ও 'ইসলামী টেররিজম'-এর বিরুদ্ধে উসকানীমূলক র‍্যালি শুরু করে। ২০১৩ সালের শুরুতে প্রেসিডেন্ট মাহিন্দ রাজা পাকসে বিবিএস (বুদুবালা সেনা)-এর নেতাদের সাথে আলোচনা করে সিংহলি বৌদ্ধ ও ভিক্ষুদের সহিংসতা ও ধর্মীয় কারণে বিরোধে না জড়ানোর আহ্বান জানিয়েছিলেন। সে সময় চরমপন্থী ভিক্ষুরা যেসব দাবি তুলেছিল তার মধ্যে নিম্নোক্ত অযৌক্তিক দাবিগুলোও ছিল :

মধ্যপ্রাচ্যের সহায়তায় কোনো মসজিদ নির্মাণের অনুমতি না দেওয়া, কাউকে ইসলামধর্মে দীক্ষিত না করা, বোরকা নিষিদ্ধ করা, খাদ্যদ্রব্য ও কোনো বিষয়ের উপর সিলোন জমিয়াতুল উলামার হালাল সনদ প্রদান পদ্ধতি বাতিল করা ইত্যাদি।

এইসব প্রকাশ্য দাবি-দাওয়ায় চরমপন্থী ভিক্ষুদের সংকীর্ণতা, উগ্রতা ও অন্য ধর্মের অনুসারীদের স্বধর্ম পালনে বাধা দেওয়ার প্রবণতা একেবারেই স্পষ্ট।

২০১৩ সালে কান্ডি শহরে র‍্যালি করে রত্নপুর জেলার দশম শতাব্দীর একটি ঐতিহাসিক মসজিদে এই 'অপরাধে' হামলা চালানো হয় যে, এর পাশেই কুরাগালা বৌদ্ধ আশ্রম রয়েছে।

Scanned by CamScanner

সাম্প্রতিক দাঙ্গাতেও বিবিএস ও অন্যান্য সাম্প্রদায়িক সংগঠন বৌদ্ধদের জোর করে ইসলামধর্মে দীক্ষিত করার ধুয়া তুলেছে। অথচ দুই কোটির কিছু বেশি জনসংখ্যার দেশটিতে মুসলিম জনসংখ্যা মাত্র ৯ শতাংশ। বৌদ্ধরা ৭০ শতাংশ আর তামিল ১৩ শতাংশ, যার অধিকাংশই হিন্দু। এ থেকে বোঝা যায়, দাঙ্গা ছড়ানোর পেছনে কিছু মুসলিম যুবকের হাতে এক সিংহলি লরি ড্রাইভারের নিহত হওয়ার অভিযোগটিও একটি বাহানা মাত্র।

এই উগ্রপন্থী বৌদ্ধদের 'মানবিকতা'র মাত্রা বোঝার জন্য এই উদাহরণটি যথেষ্ট যে, গত বছর মিয়ানমারের মগদের নিষ্ঠুর নির্যাতনে বাধ্য হয়ে কিছু রোহিঙ্গা মুসলিম শ্রীলংকায় আশ্রয় নিতে শুরু করলে বিবিএস প্রকাশ্যে এর প্রতিবাদ করতে থাকে। এমনকি রোহিঙ্গাদের আশ্রয় নেয়া একটি বাড়িতেও তারা আক্রমণ চালায়। পরে পুলিশ আক্রান্ত পরিবারটিকে নিরাপত্তা দিয়েছে।

তবে একথা বলতেই হচ্ছে যে, মিয়ানমারের রাষ্ট্রীয় ছত্রছায়ায় মুসলিম জনগণের বিরুদ্ধে যে জাতিগত নির্মূল অভিযান পরিচালিত হয়েছে সে তুলনায় শ্রীলংকার পরিস্থিতি এখনো অপেক্ষাকৃত ভালো। শ্রীলংকার প্রশাসন ও পুলিশ দাঙ্গার বিরুদ্ধে জোরালো ব্যবস্থা নিয়েছে। সুশীল ও বুদ্ধিজীবীদেরও অনেকে এই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। শ্রিলঙ্কার সাবেক ক্রিকেট-অধিনায়ক কুমার সাঙ্গাকারা লিখেছেন, 'শ্রীলংকায় জাতিগত বা ধর্মীয় অবস্থানের কারণে কেউ হামলা বা হুমকির শিকার হতে পারে না। এখানে বর্ণ-বিদ্বেষ বা সহিংসতার কোনো স্থান নেই।'

এ থেকে বোঝা যায়, সরকার ও প্রশাসন ইচ্ছা করলে অন্যায় প্রতিরোধ করতে পারে। ৭০ শতাংশ বৌদ্ধ অধ্যুষিত শ্রীলংকায় সরকারের অজনপ্রিয় হওয়ার আশঙ্কা সত্ত্বেও অন্যায়-অত্যাচার রোধে দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন তা প্রশংসনীয়। দুর্বৃত্ত শ্রেণির অন্যায় দাবি-দাওয়া মেনে নেওয়ার ধারা শুরু হলে এর শেষ স্বজাতির ধ্বংসের মধ্য দিয়েই হতে পারে। তামিল বিদ্রোহীদের সাথে মিটমাট করে শ্রীলঙ্কা যখন কিছুটা স্থিতিশীলতার দিকে এগুচ্ছে এ সময় বৌদ্ধ উগ্রবাদীদের এইসব উচ্ছৃঙ্খলা যে দেশটিকে আবারো সংঘাতমুখর করে তুলতে পারে তা নিশ্চয়ই সে দেশের সরকার উপলব্ধি করেন।

তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ বৌদ্ধসম্প্রদায়ের সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতার যে মাত্রা তাতে নিশ্চিত থাকার কোনো সুযোগ নেই। এই সংকীর্ণতার মাঝে জাহিলিয়াতের সব নমুনা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সেই উগ্রতা, সেই বর্ণবাদ, সেই পৌত্তলিকতা। সিংহলি বৌদ্ধরা মনে করে তারাই দেশের সেরা সন্তান এবং এই ভূখণ্ডে একমাত্র তাদেরই অধিকার। তাদের এক রাজনৈতিক শ্লোগান– এক দেশ, এক রাষ্ট্র, এক বৌদ্ধ ধর্ম।

এই প্রেক্ষাপটে মুসলিম চিন্তাশীল দাঈদের ভবিষ্যত-করণীয় সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা অতি প্রয়োজন। ইসলামের সাম্য, উদারতা ও মানবিকতার প্রচারে ব্যাপক ব্যবস্থাগ্রহণ আও প্রয়োজন। মুসলিমদের প্রতি স্থানীয় অধিবাসীদের সহানুভূতি বৃদ্ধির প্রচেষ্টার পাশাপাশি বিশ্বের সব দেশের মুসলমানদের এখনই সোচ্চার হওয়া প্রয়োজন। বিশেষত যেসব মুসলিম দেশে শ্রীলংকানদের স্বার্থ রয়েছে ঐসকল মুসলিম দেশের নেতৃবৃন্দের দৃঢ় অবস্থান কাম্য।

অন্যান্য ভূখণ্ডের মুসলিম ভাই-বোনের অবস্থা থেকে নিজ ভূখণ্ডের ব্যাপারেও শিক্ষা নেয়া কর্তব্য। ইসলাম-বিরোধী অন্যায় অপপ্রচার, মুসলিম ভ্রাতৃত্বের চেতনাহারী নানা অপতৎপরতার বিষয়ে মুসলিম উলামা ও দাঈগণের এগিয়ে আসা প্রয়োজন। আল্লাহ তাআলা আমাদের

'প্রিন্স চার্লস বা রাজিব গান্ধির স্বীকারোক্তির প্রতি আমাদের আলাদা কোনো মোহ নেই। এইসকল স্বীকারোক্তিকে আমরা ইসলামের জন্য 'সনদ'ও মনে করি না। সূর্যকে সূর্য বলা তো আপন চক্ষুষ্মানতারই প্রমাণ দেওয়া। তাছাড়া এইসকল স্বীকারোক্তি দ্বারা ইসলাম সম্পর্কে সাধারণ ষড়যন্ত্রেও কোনো হেরফের হয় না। ভারতে রাজিব গান্ধির এই স্বীকারোক্তির আগে পত্র-পত্রিকার যে ইসলাম-বিরোধী অবস্থান ছিল এখন তাতে হ্রাস নয় বৃদ্ধিই ঘটেছে।'

প্রো পা গা ন্ডা

ইসলাম, সন্ত্রাস ও নারী-অধিকার

লিখেছেন– আব্দুল্লাহ আব্বাস নদভী

১৯৮৬-এর জানুয়ারি। ভারতে রাজিব গান্ধির প্রধানমন্ত্রিত্বের আমলে এক উত্তপ্ত পরিস্থিতি চলছিল। তালাকপ্রাপ্তা নারীর অধিকার সংক্রান্ত একটি বিল তখন পার্লামেন্টে ছিল। ঐ সময় এক তামিল পত্রিকার সাথে সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, আমাদের আইনের চেয়ে ইসলামী আইনে নারীর স্বার্থ ও অধিকারের নিরাপত্তা বেশি রয়েছে।

১৯৯৩-এর অক্টোবরে অক্সফোর্ডের ইসলামিক সেন্টারে বৃটেনের প্রিন্স চার্লস বক্তৃতা করতে গিয়ে বলেছিলেন, ইসলামের বিরুদ্ধে আমাদের পশ্চিমাদের এক সংকীর্ণতা হচ্ছে, কোনো কোনো জায়গার কিছু প্রান্তিক ঘটনাদৃষ্টে বলতে থাকি, ইসলাম নারীর অধিকার গ্রাহ্য করেনি, কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, আজ থেকে ১৪ শ বছর আগেই কুরআন নারীদের অধিকার দিয়েছে। মিরাছের অধিকার, ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকার, নিজের সম্পদ ব্যবহারের অধিকার, তালাকের ক্ষেত্রে সদাচার প্রাপ্তির অধিকার এবং এধরনের আরো অনেক অধিকার, যা আমার দাদীর সময় পর্যন্তও বৃটেনে একেবারে অভিনব ব্যাপার ছিল।

যুবরাজ চার্লসের পুরো বক্তৃতা প্রকাশিত হয় জিদ্দার ইংরেজি দৈনিক আরব নিউজে। তা পড়ে বোঝা যায়, তার অধ্যয়ন সামান্য নয়। তিনি ইসলামী জাহান সম্পর্কেও অবগত, কুরআন-হাদীসেরও কিছু কথা তার জানা। স্বভাবও বাস্তব-প্রিয়। ঐ বক্তৃতাতেই তার এ স্বীকারোক্তিও আছে যে, 'পশ্চিমারা লেবাননের গৃহযুদ্ধ এবং অল্পকিছু মানুষের চরমপন্থার আলোকেই ইসলামকে চিনতে চায়। এটা এক ভয়াবহ রকমের ভ্রান্তি।

আমরা কি পছন্দ করব যে, বৃটেনে সংঘটিত অপরাধ, হত্যা-ধর্ষণ-অপহরণ ও মাদকের বিস্তার দেখে কেউ বলুক, এইসব

Scanned by CamScanner

বৃটেনের ধর্ম ও ধর্মীয় শিক্ষার প্রভাব?'

তবে এই স্বীকারোক্তি কি ঘটনাচক্রের ব্যাপার, না বিশেষ দুরভিসন্ধিমূলক বোঝা কঠিন। কারণ ঠিক এ সময়েই বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী জন মেজরের একটি সরকারি চিঠি কীজানি কীভাবে হস্তগত করে এক উর্দু সাময়িকী প্রকাশ করে দিয়েছে। ঐ চিঠিতে তিনি তার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে নির্দেশনা দিয়েছেন, 'ইউরোপের যে দেশগুলো কমিউনিজমের পাঞ্জা থেকে মুক্ত হয়েছে ঐসব দেশে ইসলাম শক্তিশালী হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। এমনটা ঘটলে তা হবে কমিউনিজমের চেয়েও ভয়ানক ব্যাপার।

লাহোর থেকে প্রকাশিত মাসিক এশিয়ায় এই পত্রের ফটো ও তরজমা প্রকাশিত হয়েছে। এটি যদি সঠিক হয় –বাহ্যত ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম– তাহলে জন মেজর সাহেব যেন ইকবালের ভাষায় ইবলীসের প্রতিনিধিত্ব করেছেন–

الحذر آئین پیغمبر سے سو بار الحذر

সাবধান! পয়গম্বরের আইন থেকে শত বার সাবধান!!

আর দ্বিতীয় পংক্তি যেন যুবরাজ চার্লসের বক্তব্যের প্রতিনিধিত্ব করছে–

حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفریں

অর্থাৎ পয়গম্বরের আইন যেমন নারীর ইজ্জত-আব্রু রক্ষাকারী, তেমনি পুরুষের পৌরুষ নির্মাণকারী।

প্রিন্স চার্লস বা রাজিব গান্ধির স্বীকারোক্তির প্রতি আমাদের আলাদা কোনো মোহ নেই। এইসকল স্বীকারোক্তিকে আমরা ইসলামের জন্য 'সনদ'ও মনে করি না। সূর্যকে সূর্য বলা তো আপন চক্ষুষ্মানতারই প্রমাণ দেওয়া। তাছাড়া এইসকল স্বীকারোক্তি দ্বারা ইসলাম সম্পর্কে সাধারণ ষড়যন্ত্রেও কোনো হেরফের হয় না। ভারতে রাজিব গান্ধির এই স্বীকারোক্তির আগে পত্র-পত্রিকার যে ইসলাম-বিরোধী অবস্থান ছিল এখন তাতে হ্রাস নয় বৃদ্ধিই ঘটেছে। বৃটেনে মৌলবাদী ইসলামের যে জুজুর ব্যাপক প্রচার হয়েছে, অন্যান্য দেশেও রফতানি করা হয়েছে, তাতেও ক্রমবৃদ্ধিই ঘটে চলেছে। এসবের একমাত্র কারণ ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞতা নয়। নিছক অজ্ঞতাবশত হয়ে থাকলে তাদেরকে ইসলামের সঠিক রূপ দেখিয়ে দেয়া সম্ভব ছিল। বাস্তবতা হচ্ছে, এরা খুব ভালো করেই জানে এবং বোঝে। প্রিন্স চার্লসের ভাষায়– আমরা ভালো করেই জানি, ইসলামে প্রান্তিকতা নেই। আর যে অর্থে ইসলামকে সন্ত্রাসী ধর্ম বলা হয় তাতে মুসলমানদের কোনো ইজারাদারি নেই, অন্যান্য ধর্ম, যেমন খ্রিস্টধর্মেও তা আছে। অধিকাংশ মুসলমান এমন, যারা ধর্মের মৌলিক নিয়মকানুন পালন করেও জীবনের সাধারণ ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে খুবই ভারসাম্য রক্ষাকারী। তারা ধর্মে মধ্যপন্থার (امت وسط) প্রবক্তা।

কুরআনে কারীমের বাণী কতই না সত্য–

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا

তারা অন্যায় ও অহংবশত একে অস্বীকার করেছে। এদের অন্তর তা সত্য বলে বিশ্বাস করলেও। –সূরা নাহ্‌ল (২৭) : ১৪

[মাওলানা আবদুল্লাহ আব্বাস নদভীর কলামসমগ্র থেকে অনূদিত। অনুবাদে : ইবনে নসীব]

মাদরাসাতু আনাছ (রাঃ)

আমাদের বিভাগ

কেবলমাত্র প্রাথমিক ইসতিদাদের জামাত
তাইসির থেকে কাফিয়া-শরহেজামী পর্যন্ত
তবে এ বছর শুধু দুই জামাতে ভর্তি নেওয়া হবে

(ক) কাফিয়া- ভর্তি হওয়ার শর্তঃ ইলম ও আমলের প্রতি আগ্রহী ও আরবী এবারত পড়তে পারা ও মোটামুটি তরজমা করতে পারা।

(খ) নাহ্‌বেমীর-ভর্তি হওয়ার শর্তঃ ইলম ও আমলের প্রতি আগ্রহী এবং মিযান বা সমমানের কিতাব পড়া থাকতে হবে।

বিঃ দ্রঃ বেফাকের নেসাব অনুসরন করা হবে এবং বেফাক পরীক্ষায় অংশগ্রহন করানো হবে।

ভর্তির তারিখঃএখন থেকে শাওয়ালের ১০ তারিখ (তবে প্রতি ক্লাসে ১৫ জনের কোটা পূরণ হওয়া পর্যন্ত)

রমযানে নাহ্ সরফের কোর্স

২০শে শা'বান থেকে ২০শে রমযান পর্যন্ত তামরীন মূলক নাহ্-ছরফের কোর্স করানো হবে।

মাদরাসার ঠিকানা

গুলিস্থান, যাত্রাবাড়ী বা চিটাগাং রোড থেকে সাদ্দাম মার্কেট, তুষারধারা নেমে জিরো পয়েন্ট থেকে সামান্য পশ্চিম দিকে জামতলা জনাব, বজলু সাহেবের বিল্ডিং।

সার্বিক পরিচালনায়ঃ
মাওঃ মুহাঃ ওয়ালী উল্লাহ
মোবাঃ ০১৯১৬-৪২২৯৬০

আরবী ভাষা শিক্ষার্থীদের জন্য সুখবর!

মারকায যায়েদের উদ্যোগে আরবী সাহিত্যের বিষেশ কোর্স

* ১ম কোর্স (আরবী ভাষার খিদমতে আগ্রহীদের জন্য মুআল্লিম প্রশিক্ষণ) ২৫ রজব থেকে ১৫ শাবান পর্যন্ত।
* ২য় কোর্স (হাফেজ ছাত্রদের তারাবীহর সুবিধার্থে) ১৬-২৭ শাবান পর্যন্ত।
* ৩য় কোর্স (কাফিয়া থেকে সকলের জন্য) ১-১৮ রমজান পর্যন্ত

বিশিষ্ট আরবী সাহিত্যিক হযরত মাওলানা শহীদুল্লাহ ফজলুল বারী রাহ. লিখিত সাড়া জাগানো আরবী সাহিত্যের ৭টি কিতাব সুলভ মূল্যে বিক্রি হচ্ছে)

* الإنشاء الوظيفي (চিঠিপত্র, দরখাস্ত, মানপত্র, শোকবার্তা, বিজ্ঞাপন, প্রতিবেদন ইত্যাদি বিষয়ে অনুশীলনে আগ্রহীদের জন্য)
* الدروس العلاجية لأخطاء دارس العربية (আরবী বানানসহ নাহ্ সরফ ও ভাষাগত যাবতীয় ভুল শুদ্ধ করতে আগ্রহীদের জন্য)
* دروس التعبير من القرآن والحديث (কুরআন হাদিস থেকে আরবী ভাষা অনুশীলনে আগ্রহীদের জন্য)
* أسرار الجمل আরবীতে অভিনব উপায়ে মনের ভাব প্রকাশে বিভিন্ন কৌশলাদি ও দীর্ঘবাক্য গঠনে আগ্রহীদের জন্য।
* مقالاتي المختارة (আরবদের ন্যায় বিভন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ লিখনের অনুশীলনে আগ্রহীদের জন্য)
* لغة الصحف (আরবী পত্র পত্রিকাসহ ব্যবহারিক আরবী অনুশীলনে আগ্রহীদের জন্য)
* خط الرقعة (আরব দেশে বহুল প্রচলিত হাতের লেখা শিখতে আগ্রহীদের জন্য)

যোগাযোগ : মাওলানা আনওয়ারুল আযীম

পরিচালক, মারকায যায়েদ বিন ছাবিত রা.
অস্থায়ী ক্যাম্পাস : বছিলা রোড, ফিউচার টাউন, মুহাম্মদপুর, ঢাকা
স্থায়ী ক্যাম্পাস : বৌনাকান্দি, হযরতপুর, কেরানীগঞ্জ। ০১৯১৩৫১৩০৭৩, ০১৬৭৭৯৫৫৮০২

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner